জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

অধ্যাপক আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
অধ্যাপক ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
অধ্যাপক ড. মোঃ আতিকুর রহমান
ড. মোঃ মাসুদ-আল-কামাল
ড. শারমিন আখতার
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মুহম্মদ নিজাম
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য্য
শেখ নূর কুতুবুল আলম

সম্পাদনা

অধ্যাপক আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

Draft Copy

৬৬

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্পনির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

চিত্রণ

তামান্না তাসনিম সুপ্তি

রেহনুমা প্রসূন

গ্রাফিক্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: _____

Draft Copy

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্যদিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের আলোকে সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য এই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হলো। বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যেন তা অনেক বেশি সহজবোধ্য এবং আনন্দময় হয়। এর মাধ্যমে চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা বিভিন্ন প্রপঞ্চ ও ঘটনার সাথে পাঠ্যপুস্তকের একটি মেলবন্ধন তৈরি হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকটির মাধ্যমে শিখন হবে অনেক গভীর এবং জীবনব্যাপী। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

Draft Copy

Draft Copy

সূচিপত্র

বিজ্ঞানের দর্পণে সমাজ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

অনন্যতায় একাত্মতা

বাংলা অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধানে

দক্ষিন এশিয়া: ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

মুক্তির সংগ্রাম ও বঙ্গবন্ধু

সামাজিকীকরণের নানা প্রসঙ্গ

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধানে

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন

সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি

Draft Copy

বিজ্ঞানের দর্পণে সমাজ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা কি সবসময় একই রকম থাকে? হয়তো কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে আবার অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়নি। চলো আমরা একটু দেখে নিই আমাদের চারপাশে কি কি আছে।

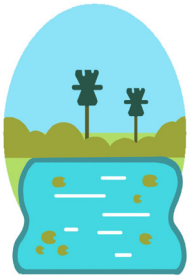

জলাশয়

রাস্তা

নদী

গাছপালা

ঘর

দোকান

খেলার মাঠ

পোশাক

Draft Copy

এগুলোর কিছু প্রাকৃতিক উপাদান আর কিছু সামাজিক উপাদান। আমরা হয়তো অনেকেই অনুমান করতে পারছি কিছু কিছু উপাদান পরিবর্তিত হয়েছে আবার কিছু কিছুর পরিবর্তন হয়নি। আচ্ছা, আমাদের কি জানতে ইচ্ছা করছে কারা আমাদের মতামতের সাথে সহমত পোষণ করে? চলো আমরা এবার একটা অনুসন্ধানী কাজ করি। এবার আমরা আমাদের এলাকার মানুষের কাছ থেকে মতামত গ্রহণ করবো। জেনে নিবো কতজন মনে করেন কোন উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে আর কতজন মনে করেন পরিবর্তন হয়নি। আমরা এ কাজটি করার জন্য সপ্তম শ্রেণির অনুসন্ধানী ধাপগুলো অনেকটাই অনুসরণ করবো। তবে এবার আমরা একটা নতুন কিছু জানবো। আমরা পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্যদাতার কাছ থেকে হ্যাঁ বা না প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর নিবো। তাই তথ্যগুলো আমরা একটা নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও উপস্থাপন করবো । চলো আমরা অনুসন্ধানের ধাপগুলো বুঝে নিই।

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবো।	আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন 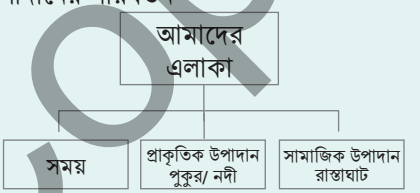
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের এই ধাপটির জন্য এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নির্ণয় করবো।	১. আমাদের এলাকার ২০ বছর আগের প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়। ২. আমাদের এলাকার ২০ বছর আগের সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।
তথ্যের উৎস নির্বাচন করা	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারি তা নির্বাচন করতে হবে। সেটি হতে পারে ব্যক্তি, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, মিউজিয়াম ইত্যাদি।	যেহেতু ২০ বছর আগের এলাকার পরিবর্তন জানতে চাচ্ছি তাই এরকম প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নির্ধারণ করতে হবে যারা ২০ বছর আগের এলাকা কেমন ছিলো তা বলতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আমরা কমপক্ষে ৩০ বছর বয়সের পুরুষ ও নারী উত্তরদাতা হিসেবে নির্বাচন করতে পরি। সেই সাথে বই, ইন্টারনেট বা পরিত্রকা থেকেও আমরা তথ্য সংগ্রহ করতি পরি।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা দলগত আলোচনা/প্রশ্নপত্র/সাক্ষাৎকার/ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি।	প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের জন্য আমরা কিছু প্রশ্নমালা তৈরি করবো। যেগুলো উত্তরদাতারা হ্যাঁ বা না তে উত্তর দিবে।

Draft Copy

তথ্য সংগ্রহ করা	এই ধাপে নির্বাচিত তথ্যের উৎস ও তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি অবলম্বন করে তথ্য সংগ্রহ করবো।	আমরা ২০ থেকে ৩০ জন তথ্যদাতা বা উত্তর দাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবো। হ্যাঁ বা না তে যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলোর উত্তর কিন্তু কম সময়ে বেশি মানুষের কাছ থেকে নিতে পারি।
তথ্য বিশ্লেষণ করা	সংগৃহিত তথ্য পড়তে হয়, প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে যেগুলো অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের সাথে মিল আছে সেগুলো নির্বাচন করতে হয় এবং সাজাতে হয়, অথবা হিসাব-নিকাশ করে গ্রাফ বা চার্ট আকারে প্রকাশ করতে হয়।	আমরা আমাদের সংগৃহিত তথ্য সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারবো যেমন ২০ বছর আগের রাস্তাঘাট একই রকম ছিল এই বিষয়ে ২০ জন হ্যাঁ বলেছেন ১০ জন না বলেছেন। তাই এই তথ্য আমরা গ্রাফ বা চার্ট আকারে উপস্থাপন করতে পারি।
ফলাফল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	তথ্য বিশ্লেষণ করে যে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় সেটাই অনুসন্ধানী পদ্ধতির ফলাফল ও সিদ্ধান্ত।	আমরা আমাদের তৈরিকৃত গ্রাফ বা চার্টটির মাধ্যমে দেখাতে পারি প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোর মধ্যে কোনগুলোর পরিবর্তন হয়েছে। কত জন এই পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং কতজন করেনি।
ফলাফল অন্যদের সাথে উপস্থাপন ও শেয়ার করা	আমরা আমাদের ফলাফল গ্রাফ পেপার, পোস্টার, নাটিকা, ছবি, চার্ট ইত্যাদি উপস্থাপন করতে পারি ও ম্যাগাজিনে বা ক্লাসে প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি।	আমরা ফলাফল প্রতিবেদন আকারে জমা দিতে পারি। আবার পোস্টার পেপারে গ্রাফ ও চার্ট লিখে ক্লাসে উপস্থাপন করতে পারি।

Draft Copy

তথ্য নেওয়ার সময় কিছু বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে:

তথ্যগ্রহণের সময় করণীয়:

১. অবশ্যই উত্তরদাতার কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে।

২. শিক্ষার্থীরা তথ্যদাতাকে জানিয়ে রাখবে সংগৃহিত উত্তর শুধুমাত্র তাদের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অন্যকোনো উদ্দেশ্যে নয়।

৩. কতটুকু সময় লাগতে পারে তা উত্তরদাতাকে জানানো।

৪. তিনি সময় দিতে পারবেন কি না তা জেনে নেওয়া।

৫. উত্তরদাতা যদি উত্তর দেওয়ার কোনো এক সময় উত্তর প্রদান করতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন সে মুহূর্তেই প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেওয়া।

৬. উত্তর দাতার উত্তর ঠিক না ভুল হয়েছে এ ধরনের কোনো কথা না বলা যেনো উত্তরদাতা সম্পূর্ণ নিজের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন।

আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তথ্য নেওয়ার জন্য আমাদের কি কি প্রাকৃতিক উপাদান ও সামাজিক উপাদান পরিবর্তন হতে পারে সেগুলো সনাক্ত করতে হবে। প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে আমরা নিতে পারি গাছপালা, নদ-নদী, পাহাড় ইত্যাদি। সামাজিক উপাদান হিসেবে নিতে পারি পোশাক, ভাষা, মূল্যবোধ ইত্যাদি। মতামত নেওয়ার জন্য একটি নমুনা প্রশ্নমালা দেওয়া হলো। আমরা এরকমভাবে যে যে উপাদানের পরিবর্তন সম্পর্কে এলাকাবাসীর মতামত নিতে চাই সেভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পারি।

Draft Copy

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা

তথ্যদাতার নাম:	বয়স:
শিক্ষাগত যোগ্যতা:	পেশা:

ক্রম	আপনার মতামতের উপর টিক চিহ্ন দিন
১.	এই এলাকার গাছপালার পরিমান কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
২.	এই এলাকার পশুপাখির সংখ্যা কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৩.	এই এলাকার রাস্তা-ঘাট কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৪.	এই এলাকার বাড়িঘরের ধরন কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫.	এই এলাকার যানবাহন কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৬	এই এলাকার পোশাক-পরিচ্ছদ কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৭.	এই এলাকার তৈজসপত্র কি ২০ বছরের মধ্যে পরিবর্তন হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না

আমাদের পাওয়া তথ্যকে আমরা সহজে প্রকাশ করার জন্য বিভিন্ন সংখ্যা বা অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। একে আমরা কোডিং বলতে পারি। যেমন-গাছপালাকে ১, পুকুরকে ২, এভাবে প্রত্যেকটি উপাদানকে আমরা কোড করতে পারি। নিচে নমুনা কোডিং দেওয়া হলো। ৩০ জন তথ্যদাতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে আমরা নিচের ছকের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

Draft Copy

যে যে উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে	কোডিং	হ্যাঁ বলেছেন	না বলেছেন
গাছপালা	১	২ জন	২৮ জন
পশুপাখি	২	১৫ জন	১৫ জন
রাস্তা-ঘাট	৩	২০ জন	১০ জন
বাড়িঘর	৪	২২ জন	৮ জন
যানবাহন	৫	২৮ জন	২ জন
পোশাক	৬	১৫ জন	১৫ জন
তৈজসপত্র	৭	২০ জন	১০ জন

আবার, এই তথ্যকে আমরা স্তম্ভচিত্র বা bar chart আকারেও উপস্থাপন করতে পারি। কিভাবে স্তম্ভচিত্রটি আঁকবো তা একটু দেখে নিই।

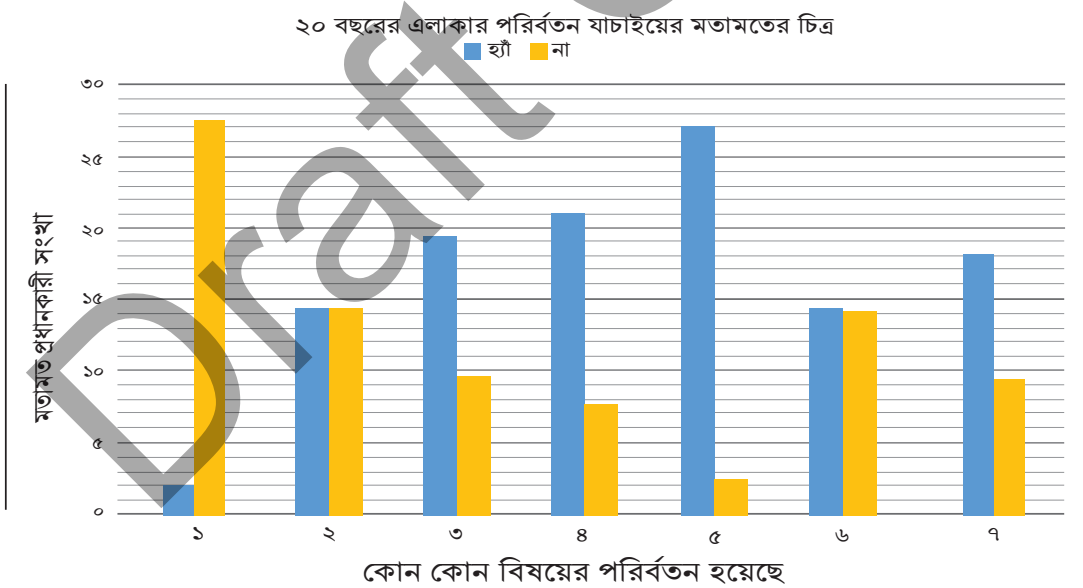

Draft Copy

আচ্ছা উপরের তথ্যকে আমরা যেভাবে 'হ্যাঁ' বা 'না'দ্বারা প্রকাশ করলাম। আমরা কি এই তথ্য দিয়ে আমাদের এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো কেনো বা কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা জানতে পারবো? না, কারণ জানতে হলে আমাদের এমন প্রশ্ন করতে হবে যেগুলো হ্যাঁ বা নাতে উত্তর দিলে হবে না। তাই এক্ষেত্রে আমরা সপ্তম শ্রেণির অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে কারণ খুঁজতে পারি। আচ্ছা আমরা কি আগের শেখা অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং এখন শেখা অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি।

এর আগে আমরা যে অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করেছি সেখানে সংখ্যা দিয়ে তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। এবার আমরা সংখ্যা দিয়ে আমাদের ফলাফল উপস্থাপন করেছি। সংখ্যা থাকায় আমরা টেবিল ও চার্টের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন করতে পেরেছি। এটি হচ্ছে পরিমানগত পদ্ধতি। আর সপ্তম শ্রেণিতে শিখেছি গুণগত পদ্ধতি। তাছাড়াও আমরা একসাথে চারটি মূল বিষয় নিয়ে এবার অনুসন্ধান করেছি। এলাকা, অতীত কাল, সামাজিক উপাদান, প্রাকৃতিক উপাদান।

অনুসন্ধানের বিষয়:

আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান।

অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য:

- আমার এলাকার ২০ বছর আগের ও বর্তমান সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়।
- আমার এলাকার ২০ বছর আগের ও বর্তমান সময়ের মধ্যে সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন নির্ণয়

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি: এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ২০ বছর আগের আমার এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলোর পরিবর্তন হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়েছে। এজন্য ৩০ জন লোকের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হয়েছে। যাদের বয়স কমপক্ষে ৩০ বছর। কারণ, ২০ বছর আগের এলাকার অবস্থা মনে করে পরিবর্তন বলতে হলে উত্তরদাতার বয়স বর্তমানে কমপক্ষে ৩০ বছর হওয়া প্রয়োজন। উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর নেওয়ার জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করা হয়েছে যেখানে তথ্যদাতা হ্যাঁ ও না তে উত্তর দিবে।

তথ্যদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে তার সম্মতি নেওয়া হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন: ৩০ জন উত্তরদাতার প্রাপ্ত তথ্য নিচে স্তম্ভচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো:

২০ বছরের এলাকার পরিবর্তন যাচাইয়ের মতামতের চিত্র

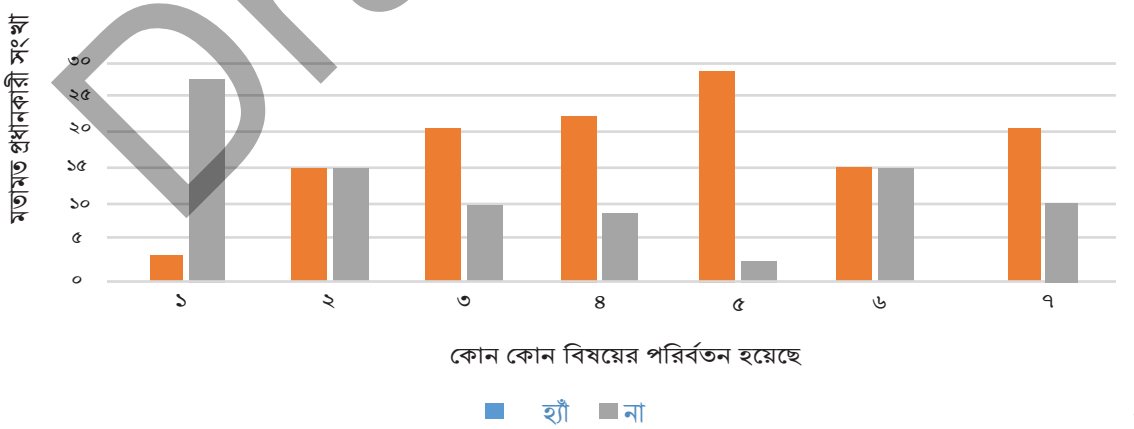

Draft Copy

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ:

প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে আমি আমার এলাকার গাছপালা ও পুকুরকে বেছে নিয়েছি। বেশিরভাগ উত্তরদাতার অভিমত এলাকার গাছপালার পরিমান একই রকম আছে। মাত্র ২জনের অভিমত গাছপালার পরিমানে বেড়েছে বা কমেছে। অপরদিকে, সামাজিক উপাদান হিসেবে আমি রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, যানবাহন, পোশাক ও তৈজসপত্রকে বেছে নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তরদাতার অভিমত এলাকার রাস্তাঘাট, যানবাহন ও ব্যবহৃত তৈজসপত্রের পরিবর্তন হয়েছে। অর্ধেক সংখ্যক তথ্যদাতা মনে করেন এলাকার পোশাক পরিচ্ছদ পরিবর্তন হয়েছে।

যৌক্তিক সিদ্ধান্ত:

এলাকার প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানগুলো গত ২০ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেলো বেশি সংখ্যক ব্যক্তি মনে করেন এলাকার পরিবর্তন হয়েছে। অন্যদিকে বেশিসংখ্যক উত্তরদাতা যেহেতু শিক্ষিত ও সচেতন তাই এটা বলা যেতে পারে যে তারা পরিবর্তনগুলো সহজে সনাক্ত করতে পেরেছেন

অনুসন্ধানী কাজ: ১

আমরা ৫-৬ জনের দল গঠন করব। প্রত্যেক দল পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া অনুসসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে নিজের এলাকার কোন কোন প্রাকৃতিক ও সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন হয়েছে তার ছক করব। এরপর এলাকার মানুষের কাছ থেকে এই পরিবর্তন সম্পর্কে মতামত নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করব। এরপর প্রাপ্ত তথ্যকে দলগতভাবে বিশ্লেষণ করে গ্রাফ পেপারে উপস্থাপন করব। এরপর দলের প্রত্যেক একটি প্রতিবেদন লিখে জমা দিব।

Draft Copy

এখন আমরা একটি পত্রিকার রিপোর্ট পড়ি।

আমাদের পত্রিকা

দুর্যোগ সংখ্যা

জলবায়ুর পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর নিয়ামক সমূহে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই দক্ষিণমেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতাও বাড়ছে। এই অবস্থায় বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকিতে রয়েছে। মালদ্বীপ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে দেশগুলোর একটি। ইতোমধ্যে এর কিছু কিছু অংশ পানির নিচে ডুবে গেছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সমুদ্র তীরবর্তী আরো অনেক এলাকা ডুবে যেতে পারে। বাংলাদেশও এধরনের হুমকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ কার্বন নিঃসরণ। এই কার্বন নিসৃত হয় কলকারখানার কালো ধোঁয়া ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া থেকে। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে এই কার্বন নিঃসরণের হার অনেক বেশি। সেখানে কলকারখানা থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন ধরনের দূষক ও রাসায়নিক পদার্থ জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ দূষণে ভূমিকা রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের দায় খুব বেশি না হলেও নগরায়ন ও বনভূমি উজাড় করার মাধ্যমে এখানে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। যা অল্প পরিসরে হলেও জলবায়ু পরিবর্তনেও ভূমিকা রাখছে।

এই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক পরিসরে ১৯৯৭ সালে কিউটো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত, ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কোপ সম্মেলনসমূহ উল্লেখযোগ্য। সেখানে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সমঝোতা ও চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশেও পরিবেশ ও বনভূমি রক্ষায় সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পরিবেশ আইন প্রণয়ন, সংরক্ষিত বনভূমি ঘোষণা করা, সামাজিক বনায়ন, ও অংশীদারিত্বমূলক বনায়ন ইত্যাদি।

এছাড়া, আদিবাসী বা বন নির্ভর সম্প্রদায় যাদের জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতি বনভূমির সাথে সরাসরি জড়িত তাদেরকে বনরক্ষায় কার্যকর ভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীতিমালা সংস্কার করা প্রয়োজন।

Draft Copy

পত্রিকার রিপোর্টটি খেয়াল করলে দেখব মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলেই জলবায়ু তথা প্রকৃতির পরিবর্তন হচ্ছে। এই জলবায়ু পরিবর্তন নানা ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। প্রেক্ষাপট সমূহ নিম্নোক্ত ভাবে সনাক্ত করতে পারি।

প্রেক্ষাপট	উদাহরণ
ঐতিহাসিক ও সামাজিক	কিউটো সম্মেলন, প্যারিস ও কোপ সম্মেলন, নগরায়ন, যানবাহন, কলকারখানা
সাংস্কৃতিক	জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড
রাজনৈতিক	জাতীয় নীতিমালা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

অনুসন্ধানী কাজ: ২

এখন আমরা দলগতভাবে আমাদের এলকার যে কোনো একটি সামাজিক উপাদানের পরিবর্তন কীভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট: ঐতিহাসিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে সেটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিব। এ বিষয়ে আমরা আমাদের এলাকার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। লক্ষ্য রাখব যেকোনো একটি উপাদান হয়তো সবগুলো প্রেক্ষাপট তৈরি করবে না। আমরা সর্ব্বোচ সংখ্যক প্রেক্ষাপটগুলো অনুসন্ধান করে বের করার চেষ্টা করব এবং উপস্থাপন করব।

Draft Copy

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

পহেলা বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ। গ্রামের মাঠে বৈশাখী মেলা দেখার দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছে মরিয়মের। জীবনে প্রথমবার সে মাটির পুতুল, খেলনা, পুতুলনাচ, নাগরদোলা, লাঠিখেলা দেখেছে। গ্রামের সকল ধর্মের সকল মানুষকে মিলে-মিশে একসঙ্গে আনন্দ করতে দেখেছে। মেলায় আসার আগে মরিয়মের দাদু ওকে নিয়ে গিয়েছিল বাজারের বড় একটি দোকানে যেখান থেকে তাদের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়। দাদুর কাছ থেকে মরিয়ম শুনেছে, বাংলা সন চালুর পর থেকে নাকি ব্যবসায়ীরা হালখাতা আয়োজন করেন। বঙ্গাব্দের প্রথম তারিখে প্রতিটি দোকানে হিসাবের নতুন খাতা খোলা হয়। পুরাতন বছরের সকল হিসাব নিকাশ শেষ করে নতুন খাতায় শুরু হয় হিসাবের নতুন যাত্রা। রীতি হিসেবে চলে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়া।

মরিয়ম আনন্দমনে তার অভিজ্ঞতার গল্প বলে চলেছে। কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল মাইকেল, রেনু, নীলান্ত আর মাসুদ। চোখে-মুখে নতুন কিছু দেখা, জানা ও শেখার আনন্দ নিয়ে নীলান্ত যোগ করলো, নৌকা বাইচের কথা। নীলান্ত বললো, এবারই প্রথম সে নৌকা বাইচ দেখেছে তাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে। নদীর দুই পাড়ে চলছিল কয়েক হাজার মানুষের আনন্দ-উৎসব। ছয়/সাতটি দল বাইচে অংশ নিচ্ছিল। মাঝি ভাইদের গানে গানে আর ছন্দে ছন্দে চলছিল নৌকা বাইচ। মরিয়ম আর নীলান্তের আনন্দ-অভিজ্ঞতা শুনতে শুনতে অনেক প্রশ্ন এসে ভীড় করেছে ওদের মাথায়।

রেনু বললো, শুনেছি আমাদের নানু, দাদুদের সময়ে এবং তার বহু আগেও নাকি বড় আয়োজনে বৈশাখী মেলা বসতো। দোকানে দোকানে হালখাতা হতো। আয়োজন করা হতো নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। আচ্ছা, এগুলোর ইতিহাস জানার উপায় কী?

৬ষ্ঠ আর ৭ম শ্রেণিতে ইতিহাস জানার উপায় অনুসন্ধান করে অর্জিত জ্ঞান থেকে রেনুর দিকে তাকিয়ে মাইকেল বললো, আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরিতে ইতিহাসের অনেক বই আছে। সেইসব বই থেকে এবং নানু-দাদু আর গ্রামের মুরুব্বিদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু তথ্যগুলো পাওয়াই কেবল যথেষ্ট নয়, এগুলোকে ইতিহাস গবেষণার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি মতো একের পর এক প্রশ্ন করে, যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর সমালোচনামূলক অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

অনুসন্ধানী কাজ

দলভিত্তিক উপস্থাপনা

শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিলেন। তারপর তিনি মজার একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করলেন। চলো নিচের ছবিগুলো থেকে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ ও শোভাযাত্রার ইতিহাস নিয়ে দলভিত্তিক একটি লেখা তৈরি করি এবং তা শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করি। এই কাজে তথ্য সংগ্রহের জন্য তোমরা ইন্টারনেট ছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ 'বাংলাপিডিয়া'য় প্রকাশিত এবং এই বইয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশে উল্লিখিত তথ্য থেকেও প্রয়োজন মতো সাহায্য গ্রহণ করতে পারবে।

Draft Copy

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?

চলো এবার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে তা জেনে নেয়া যাক। ভূ-খণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষের আচার-আচরণ, ভাষা-যোগাযোগ, বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ সব কিছুই পৃথক হয়। এই পার্থক্যই মানুষকে ভিন্ন অভিজ্ঞতা আর পরিচয় দান করে। পৃথিবীর বুকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নানান চ্যালেঞ্জ আর প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে টিকে থাকার পথে মানুষের সকল কর্মকাণ্ডই হলো সংস্কৃতি। সমাজ হলো সেই সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান একটি উপকরণ। সময়ের সাথে সাথে নতুন নতুন পরিস্থিতি আর প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলা করতে গিয়ে মানুষের সমাজ আর সংস্কৃতির প্রতিনিয়ত রূপান্তর ঘটে চলেছে। ইতিহাস পাঠ থেকে এই রূপান্তরের কালানুক্রমিক পর্যায়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আরও ধারণা পাওয়া যায়, একটি ভূখণ্ডে মানুষ অতীতে কীভাবে বসবাস করতো, তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক কেমন ছিল সেই সম্পর্কেও। সমাজের নানান উপাদানের পরিবর্তন ও রূপান্তর অনুধাবনের জন্যে কালানুক্রমিক গবেষণাভিত্তিক যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় তাই হলো সামাজিক ইতিহাস। একইভাবে যখন মানুষের নানান কর্মকাণ্ডের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনা করা হয়, তখন তা সাংস্কৃতিক ইতিহাস হয়ে ওঠে। ইতিহাস যারা জানার ও লেখার চেষ্টা করেন, তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে অতীতকালের বিভিন্ন উৎস ও উপাদান খুঁজে বের করেন। সেগুলোর ভিত্তিতে যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে অতীতে সমাজ ও সংস্কৃতি কেমন ছিল তা জানার চেষ্টা করেন।

তোমার মতে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস কাকে বলে?
শ্রেণিকক্ষে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস কত ধরণের হয়?

তোমরা যদি বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের প্রাচীন ইতিহাস জানতে ও বুঝতে চাও তাহলে কী ধরণের উৎস বা উপাদান অনুসন্ধান করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে চলো তা অনুধাবনের চেষ্টা করি। দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা যখন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করবে তখনও ইতিহাসের উৎস বা উপাদান সম্পর্কে জানতে ও শিখতে পারবে। আর তোমরা তো ইতোমধ্যেই জেনেছো যে, ইতিহাস হতে হলে সকল প্রকার উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি আর সমস্যাগুলোর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। উৎসগুলোকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করতে হয়। সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তবেই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

খুব সহজ করে মনে রাখার জন্যে দু'ধরণের উপাদানের কথা বলা যেতে পারে। এক, সাহিত্যিক উৎস। দুই, প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষেরা অতীতে কেমন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিলেন তার অনেকটাই জানা যাবে এই উৎসগুলো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। সাহিত্যিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি, চর্যাপদ, বিভিন্ন ধরণের কাব্যসংকলন, আইন শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ, ভ্রমণ বিবরণী ইত্যাদি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসগুলোর মধ্যে শিলালিপি, তাম্রশাসন, টেরাকোটা, মৃৎপাত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মুদ্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Draft Copy

চিত্র: পালযুগের পাণ্ডুলিপি

চলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎসগুলো নিচে উল্লেখ করি-

১। তালপাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি	২।
৩।	৪।
৫।	৬।
৭।	৮।
৯।	১০।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকগণ রেখে গেছেন তাদের অভিজ্ঞতামূলক নানান বর্ণনা। এসব উৎসের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা সম্ভব হবে। মানুষের বিস্মৃত নানান ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বয়ান জানা যাবে।

Draft Copy

প্রাচীন লিপি পাঠোদ্ধারের কাজ কি ইতিহাসবিদের?

মনে রাখবে, ইতিহাসের যতো আদিকালে তোমরা প্রবেশ করবে, ভিন্ন ভিন্ন উৎসের সঙ্গে পরিচিত হবে। দেখবে যে, ইতিহাসের উৎস কতো বিচিত্র প্রকার হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীর পাশাপাশি নানান ভাষায় লিখিত গ্রন্থ ও দলিলাদি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতি শতকে সেই ভাষার ঘটেছে পরিবর্তন, বিবর্তন, রূপান্তর। প্রাচীনকালে দেখা যায় বহুবিচিত্র ভাষার বহুবিচিত্র ধরন। সেগুলো পাঠোদ্ধার করাও তাই সহজ কথা নয়। পাঠোদ্ধারের এই কাজ করে থাকেন প্রাচীন লিপিবিশারদগণ, লিপিবিদ্যায় পারদর্শী ভাষাবিদগণ। পাঠোদ্ধারের কাজ ইতিহাসবিদের নয়। ইতিহাসবিদের কাজ পাঠোদ্ধারকৃত উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য কীভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হয় সেই বিষয় জানা। অপরাপর সহায়ক উৎসের সাথে মিলিয়ে নিয়ে কীভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তার কলা-কৌশল জানা। পাঠোদ্ধারকৃত লিখিত উৎস কীভাবে অনুসন্ধান করতে হয়, উৎস থেকে কীভাবে তথ্য বের করে আনতে হয় ইতিহাসবিদকে তা জানতে হয়। একইসঙ্গে সেই তথ্য কতোটুকু গ্রহণযোগ্য আর বিশ্বাসযোগ্য তা যাচাই-বাছাই করে কীভাবে নৈর্ব্যক্তিক আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেই দক্ষতা ও যোগ্যতা একজন ইতিহাসবিদের থাকা প্রয়োজন।

অনুশীলনী

চলো একজন ইতিহাসবিদের যোগ্যতাগুলো নিচের ফাঁকা স্থানে লিখি -

১।

২।

৩।

৪।

৫।

বাংলা অঞ্চলের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার উপায়

এবার বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত সাহিত্যিক উৎস থেকে কীভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যগুলোকে যাচাই-বাছাই করতে হয় তা অনুসন্ধান করে দেখা যাক। প্রথমেই জানা যাক সাহিত্যিক উপাদানগুলো কী কী? এগুলো থেকে আমরা কীভাবে অতীতের তথ্যগুলো গ্রহণ করতে পারি?

সাহিত্যিক উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই কি ইতিহাস?

আঞ্চলিক বাংলায় ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যেসব সাহিত্যিক উৎস পাওয়া গেছে তার মধ্যে শব্দপ্রদীপ, রামচরিতম, সুভাষিত রত্নকোষ, কৃষিপরাশর, কালবিবেক, দানসাগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলোকে ইতিহাসের প্রাথমিক উৎস বলা হয়ে থাকে। প্রাথমিক উৎসকে মৌলিক উৎসও বলা হয়। এগুলোতে অতীতে বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা, কৃষিজাত ফসল, দৈনন্দিন জীবনের চিত্র, চিকিৎসা ও আইন বিষয়ক তথ্য, সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ সহ নানান তথ্য রয়েছে।

Draft Copy

যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করতে পারলে এসব তথ্য থেকে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখার অনেকটাই পাওয়া যেতে পারে। কারণ, তোমরা জেনেছো যে, উৎস বা উপাদানে প্রাপ্ত সব তথ্যই সত্য নয়। সাহিত্যিক উৎস থেকে তথ্য গ্রহণের আগে খোঁজ নেওয়া দরকার, উৎসটি কার হাতে তৈরি? কাদের জন্য তৈরি? ঐ উৎসে কাদের কথা বলা হয়েছে? উৎসটি নির্ভরযোগ্য নাকি পক্ষপাতদুষ্ট? এমন অনেক প্রশ্নের মাধ্যমে উৎসটির সত্যতা ও নিরপেক্ষতা যাচাই করতে হয়। তারপরই কেবল গ্রহণযোগ্য তথ্যটুকু নিয়ে ইতিহাসের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাহিত্যিক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, এখানে কবি বা লেখক একজন মানুষ। তাঁর আবেগ-অনুভূতি, কল্পনা, ব্যক্তিগত ভালো লাগা, মন্দ লাগা এ বিষয়গুলো লেখায় স্থান পাচ্ছে কিনা। অনুসন্ধানি দৃষ্টিতে খুঁজে দেখতে হবে, একজন লেখক যদি কোনো শাসকের সময় কিংবা অনুগ্রহে লেখার কাজটি করেন তাহলে সেই শাসক বা রাজাকে খুশি করার জন্য অযথা প্রশংসার আশ্রয় নিতে পারেন। সমসাময়িক অন্য রাজা বা শাসককে খাটো করে দেখতে পারেন। এই অতিরিক্ত প্রশংসা কিংবা অতিরিক্ত সমালোচনা অর্থাৎ যেকোনো প্রকার অতিরঞ্জন ইতিহাস রচনাকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই অতিরঞ্জিত বিষয় বাদ দিয়ে যৌক্তিক আর গ্রহণযোগ্য অংশটুকুই কেবল ইতিহাসে স্থান পায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদান থেকে ইতিহাস জানার উপায়

এবার জানবো প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সম্পর্কে। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানগুলো পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে মানুষের প্রাচীন ইতিহাস লেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বাংলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার জন্যেও এগুলোর উপর ইতিহাসবিদগণ নির্ভর করে থাকেন। সাহিত্যিক উৎসের তুলনায় এগুলো অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং বিশ্বস্ত। সাহিত্যিক উৎসের পাশাপাশি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ব্যবহার করা গেলে অতীতের যেকোনো ঘটনা অনেক বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ পাওয়া যায়। তবে বাংলা অঞ্চলের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উভয় উৎসের কিছুটা অভাব রয়েছে। উপাদানগুলোর অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। তা তত্ত্বেও, প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোতে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে তথ্য রয়েছে তুলনামূলক বিচারে সেগুলো অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য, গ্রহণযোগ্য।

ইতিহাস রচনার কাজে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস বা উপাদানের ব্যবহার নিয়েও একজন ইতিহাসবিদের অনেক প্রশ্ন থাকে। যেমন - কোন্ কোন্ বস্তু বা উপকরণ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস/ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? কোথায় কোথায় এ ধরণের উপাদান পাওয়া যায়? এগুলো থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রথা-পদ্ধতি কি অনেক কঠিন? এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে একজন ইতিহাসবিদ অনুসন্ধানে নামেন এবং উৎসগুলোতে বিদ্যমান প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

Draft Copy

তোমাদের জন্য মজার কাজ

এবার একটি মজার খেলা। আমরা আমাদের পরিবারের বড় সদস্য কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কিংবা অন্য যেকোনো দেশে প্রচলিত কিছু মুদ্রা সংগ্রহ করি। মুদ্রা কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। আবার মুদ্রায় যেহেতু নানান ধরনের লেখা থাকে, সেহেতু এটি লিখিত উৎসও। তবে প্রাচীনকালে এমন অনেক মুদ্রা ছিল, যেগুলোতে শুধুমাত্র কিছু ছাপ বা চিহ্ন আঁকা থাকতো। কিছু লেখা থাকতো না। সেইসব মুদ্রা শুধুই প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস। যেহেতু মুদ্রায় কিছু লেখা ছিল না, তাই লিখিত উৎসের আওতায় পড়ে না! যাই হোক, মুদ্রা যে ধাতু দিয়ে তৈরি হয়, মুদ্রায় যেসব লেখা ও চিহ্ন আঁকা হয় সেগুলো বিশ্লেষণ করে ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এবার চলো, আমাদের সংগৃহীত মুদ্রাটির উপর একটি সাদা কাগজ রেখে কাগজের উপর হাত দিয়ে হালকা করে চাপ দেই। তারপর একটি পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর আলতোভাবে ঘষতে থাকি। দেখবো কাগজের নিচে থাকা মুদ্রার ছাপ কাগজের উপর ভেসে উঠেছে। এভাবে মুদ্রাটির দুইপাশ পেন্সিলের সাহায্যে কাগজে ছাপ দিয়ে সেই ছাপের পাশে মুদ্রাগুলোর মান, গায়ে অঙ্কিত সাল এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিশিক্ষক আর বন্ধুদের দেখাই।

প্রত্নস্থল: নগর, বন্দর, রাজধানী

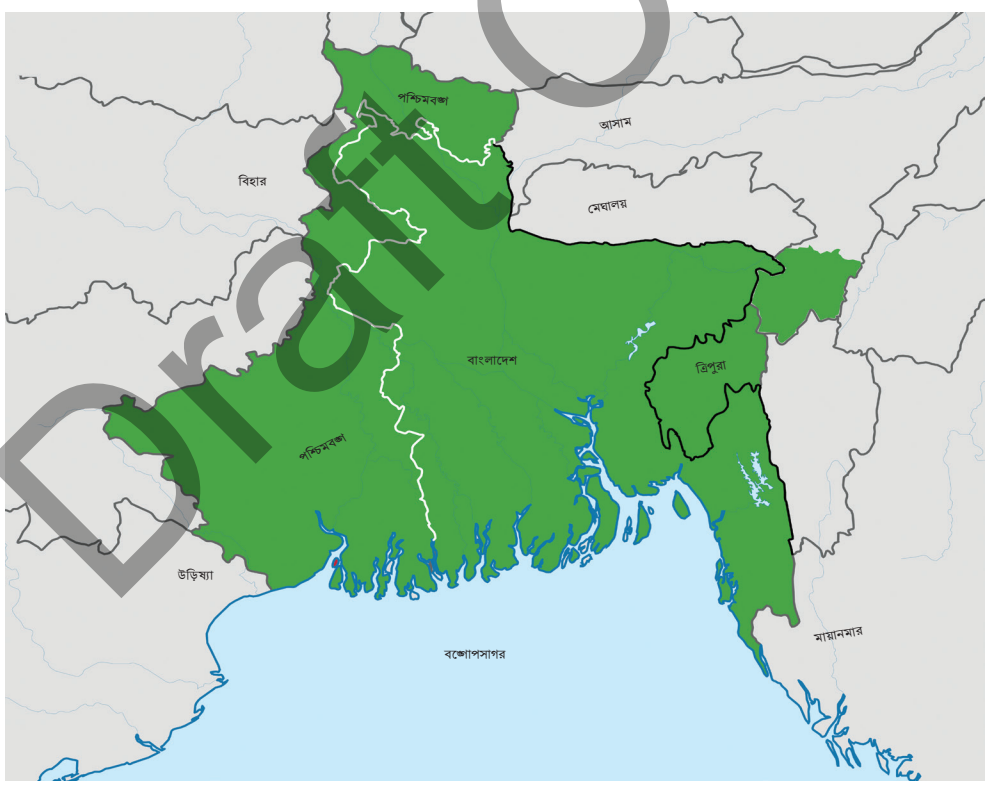

বাংলা অঞ্চলের মানচিত্র

Draft Copy

বাংলা অঞ্চলে যেসব প্রত্নস্থল রয়েছে এবং খনন কাজ চালানো হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে পান্ডু রাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্তি, কর্ণসুবর্ণ, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, উয়ারি-বটেশ্বর, বিক্রমপুর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রত্নস্থলগুলোর মধ্যেও ধরনগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- বাংলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবি হচ্ছে একটি তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। অন্যদিকে তাম্রলিপ্তি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম একটি সমুদ্র বন্দর নগর। চন্দ্রকেতুগড়ও একটি বন্দর নগর। কর্ণসুবর্ণ বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশের একটি রাজধানী নগর। মহাস্থানগড় বাংলার উত্তরাংশের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্র। এটি রাজধানী হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। পাহাড়পুর ছিল মহাস্থানগড়ের কাছেই অবস্থিত একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। ময়নামতির দেবপর্বত ছিল বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও নগর কেন্দ্র। দেবপর্বত নামে একটি রাজধানীরও পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংলার পূর্বাংশের অপর দুটি প্রত্নস্থল হলো উয়ারি-বটেশ্বর ও বিক্রমপুর। এর মধ্যে উয়ারি-বটেশ্বর বাণিজ্যিক এবং বিক্রমপুর রাজধানী নগর হিসেবে গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি প্রত্নস্থলেই প্রাচীনপর্বে বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খন্ডের বিভিন্ন অংশে বসতি স্থাপনকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও পরিবর্তনের মূল্যবান নিদর্শনাবলী পাওয়া গেছে।

জাদুঘরে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উৎস/উপাদান

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা উপরে উল্লিখিত প্রত্নস্থলগুলোর ভৌগোলিক এবং সপ্তম শ্রেণিতে অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছো। সপ্তম শ্রেণিতে এই অঞ্চলের মুদ্রা সম্পর্কেও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অনেক তথ্য জানতে পেরেছো। এছাড়াও ধ্বংসপ্রাপ্ত বা পরিত্যক্ত স্থাপনা, পোড়ামাটির ফলক, মাটির পাত্র, বিভিন্ন ধরনের লিপি (শিলালিপি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বা লেনদেনের দলিল বা তাম্রশাসন, প্রশস্তিলিপি, মূর্তিলিপি, স্মারকলিপি ইত্যাদি), অলংকার, ভাস্কর্য, নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী, শিল্পপণ্য সহ বহুবিচিত্র বস্তুগত নিদর্শন প্রত্নস্থলে পাওয়া যায়।

এই নিদর্শনাবলী বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘরটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। সারা পৃথিবীতেই মানুষের অতীত ইতিহাসের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অর্জনগুলো জানা ও বুঝার জন্য নানান নিদর্শনাবলী সংরক্ষণ করা হয়। জনসাধারণ এই জাদুঘরগুলো পরিদর্শন করে উল্লিখিত সকল নিদর্শন দেখতে পারেন। নিজের সাংস্কৃতিক শেকড় অনুসন্ধান ও অনুধাবন করতে পারেন। বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পঞ্চাশটির বেশি জাদুঘর রয়েছে। চলো কয়েকটি বিখ্যাত জাদুঘরের নাম জেনে নেয়া যাক:

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর (ঢাকা), লালবাগ ফোর্ট জাদুঘর (ঢাকা), মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (ঢাকা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর (ঢাকা), টাকা জাদুঘর (ঢাকা), বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর (সোনারগাঁও), গণহত্যা জাদুঘর (খুলনা), জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর (চট্টগ্রাম), বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর (রাজশাহী), মহাস্থান জাদুঘর (বগুড়া), পাহাড়পুর জাদুঘর (নওগাঁ), ময়নামতী জাদুঘর (কুমিল্লা), উপজাতীয় সাংস্কৃতিক জাদুঘর (ময়মনসিংহ ও রাঙ্গামাটি), লালন জাদুঘর (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি (কুষ্টিয়া), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাচারিবাড়ি স্মৃতি জাদুঘর (সিরাজগঞ্জ) ইত্যাদি।

Draft Copy

Draft Copy

মানচিত্রে জাদুঘরগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখাতে হবে।

জাদুঘর নিয়ে অনুসন্ধান ও দলীয় উপস্থাপনা

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন। তারপর কীভাবে মা, বাবা সহ পরিবার, এলাকার মুরুব্বী এবং স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জাদুঘর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেবেন। এরপর সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে প্রতিটি দল একটি করে রচনা লিখবে। রচনার মধ্য দিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধান করা হবে:

- জাদুঘরে কী নিদর্শন থাকে?
- এইসব নিদর্শন কেন ও কীভাবে রাখা হয়?
- এই নিদর্শনাবলী থেকে কীভাবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করা যায়?
- মানুষের জীবনে জাদুঘরের গুরুত্ব কী?

চলো, প্রতিটি দল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের উপস্থিতিতে দলীয় উপস্থাপনা প্রদান করি। ছবি এঁকে, হাতে বানিয়ে কিছু উপকরণ প্রদর্শন করি।

কার্বণ-১৪ কলা-কৌশল

বিভিন্ন প্রত্নস্থলে খনন করে যেসব উপাদান পাওয়া যায় তার বয়স বা সময়কাল নির্ণয় করা যায় কার্বণ-১৪ নামে একটি পরীক্ষার মাধ্যমে। তার মানে যে কোনো স্থানে পাওয়া জিনিসপত্রই কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান নয়। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো যখন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় তখনই কেবল এগুলো প্রত্ন উপাদান হিসেবে গণ্য হয়। আর কার্বণ-১৪ পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ে বিস্তারিত জেনেছো। এই পদ্ধতির প্রয়োগ এগুলোর প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে বা সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। ফলে, এ ধরণের উপাদান সাহিত্যিক উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গৃহীত হয়।

তাম্রশাসন কেন প্রাচীনকালের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উৎস?

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলোর মধ্যে তাম্রশাসন খুব গুরুত্বপূর্ণ। বলা যেতে পারে, প্রাচীনকালের সবচাইতে বিশ্বস্ত উৎস বা উপাদান। এটা সবচাইতে বিশ্বস্ত, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই উৎসের কোনো প্রকার সীমাবদ্ধতা নাই। তাম্রশাসন মূলত ভূমি লেন-দেন কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল। তাম্রপট্ট বা তামার পাতের উপর খোদাই করে লিখিত হতো বলেই এগুলোকে তাম্রশাসন বলা হয়ে থাকে।

প্রাচীন বাংলার তাম্রশাসনের চিত্র

ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল হলেও তাম্রশাসনগুলোতে আরও অনেক কিছু বর্ণনা করা হতো। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আইন-কানুন আর প্রশাসনিক ব্যবস্থার চিত্র এখানে তুলে ধরা হতো। যে জমি দান, বিক্রি বা কেনা হবে তার অবস্থান, স্থানের নাম, শাসকের নাম, গাছ-গাছালি, সে সময়ের ধর্ম-বিশ্বাস, হাট-বাজারসহ পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের নানান তথ্য তাম্রশাসনে লিপিবদ্ধ করা হতো। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, আঞ্চলিক বাংলায় এই ধরণের প্রায় পাঁচ শতাধিক তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। এগুলো বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সহ বিভিন্ন স্থানে সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত শতাধিক তাম্রশাসন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জাদুঘর ও প্রতিষ্ঠানেও সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা এইসকল তাম্রশাসনের মধ্যে মাত্র দেড় শতাধিক তাম্রশাসন পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন এই মহামূল্যবান দলিলের অনেকগুলোই এখন পর্যন্ত পাঠোদ্ধারের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

Draft Copy

প্রাচীনকালের তাম্রশাসনগুলো থেকে তথ্য উদ্ধারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খন্ডে মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রূপান্তরের আরো অনেক আকর্ষনীয় তথ্য জানা যাবে। এর মাধ্যমে ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজ এগিয়ে যাবে বহুদূর। তোমরা মনে রাখবে, প্রাচীন এই উৎসগুলো বিভিন্ন যুগে আঞ্চলিক বাংলার মানুষের বহুমাত্রিক সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, পরিবেশ, সুখ-দুঃখের নানান চিত্র, অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিকে ধারণ করে। তবে যে রাজার সময়ে উৎকীর্ণ বা জারি করা হতো তাম্রশাসনগুলো-তে সেই রাজা ও তাঁর বংশের গুণকীর্তন করা হতো। ইতিহাসসম্মত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে, সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এই গুণকীর্তন থেকেও সত্যটুকু খুঁজে বের করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

অনুসন্ধানী কাজ: ১

চলো পোস্টার বানাই: তাম্রশাসন নিয়ে অনুসন্ধান

শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দিলেন এবং একটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করলেন। শিক্ষার্থীরা দলভিত্তিক পোস্টার তৈরি করবে। পোস্টারে একটি তাম্রশাসনের ছবি যুক্ত করতে হবে। তারপর নানান রং-এ লিখতে হবে একটি তাম্রশাসনে ইতিহাসের কী কী তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে? তাম্রশাসনে পাওয়া তথ্য থেকে কীভাবে ইতিহাস জানা যাবে সেই উপায় নিয়েও পোস্টারে ছোটো ছোটো লেখা যুক্ত করা যাবে।

মৃৎপাত্র এবং পোড়ামাটির ফলক থেকে ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ

তাম্রশাসন ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের মৃৎপাত্র। তোমরা জেনে অবাক হবে যে, বাংলা অঞ্চলে এমন কিছু মৃৎপাত্র তৈরি হতো যা বাংলার বাইরেও রপ্তানি হতো। অত্যন্ত মসৃণ, কালো রংয়ের কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া যেত যেগুলো বাংলা এবং বাংলার বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচিত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মাটি ছিল এই ধরণের মৃৎপাত্র তৈরির অন্যতম কাঁচামাল। এগুলো থেকে তৎকালীন সময়ের সাংস্কৃতিক জীবনের মান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের পাশাপাশি নগর-সভ্যতার সময়কাল নির্ধারণেও সাহায্য করে। প্রত্নস্থলে পাওয়া একটি পাত্রের গড়ন, নকশা প্রভৃতি দেখে সেই ধারণা পাওয়া যায়, মানুষ কতবছর আগে এইগুলো ব্যবহার করতো।

পোড়ামাটির ফলক বা টেরাকোটা ইতিহাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো যেন অতীত মানুষের জীবনের বাস্তব প্রতিরূপ। ফলকে অঙ্কিত থাকে নানান রকমের চিত্র। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানান ঘটনা, পশুপাখি ও জীবজন্তু, নারী সমাজের কর্মমুখর দিনলিপি, সাধারণ মানুষের অবসর-বিনোদন, সংস্কৃতির প্রতীক, বিভিন্ন ধর্মের দেব-দেবী, ফুল-লতাপাতা সহ বিচিত্র সব দৃষ্টিনন্দন চিত্র ফলকে আঁকা থাকে। অনেক সময় রাজার যুদ্ধযাত্রার চিত্রও পোড়া মাটির ফলক বা টেরাকোটায় ফুটিয়ে তোলা হতো।

কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই এবং পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারে পোড়ামাটির অসংখ্য ফলক পাওয়া গেছে। নদীমাতৃক বাংলার সহজলভ্য কাদা মাটির সরবরাহ এই শিল্পকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল, জনপ্রিয় করে তুলেছিল। প্রথমদিকে ফলকগুলো দেয়াল সুসজ্জিত করার জন্য ব্যবহার করা হলেও পরে বৃষ্টির পানিতে যেন দেয়াল নষ্ট না হয়, সে উদ্দেশ্যেও এগুলো ব্যবহার করা হয়।

Draft Copy

মৃৎশিল্পীরা তাদের চারপাশে যা কিছু দেখতো তাই নিজেদের সৃষ্টিশীল চিন্তার মাধ্যমে ফলকগুলোকে ফুটিয়ে তুলতো। ফলে মানুষের জীবনের কর্মবহুল ও ঘটনাবহুল বহু বিষয় ফলকগুলোতে স্থান পেয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় প্রতীক, জীব-জন্তু ও পাখির ছবি, মানুষে-মানুষে যুদ্ধ, হিংস্র জন্তুর সাথে মানুষের যুদ্ধরত অবস্থার ছবি, মাছ, পদ্ম ও সূর্যমুখী ফুল, হালচাষরত কৃষক, অবসরে যুবকদের আড্ডাসহ নানান বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের সমাহার পোড়ামাটির ফলকে পাওয়া যায়।

পোড়ামাটির ফলক দেখে ইতিহাস শিখি

নিচে পোড়ামাটির ফলকের চিত্র দেয়া হলো। এই ফলকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কী কী চিত্র দেখতে পাচ্ছো তা খাতায় লিখে ক্লাসে সকলের সামনে উপস্থাপন করো।

চিত্র: প্রত্নস্থলে প্রাপ্ত পোড়ামাটির বিভিন্ন ধরনের ফলক

ইতিহাসের উৎস হিসেবে বণিক ও পর্যটকদের লেখা বিবরণী বা ভ্রমণকাহিনীগুলো কতোটুকু গ্রহণযোগ্য?

১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ের আঞ্চলিক বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্য জানার আরো একটি উপাদান রয়েছে। আর তা হলো বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগত পর্যটকদের বিবরণ। পর্যটকদের বিবরণগুলোকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রীক-রোমানদের বিবরণ, চৈনিকদের বিবরণ এবং আরবদের বিবরণ।

গ্রিক-রোমানদের বর্ণনা

গ্রিক-রোমানদের মধ্যে মেগাস্থিনিস, টলেমি, প্লিনির নাম উল্লেখযোগ্য। এদের বর্ণনায় আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্বাব্দ ৪র্থ শতকে মেগাস্থিনিসের লেখা 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে আমরা গঙ্গারিডাই রাজ্যের নাম পাই; যা মূলত আঞ্চলিক বাংলাকেই বোঝানো হয়েছে। এটি ছিল মূলত গঙ্গা নদীর দুটি স্রোতোধারার মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। অর্থাৎ বাংলার পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্বে পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ। এই ভূভাগের মধ্যে পড়েছে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ি, শরিয়তপুর, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জ সহ দক্ষিণের বেশ কিছু জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, তমলুক, এবং কোলকাতা সহ ভাগীরথী নদীর পূর্ব পাশের কয়েকটি জেলা। এই ভূ-খণ্ডটিই বেঙ্গল ডেল্টা বা

Draft Copy

বঙ্গীয় ব-দ্বীপ নামে পরিচিত। টলেমি ও প্লিনির বর্ণনায় (১ম শতকের) আঞ্চলিক বাংলার ভৌগোলিক পরিবেশ, বিভিন্ন উপ-অঞ্চলের অবস্থান, পণ্য-দ্রব্যের দাম বিশেষত বস্ত্র, বণিকদের জীবনযাত্রা, বাংলার সমৃদ্ধির নানান চিত্র ফুটে উঠে। তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, বাংলা কিংবা বেঙ্গল কিংবা বাংলাদেশ বলে কোনো নামের অস্তিত্ব কিন্তু সেই সময় ছিল না। প্রাকৃতিক সীমানা দিয়ে ঘেরা একটি অঞ্চল ছিল যেখানে কাল পরম্পরায় 'বাংলা ভাষা' গড়ে উঠেছে সেই ভূ-খন্ডটিকেই 'বাংলা' নাম-পরিচয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এই ভূ-খন্ডে বিভিন্ন সময়ে বসতি স্থাপনকারী মানুষেরা সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি গড়ে তুলেছে।

চৈনিকদের বর্ণনা

চীনদেশ থেকে আসা পর্যটকগণ মূলত বৌদ্ধ ধর্মের নানান ধারা-উপধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁদের বর্ণনা থেকে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিস্তার, মানুষের সমাজের নানান দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ফা-সিয়ানের (৫ম শতক) বর্ণনায় আমরা বাংলার পশ্চিমে অবস্থিত প্রাচীনতম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর তাম্রলিপ্তির কথা জানতে পেরেছি। এই বন্দর নগরীর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তমলুক জেলায়।

ফাসিয়ান (ফাহিয়েন), ইজিং (ইৎসিং), ষুয়ান জাং (হিউয়েন সাং) সহ আরো অনেক পর্যটক বিভিন্ন সময়ে বাংলা অঞ্চলে এসেছেন। তাদের বর্ণনায় উঠে এসেছে সমকালীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের নানান খন্ড-চিত্র। বিশেষ করে ষুয়ান জাং-এর বিবরণ থেকে আমরা বাংলা অঞ্চলে হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতির নানান শাখা-প্রশাখার নানান রূপ খুঁজে পেয়েছি- এই মন্তব্যে কোনো অত্যুক্তি নেই। ৭ম শতকের এই পর্যটক বাংলার প্রায় সব কয়টি উপ-অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন এবং প্রতিটি স্থানের সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষ, ধর্ম এমনকি কৃষিকাজের বিস্তারিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ষুয়ান জাং-এর বিবরণ তাই ইতিহাসের মূল্যবান উৎস।

আরবদের বর্ণনা

একইভাবে আরব ভূ-খন্ড থেকে আসা নাবিক ও বণিকদের বর্ণনায় আমরা ৯ম শতকের পর হতে ১৩ শতক পর্যন্ত সময়ের নানান তথ্য পাই। আরবদের বর্ণনায় বাংলার বাণিজ্যিক তথ্য বেশি পাওয়া যায়। মূলতঃ অষ্টম সাধারণ অব্দ হতে আরব ভূ-খন্ডের বণিকেরা সমুদ্র-বাণিজ্যের উপর একক কর্তৃত্ব আরোপ করেন। আরব সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগর হয়ে দক্ষিণ চীন সাগর পর্যন্ত আরবেরা বাণিজ্য পরিচালনা করতেন। আরব বণিকদের লেখনীতে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে সমন্দর বন্দরকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামাজিক জীবনের কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সমন্দর বন্দর ৯ম শতকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। বর্তমান চট্টগ্রাম বন্দরের আশে-পাশে কোথাও এর অবস্থান ছিল। যাহোক, আরব নাবিক ও বণিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুলায়মান, ইবনে খুরদাদবিহ্, আল মাসুদি প্রমুখ। তাদের বর্ণনায় বাংলার সূক্ষ্ম সূতী বস্ত্র এবং সুগন্ধী কাঠ সহ অন্যান্য অনেক পণ্যের তথ্য পাওয়া যায়।

উপরে তিন ধরণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছো। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে তথ্য গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে কেবল তথ্য নিলেই চলবে না, উপযুক্ত পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সমালোচনামূলক ব্যাখ্যা-বিশেষণ শেষে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ কিছু নির্দিষ্ট জায়গায় কিছু সময়ের জন্য বসবাস করতেন। তাই তাদের দৃষ্টিতে যতোটুকু ধরা পড়েছে তারা ততোটুকুই লিখেছেন। ফলে লেখায় একপেশে তথ্য

Draft Copy

থাকতে পারে। আবার অন্য অঞ্চল থেকে আসা পর্যটকগণ অনেক ক্ষেত্রে শাসকদের আপ্যায়ন গ্রহণ করতেন। ফলে, তাদের বর্ণিত তথ্যে অনেক সময় সমাজের সাধারণ মানুষের বিবরণ অনুপস্থিত থাকতো। এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলো থেকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের তথ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। পর্যটকদের প্রায় সবাই প্রাচীনকাল থেকে বাংলায় উৎপাদিত তুলা দিয়ে মসৃণ সূতিবস্ত্র তৈরি করা হতো বলে লিখে গেছেন। এগুলো সারাবিশ্বে সমাদৃত ছিল। মধ্যযুগেও বাংলা অঞ্চলের এই বস্ত্র ছিল অবিস্মরণীয় যা কিনা মসলিন নামে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল।

ইবনে বতুতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলায় যতো সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যেতো, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যেতো না। কিন্তু সস্তায় জিনিসপত্র কেনার মতো সামর্থ্য কতোজনের ছিল তা অবশ্য কোনো পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায় না। বাংলা অঞ্চলে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে সোনা, রূপা এবং তামার পয়সার প্রচলন ছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তবে সাধারণ মানুষ কড়ির মাধ্যমে বিনিময় করতো। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট ছিল। সমাজের একদিকে যেমন বিত্তবানদের বিলাসী জীবন, ঠিক তেমনি উল্টো দিকে সংগ্রামী মানুষ দু'মুঠো খাবারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করতো।

তাহলে পর্যটক কারা?

সহজ করে আরো একবার বলি- পর্যটক হলেন তারাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ, ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবন-যাপন, নানান বিশ্বাস ও প্রথা-পদ্ধতি, শিক্ষা ইত্যাদি জানার জন্য কোনো পৃথিবীর এক স্থান বা অঞ্চল থেকে আরেক স্থান বা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ান। বেড়াতে বেড়াতে তারা বিভিন্ন জায়গার সমাজ-সংস্কৃতি দেখেন, অধ্যয়ন করেন, পরের প্রজন্মকে জানানোর জন্য তা আবার কখনো কখনো লিখেও রাখেন। চাইলে আমরাও কিন্তু পর্যটক হতে পারি!

আমি এবার পর্যটক!

ভাবছো, কীভাবে পর্যটক হবো? তারা তো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। পর্যটক হতে হলে শুধু বহু দূরবর্তী স্থান বা অঞ্চলে ঘুরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা যে গ্রাম/ পাড়া মহল্লা/ জেলায় থাকি তার পার্শবর্তী যেকোনো স্থান বা দেশের ভেতরে অবস্থিত যেকোন জায়গায় ঘুরে পর্যটক হওয়া যায়। আমরা প্রতিবছরই পরিবারের সদস্যদের সাথে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চয়ই ঘুরতে যাই। এই ঘুরতে যাওয়াটাকেই আমরা কাজে লাগাতে পারি। এরপর থেকে আমরা নতুন যে স্থানেই ঘুরতে যাবো, সেখানে গিয়ে ওই জায়গার মানুষদের ভাষা, জীবন-যাপন, সংস্কৃতি, উদযাপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষা ইত্যাদি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবো। প্রয়োজনে ঘুরতে যাবার সময় পকেটে ছোট একটি নোট খাতা আর কলম রাখবো। যা দেখবো তাই তখনই ছোট করে টুকে রাখবো। সাথে দিন-তারিখ আর স্থানের নাম লিখে রাখতে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না। তারপর বাড়িতে ফিরে সেগুলো একটু সুন্দর করে একটি খাতায় লিখে রাখবো। ব্যস, আমিও হয়ে গেলাম একজন পর্যটক।

Draft Copy

অনুশীলনী

পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা

চলো, এবার তাহলে মজার একটা কাজ করি। আমরা যেখানে যেখানে ঘুরতে গেছি সে জায়গাগুলোর নাম লিখে ফেলি। তারপর সেখানকার মানুষদের ভাষা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি উদযাপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষার অবস্থা কেমন দেখেছি তা নিয়ে এক পাতার ছোট একটি রচনা লিখি। তারপর সবার লেখাগুলো নিয়ে একটি দেয়ালে পাশাপাশি লাগিয়ে বানিয়ে ফেলি পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা। দেয়াল পত্রিকাটি বিদ্যালয়ের এমন কোনো দেয়ালে টানিয়ে দিতে হবে যাতে করে চাইলে সবাই পত্রিকাটি পড়তে পারবে।

কোথাও বেড়াতে গিয়ে যদি আমরা ছবি তুলে থাকি, সেই ছবিগুলোও দেয়ালে টানাতে পারি। তবে প্রতিটা ছবির নিচে ছবির স্থান এবং ছবিতে থাকা কিছু উপাদানের বর্ণনা ছবিটির নিচে লিখে দেই। এতে পত্রিকাটি আরও বেশি আকর্ষণীয় হবে নিশ্চিত!

Draft Copy

অনন্যতায় একাত্মতা

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে। সেদিন তর্ক শুরু হলো পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বাস, তারা কেউ কারো মত নয়। কেউ একজন বলছিল যে এক একটি অঞ্চলের মানুষ একেক রকম, কিন্তু একটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বেশ মিল থাকে, এদের মধ্যে কিছু মানুষ তো একই রকম হতেই পারে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতেই ওই দিনের তর্কের সূত্র ধরে আবেদ জানতে চাইলো যে পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করে তাদের মধ্যে কিছু মানুষ একরকমের হতে পারে কিনা। ওর প্রশ্ন শুনে শিক্ষক একটুখানি ভাবলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাইলেন। দেখা গেল ওরা দুই রকমের কথাই বলছে। একদল বলছে যে মিল থাকলেও কখনও পুরোপুরি একরকমের হয় না। অন্য দল বলছে মাঝে মাঝে হুবহু একরকমের হতেও পারে। ওদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে শিক্ষক সকলকে একটি কাজ করতে বললেন। তিনি আরো বললেন যে এই কাজের মাধ্যমে ওদের প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজে বের করতে পারবে।

ষষ্ঠ শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের প্রথম অধ্যায় 'নানা পরিচয়ের আমি', যেখানে শিক্ষার্থীরা একটি কার্ডে নিজের সম্পর্কে লিখেছিল। এখন এ রকমেই একটি কাজ একটু ভিন্ন ভাবে করার কথা বললেন শিক্ষক। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার পাশের আসনের বন্ধুর সঙ্গে এক জোড় হয়ে কার্ডে নিজেদের সম্পর্কে পাঁচটি মিল ও পাঁচটি অমিল লিখবে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় 'সাদৃশ্য ও ভিন্নতা' থেকে ওরা মানুষের পরিচয়ের নানা রূপ দেখেছে। ষষ্ঠ ও সপ্তমের কাজের বিষয়ে শিক্ষক ওদের মনে করিয়ে দিলেন ওরা কী করেছিল, তারই অনুসরণে এখানে ওরা নিজেদের মিল ও অমিল লিখে ফেললো।

এবারে শিক্ষক ওদের কয়েকজনকে ওদের লেখা কার্ডে পড়ে সকলকে শোনাতে বললেন। শ্রেণির অন্য সকলকে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে বললেন। অন্তত পাঁচ জোড়া শিক্ষার্থীর মিল ও অমিল শোনার পর শিক্ষক অন্য কয়েকজনের কাছে জানতে চাইলেন যে এই মিল ও অমিল থেকে ওরা কী ভাবছে। সবশেষে তিনি ওদের বিতর্কের মীমাংসা নিজেরাই করতে পারবে বলে আশা প্রকাশ করলেন।

পরিচয়: বাঙালি মনীষি

নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা তোমরা জান। তিনি বহুদিন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ঐ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হলো অনেকগুলো কলেজের সমাহার। একসময় তিনি কেমব্রিজের সবচেয়ে খ্যাতিমান কলেজ ট্রিনিটির সর্বোচ্চ পদ মাস্টার অব ট্রিনিটি ছিলেন। সেই সময়ে একবার বিদেশ থেকে ফিরে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরের অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে পাসপোর্টটা দিয়ে যখন দাঁড়ালেন, তখন সেই ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানায় মাস্টার্স লজ (অর্থাৎ মাস্টারের বাড়ি), ট্রিনিটি দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ট্রিনিটির মাস্টার কি তোমার বন্ধু?

একজন ভারতীয় তাদের দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদের অধিকারী হবেন এটা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি। তখন অমর্ত্য সেনের মনে আত্মপরিচয় নিয়ে একটা দার্শনিক প্রশ্নের উদয় হল। মানুষ কি নিজের বন্ধু হতে পারে? অভিবাসন কর্মকর্তার প্রশ্ন তাঁর মনে এরকম একটা ব্যতিক্রমী দার্শনিক ভাবনা তুলে ধরেছিল। যা হোক, হিথরোর সেদিনকার সমস্যা শেষ পর্যন্ত সহজেই মিটেছিল, কিন্তু সে ঘটনা এবং তার সমকালীন কিছু

Draft Copy

ঘটনার প্রেক্ষাপটে অমর্ত্য সেনের মনে আরও কিছু প্রশ্ন মাথাচাড়া দেয়। আগে জানা যাক তখন কী ঘটেছিল পৃথিবীতে? তখন অধ্যাপক সেনের দেশ ভারতসহ কয়েকটা দেশে ভয়ঙ্কর জাতি-বিদ্বেষ ও তা থেকে দাঙ্গার মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল।

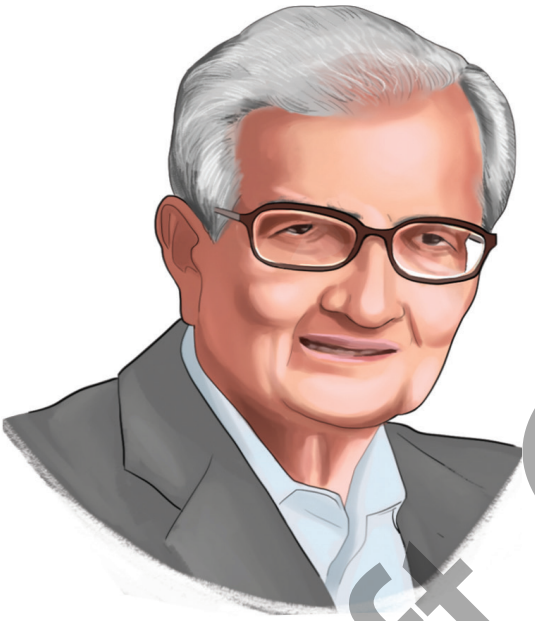

চিত্র: অমর্ত্য সেন

চিত্র: ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল

চিত্র: শান্তি নিকেতনের পাঠ ভবন

ট্রিনিটি কলেজের আলোক চিত্র

Draft Copy

গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরে পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশ যুগোশ্লাভিয়া ভেঙে বেশ কয়েকটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছিল। তার একটি বসনিয়া। যেখানে যুগ যুগ ধরে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা পাশাপাশি শান্তিতে বাস করে আসছিল। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান হলে হঠাৎ করে সেখানে খ্রিস্টানে-মুসলমানে সংঘাত বেধে যায় এবং মুসলমানরা ব্যাপকভাবে নিহত ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হয়। একই সময়ে আফ্রিকার দেশ রুয়ান্ডায় বসবাসরত দুই গোত্র হুতু ও তুৎসিদের মধ্যে বেধে যায় ভয়ঙ্কর হানাহানি। তার ফলে যে জাতিগত নিধন হয় তাতে প্রায় আট লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। এ উপমহাদেশে যেমন ঔপনিবেশিক শক্তি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রুল বা 'ভাগ কর ও শাসন কর' নীতি চালিয়েছিল রুয়ান্ডাতেও ঔপনিবেশিক বেলজিয়ানরা হুতু-তুৎসি এই দুই গোত্রের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছিল। তাতে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকবারই দাঙ্গা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালে মাত্র তিন মাসের গণহত্যায় আট লাখের মত তুৎসি ও উদার হুতু নিহত হয়েছিলেন। ভাবা যায়! প্যালেস্টাইনে মুসলিম ও ইহুদিদের সংঘাত তো চলছে বহুকাল ধরেই এবং এর একতরফা শিকার হচ্ছেন ফিলিস্তিনি মানুষ। এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতও অধ্যাপক সেনকে ভাবিয়েছে। সবমিলিয়ে তিনি একটি বই লিখেছেন, নাম-আইডেনটিটি অ্যান্ড ভায়োলেন্স অর্থাৎ আত্মপরিচয় ও সহিংসতা। বইতে বিস্তর আলোচনার পর তিনি দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক মানুষের অনেক পরিচয় থাকে। যেমন নিজের পরিচয় দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন একই সময়ে আমি একজন এশীয়, একজন ভারতীয় এবং একজন বাঙালি। একজন অর্থনীতিবিদ, যার দর্শনে আগ্রহ রয়েছে, একজন লেখক, সংস্কৃতজ্ঞ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী, একজন পুরুষ যার সহানুভূতি রয়েছে নারীবাদের প্রতি, হিন্দু পারিবারিক ঐতিহ্যে বড় হলেও ব্যক্তিগত জীবনে আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবিত নন ইত্যাদি। হয়ত এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়।

তোমরা এবারে একটা কাজ করবে। তবে তার আগে অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা জেনে নাও।

অমর্ত্য সেনের জন্ম ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে। বাবা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক। মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠজন শান্তিনিকেতনের প্রধান ব্যক্তিদের একজন পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কন্যা অমিতা সেন। ক্ষিতিমোহন ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাচীন বৈদিক হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে সুশিক্ষিত এবং মধ্যযুগের উত্তর ও পূর্ব ভারতে হিন্দি ও নানা দেহাতি ভাষায় যে মানবতাবাদী লোকধর্মের চর্চা হয়েছিল তার একজন অনুরাগী পাঠক ও গবেষক। তাঁর কথা একটু বেশি বললাম কারণ অমর্ত্য সেনের মানস গঠনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। পিতার সূত্রে তাঁর মা অমিতা সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা এবং রবীন্দ্রনৃত্যের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। সেই সুবাদে তাঁর সন্তানের নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমর্ত্য সেনের পড়াশুনা শুরু হয়েছিল ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। তারা থাকতেন তখনকার ঢাকার অভিজাত আবাসিক এলাকা ওয়ারিতে। এখানে থাকার সময়ে বারো বছর বয়সে তিনি জীবনের এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন যা আজীবন তাঁকে ভাবিয়েছে এবং কষ্ট দিয়েছে। তখন হিন্দু-মুসলিমে দাঙ্গা বেধেছিল। এ সময় দোতলার বারান্দা থেকে তিনি দেখতে পান তাঁদের এলাকার নিতান্ত দরিদ্র দিনমজুর কাদের মিয়া প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছে আর তার পেছনে কয়েকজন তাকে তাড়া করছে। একসময় দরিদ্র দুর্বল মানুষটা উন্মত্ত জনতার হাতে ছুরিকাঘাতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে আর বাঁচানো যায়নি। বালক বয়সের এই দুঃসহ স্মৃতি তিনি বৃদ্ধ বয়সেও

Draft Copy

ভুলতে পারেন নি। আত্মজীবনীতে এ প্রসঙ্গ তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

পরে অমর্ত্য বাবা-মায়ের সাথে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং সেখানকার স্কুল পাঠভবনে ভর্তি হন। পরে সেখানকার কলেজ থেকে আইএসসি (এখনকার এইচএসসি) পাস করেন। এখানে তিনি অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। আর সেখানে ছিল অবারিত প্রকৃতি, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ তাঁর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছে। আর তা মানুষটির বহুমাত্রিক পরিচয় তৈরির সহায়ক হয়েছে।

তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন অর্থনীতি নিয়ে। এখানেও সহপাঠি এবং শিক্ষক উভয় দিক থেকেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান। নিজের কৃতিত্বে ও বাবার সহযোগিতায় পরে পড়তে যান ইংল্যান্ডে। এখানে কেম্ব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও পিএইচডি করেন। তারপরে দেশে ফিরে দিল্লি ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়িয়েছেন। একসময় ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। পরবর্তী দীর্ঘ কাল ইংল্যান্ড, বিশেষত কেমব্রিজ ছিল তাঁর আবাস। প্রায় দশ বছর তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ে অধ্যপনা করেন। তিনি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কল্যাণ অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করে যুগান্তকারী বই লিখেছেন। অর্থনীতিতে অবদানের জন্যে তিনি ১৯৯৮ সনে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অর্থনীতির পাশাপাশি তিনি দর্শনও পড়িয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেলজয়ী সাহিত্যিক নাদিন গার্ডিমার অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আখ্যা দিয়েছেন 'বিশ্ব বুদ্ধিজীবী'। তাঁকে বিশ্ব বিবেকও আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছেন, তেমনি স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায়ও পাশে থেকেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে অমর্ত্য সেন একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন। বর্তমানে প্রায় ৯০ বছর বয়সেও পৃথিবী ও মানবতার যেকোন সংকটে তাঁর বিবেকী কণ্ঠস্বর শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯১২) যুগোশ্লাভিয়া একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ [স্বীকৃত হয়/প্রতিষ্ঠা পায়] লাভ করে। এখন, এক শত বছরের আগেই সেই রাষ্ট্র আর নেই। সামান্য কিছু রদবদলের পর সেই ভূখণ্ড বর্তমানে সাতটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেয়েছে। ক্রোয়েশিয়া (১৯৯১), স্লোভেনিয়া (১৯৯১), উত্তর মেসিডোনিয়া (১৯৯১), বোসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা (১৯৯২), মন্টিনেগ্রো (২০০৬), সার্বিয়া (২০০৬), কোসোভো (২০০৮)। এই অঞ্চলের বর্তমান অবস্থায় আসার পথ অনেক ঘটনাবহুল। রাষ্ট্রটির জন্মের ত্রিশ বছর পর একবার এবং আরো পয়তাল্লিশ বছর পর আর একবার রাশিয়ার ভাঙনের কালে বড় ধরনের রদবদল ঘটে। যুগোশ্লাভিয়া নামেরই বিলুপ্তি ঘটে, পাঁচটি দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে আরো কিছু রদবদলের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় ভারতবর্ষের চেয়েও অনেক বেশি ওই অঞ্চলের মানুষদের জাতীয় পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটেছে। তোমরা যারা অষ্টমের শিক্ষার্থী, খেয়াল করে দেখ তোমাদের মা-বাবার মা ও বাবা পাকিস্তানী ছিলেন এবং তাঁদের মা-বাবা ছিলেন ভারতীয় (তখন বলা হতো বৃটিশ-ভারত)। কিন্তু তোমাদের মা-বাবা ও তোমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। স্লাভদের (ওই অঞ্চলের মানুষদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়) ক্ষেত্রে নিজের জীবনেই অনেকের একাধিকবার জাতীয় বা নাগরিক পরিচয় পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক কিংবা সাংস্কৃতিক পরিচয় অপরিবর্তিত ছিল। এইসব কিছু ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস।

Draft Copy

প্রফেসর অমর্ত্য সেনের বইয়ের আলোচনার সূত্রেই একবার মনে কর ১৯৪৭ সনের দেশভাগের কথা। তখন ব্রিটিশরা উপমহাদেশকে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি দেশে বিভক্ত করে স্বাধীনতা মেনে নেয়। যদিও এ উপমহাদেশের সর্বত্র হিন্দু ও মুসলমানসহ বহু ধর্মের মানুষ শত শত বছর ধরে একসাথে শান্তিতে বাস করে এসেছে তবুও ঔপনিবেশিক শক্তির ইন্ধনে ও দেশের কিছু রাজনীতিকের কারণে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। স্বাধীনতার আগে বাংলা, বিহার ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছিল। উভয় দিকে বহু মানুষ খুন হয়েছেন, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সহায় সম্পদ ফেলে দেশান্তরি হতে বাধ্য হয়েছেন। এই রকম প্রেক্ষাপটে ঢাকার রাজপথে দিনমজুর কাদের খুন হয়েছিলেন। একই রকম ঘটনায় ঢাকার রাজপথে তরুণ লেখক সোমেন চন্দ খুন হন। তিনিও খুনিদের ছুরির ঘায়ে মৃত্যুবরণ করেন। অমর্ত্য সেন তাঁর বইতে বলেছেন মানুষ যখন তার বহু পরিচয় ভুলে কোনো একটি পরিচয়কে প্রকট করে তোলে, তা নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে বিবেচনা কমে গিয়ে আবেগের প্রাবল্য দেখা দেয়, যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস জন্মায়। আমরা জানি অন্ধ রাগ থেকে আরও অনেক নেতিবাচক বোধের জন্ম হতে পারে। এতে সহানুভূ,তির পরিবর্তে ঘৃণার জন্ম হয়। এর ফলে শান্তি নষ্ট নয়। অনেক সময় দেখা যায় ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের অন্ধ সমর্থকদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। সেই সময় মানুষগুলোর মনে কেবলমাত্র ক্লাবের প্রতি আনুগত্যই প্রাধান্য পায়।

দিনমজুর কাদের মিয়া বা তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যার ঘটনা যেমন আমাদের বিচলিত করে, মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনের উন্মত্ততায় আমরা হতবাক হয়ে যাই তেমনি আবার ভরসা ফিরে পাই যখন দেখি পৃথিবীর ভিন্ন ভাষী ভিন্ন ধর্মের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ন্যায্য লড়াইয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকর ১৯৭১ এর আগস্টে নিউইয়র্কে আয়োজন করেছিলেন কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। ফ্রান্সের লেখক ও পরে মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলন। আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যেমন পাশাপাশি লড়াই করেছে তেমনি জীবনও দিয়েছে এক সাথে। বোঝা যায় সব মানুষ কখনও একসাথে তাদের বোধ বিবেচনা হারায় না।

উপরের আলোচনা ও অন্যান্য উৎস ব্যবহার করে প্রফেসর সেনের আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করবে। এরপরে তাঁর এত সব বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হওয়ার কারণগুলো খুঁজবে। তারপরে প্রত্যেকে নিজ নিজ আগ্রহের ক্ষেত্র (কোন বিষয়ে তুমি আগ্রহী বা ভবিষ্যতে আগ্রহী হতে চাও তাও বিবেচনায় রাখবে) তালিকাবদ্ধ করবে।

চিত্র: সত্যজিৎ রায়

এরপর একদিন শিক্ষকের কাছ থেকে বিখ্যাত বাঙালি চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে জানতে পার। তাঁর সাথে অমর্ত্য সেনের জীবনের মিল আছে। কিন্তু তাঁরা দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ও অমর্ত্য সেনের মতই একজন বাঙালি, যার পূর্বপুরুষদের বাস ছিল বাংলাদেশে, কিশোরগঞ্জ জেলার মশুয়া গ্রামে। তিনিও অমর্ত্য সেনের মতই রবীন্দ্রনাথের স্নেহ পেয়েছেন। সত্যজিৎ রায়ও একই রকম ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ও গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল। তাঁরা দু জনই শান্তিনিকেতন ও কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন। দু'জনেই সঙ্গীত ভালোবসেন, ভালো ইংরেজি জানেন। বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের রয়েছে গভীর ভালোবাসা। তাঁরা দু'জনেই লেখক। কিন্তু এত মিল সত্ত্বেও তাঁদের দু'জনের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা একজনের পেশা অধ্যাপনা, অন্যজনের চলচ্চিত্র নির্মাণ।

Draft Copy

শিক্ষকের সহযোগিতায় এবারে তোমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে এ দুইজন মনীষীর মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ভিন্ন ক্ষেত্রে কেন বিখ্যাত হলেন তার কারণগুলি খুঁজে বের করবে। একটা মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে তোমরা কাজটি করতে পার।

প্রথমে সত্যজিৎ রায় ও অমর্ত্য সেনের মিলগুলো খুঁজে বের করবে। তারপর বের করবে অমিলগুলো। সবশেষে আরও ভাবনাচিন্তা করে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে সফল হওয়ার কারণগুলো খুঁজতে হবে। তারপর তিনধাপে প্রাপ্ত তথ্যগুলো বড় কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষে টাঙিয়ে দেবে এবং তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও অনন্যতার কারণ খুঁজবে।

এতক্ষণ আমরা মোটামুটি সরলভাবেই আলোচনা করেছি। কিন্তু মানুষের জীবনে বহুরকম সম্পর্ক তৈরি হয় যা কিছু দলীয় বা সংঘবদ্ধ পরিচয় তৈরি করে। দেখবে অনেক সময় দেশ, জেলা বা শহরের নামে সমিতি হয়। ভিন্ন দেশ, জেলা বা শহরে বসবাসকারী একই দেশ, জেলা বা শহরের মানুষজন নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কোনো ভালো লক্ষ্য থেকেই সমিতি গড়ে তোলেন। আমরা তো জানি মানুষ সামাজিক প্রাণী, সমাজ অর্থাৎ পরিচিত, সমমনা মানুষ ছাড়া তার ভালো লাগে না। মানুষ আজকাল বেশি গড়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন। এভাবে পেশাভিত্তিক সমিতি যেমন আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, সাংবাদিক সবারই এরকম একক পেশাগত পরিচয়ে সংগঠন থাকে। এগুলো পেশাগত কাজে যেমন ভূমিকা রাখে তেমনি মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়ও পালন করে। অনেকে ক্লাব গঠন করে খেলাধূলা, নাটক চর্চা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কাজও করেন। আবার দেখা যায় চাকুরিতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষও সংঘবদ্ধ হন, মূল উদ্দেশ্য অবসর জীবনে নিরাপদ, ভালো ও আনন্দে থাকা। সমিতি সে লক্ষ্যে আয়োজন করে থাকে। ইদানীং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররাও নানা সংগঠন তৈরি করে পুনর্মিলনীর আয়োজন করে। এর মধ্যেও মানুষের সামাজিকতার প্রমাণ মেলে।

এসবই মানুষের স্বাভাবিক কাজ। সমস্যা হয় যদি কেউ যুক্তি, বিবেচনার পথ পরিহার করেন। অনেক সময় সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচন নিয়ে দলাদলি হয়, তখন আবার সদস্যদের সমিতির কর্মকর্তার পরিচয় বাদ দিয়ে অন্য পরিচয়ে উপদলে ভাগ হতে দেখা যায়, যেমন সদস্যদের মধ্যে যাদের বাড়ি এক জায়গায় বা ধর্ম এক, বা একই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ইত্যাদি পরিচয়ে এ কাজ হতে পারে। এ ধরনের উপদলীয় ভাবাবেগ যখন যুক্তি ও বিবেচনাকে ছাপিয়ে যায় তখন সমিতি বা সংগঠনে কোন্দল দেখা দেয়। অনেক সময় এ নিয়ে মামলা হয়ে সমিতির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি সমিতি দুইভাগ হয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখবে কোথাও কেউ বা কেউ কেউ সহজ যুক্তি ও স্বাভাবিক বিবেচনা, বিশেষ করে পরিচয়ের ভিন্নতা তোয়াক্কা করেন নি বলে এ ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। প্রফেসর সেন কিন্তু যুক্তি ও বিবেচনার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন।

এদিকে আবার আমরা মানুষকে, হয়ত বোঝা বা বোঝানোর সুবিধার জন্যে, শ্রেণিকরণ করি, যেমন শ্রমজীবী, দোকানদার, হকার, সরকারি কর্মচারি বা তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, জেলে, গাড়ি চালক ইত্যাদি। এই শ্রেণিগত অবস্থানে যারা থাকেন তাদের নিশ্চয়ই সর্বজনীন কিছু ইস্যু থাকে, কিন্তু তা-ই মানুষের একক বা চূড়ান্ত পরিচয় হতে পারে না। তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই অনেকে গাইতে পারেন, অনেকে কবিতা লিখেন, কেউবা জমিয়ে গল্প বলতে পারেন, কেউ চমৎকার রাঁধেন, কেউ কোনো বাদ্য যন্ত্র বাজান ইত্যাদি। মানুষকে কেবল একটা বর্গে বা শ্রেণিতে ঠেলে দেওয়া এবং একক পরিচয়ের মোড়কে তাদের ব্যক্তি-পরিচয়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বাতিল করে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। তাতে আসলে মানুষটি অবহেলিত হন।

তোমরা অনেকে মণি সিংহ এবং ইলা মিত্রের নাম শুনেছ। তাঁরা এ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে একসময় সক্রিয় ছিলেন। একজন ছিলেন জমিদার পুত্র আর অন্যজন জমিদারের পুত্রবধূ। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই অভিজাত

Draft Copy

পরিবারের সুখ সাচ্ছন্দ্য বাদ দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে নিগৃহীত প্রজাদের পক্ষে কাজে নেমেছিলেন। মণি সিংহ কাজ করেছেন ময়মনসিংহ অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হাজংদের মধ্যে, আর ইলা মিত্র কাজ করেছেন রাজশাহী অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতালদের মধ্যে। এভাবে তাঁরা জমিদার বাড়ির ছেলে বা বৌয়ের পরিচয় ছেড়ে সমাজের হতদরিদ্র ও নানাভাবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পক্ষে কাজ করে একেক জন সংগ্রামী রাজনৈতিক কর্মী হয়ে উঠেছিলেন।

কমরেড মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০)

ইলা মিত্র (১৯২৫- ২০০২)

পরিস্থিতি এবং নিজের বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা অনেক সময় নিজেদের কোনো একটি পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি বা নতুন একটি পরিচয় গ্রহণ করি, যেমন মণি সিংহ ও ইলা মিত্র নিয়েছেন। একইভাবে ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন অন্যদিকে তেমনি হানাদার পাকবাহিনীও আমাদের বাঙালি পরিচয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। সেদিন বাঙালিদের মধ্যে গায়ক শহীদ আলতাফ মাহমুদ, চিত্রকর যেমন শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দীন, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান, আমলা তৌহিদ-ই-এলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম প্রমুখ বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ তাদের বিচিত্র আগ্রহ ও পরিচয়কে বাদ দিয়ে কেবল বাঙালি পরিচয়কেই একমাত্র করে দেখেছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কেউ কেউ শহীদ হয়েছেন। আর পাকিস্তানিরাও আমাদের বৈচিত্র্যময় পরিচয়গুলো ভুলে কেবলমাত্র বাঙালি হিসেবে গণ্য করে হত্যার লক্ষ্যে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এমন এমন জাগরণ ঘটেছিল, এমন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে বহু মানুষ তাদের এতদিনের রাজনৈতিক আনুগত্য বা পছন্দের দলের অবস্থান কি তা ভাবনা থেকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। বলা যায় এ ছিল জাতি হিসেবে এদেশের বাঙালির কাছে ইতিহাসের বিশেষ সন্ধিক্ষণের চাহিদা।

শহীদ আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১)

চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

চিত্রকর শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন (১৯৫০-)

Draft Copy

সেদিন এ চাহিদার ন্যায্যতা এত স্পষ্ট ছিল যে এদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতির মানুষও মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তেমনি বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থের সংঘাত হলেও সেদিন মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের দূরত্ব ভুলে গিয়ে ভাষা-জাতি পরিচয়ে এক হয়েছিল। আর এ অভাবিত ঘটনা ঘটেছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বের গুণে। এবং এ কারণেই তিনি ইতিহাসের মহানায়ক।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমাদের একেক জনের অনেক পরিচয় থাকেন কেবল এটুকু বললে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায় না। পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে অনেক রকম বিকল্প পরিচয়, এমনকি কখনও একক পরিচয়ও প্রাধান্য পায়। তখন অন্য পরিচয়গুলো সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়। অমর্ত্য সেন তাই পরিচয় পছন্দের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যেন যুক্তি ও বিবেচনা প্রয়োগ করেই নিজেদের বৈচিত্র্য ও একত্বের বিষয়গুলো নির্বাচন করি।

তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছ আমাদের বড় হতে হতে অনবরত নানা রকম বিকল্প বা সম্ভাবনার মধ্যে থেকে নিজের জন্যে সঠিক, উপযুক্ত এবং মানানসই সিদ্ধান্তটি নিতে হয়। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস (শার্ট, চশমা, জুতা প্রভৃতি) বই (কবিতা, গল্প, নাটক বা লেখকের ভিত্তিতে) খাদ্য (মাছ না মাংস, খিচুড়ি না পোলাও ইতাদি), শখ, বিনোদন, আদর্শ, পেশা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই অনবরত আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, মতামত নিচ্ছি। আমরা যেভাবে এখানে বিকল্পগুলো লিখলাম সেটা আবার অনেকের কাছে বিলাসিতার মত শোনাতে পারে। নিজের পছন্দ নির্ধারণের সময় পরিপার্শ্ব ও অন্যদের বিষয়ও বিবেচনায় থাকা দরকার বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ আমরা সমাজে বাস করি, আমার সমাজের মানুষের অভ্যাস-রুচি ইত্যাদি নিয়ে ভাবতে হবে। ধনি-দরিদ্র সবাই অনবরত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অনেকগুলোর মধ্যে নিজেরটা বাছাই করছে। তাতে প্রয়োজনের পাশাপাশি আর্থিক সক্ষমতার প্রশ্নটাও এসে যায়। তাই আসে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন অর্থাৎ কোনটা আগে করতে হবে কোনটা পরে করলে চলবে তা নির্ধারণ করা।

ফলে এই আলোচনায় শেষ কথা হল সব সময় যুক্তি ও বিবেচনাকে প্রাধান্য দিতে হবে। অযৌক্তিক বা অবিবেচকের মত কাজ করা যাবে না। আর সেজন্যে মন যতটা শান্ত, খোলামেলো থাকে আর মস্তিষ্ক যতটা পরিষ্কার, শাণিত ও বুদ্ধি খাটাতে প্রস্তুত থাকে ততই সবার মঙ্গল।

এবারে আদনান সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করল, কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন ভারতীয়? তক্ষুণি হেলাল উত্তরে বলল, ঋষি সুনাক, যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

উৎসাহ পেয়ে রাবেয়া বলল, বাহ, টিউলিপ সিদ্দিকী তো যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় এমপি। বাংলাদেশের মেয়ে, বঙ্গবন্ধুর নাতনি। মায়া যোগ করল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্নী, তাঁর ছোটবোন শেখ রেহানার কন্যা। এসব শুনে সবাই বেশ উৎসাহিত হল। হয়ত তোমরা ভাবছ ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ এভাবে অন্য দেশের বিশিষ্ট মানুষ হবে।

আসলে খোঁজ নিলে দেখবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম ভিন্ন দেশের মানুষজন অনেক বড় বড় পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ধরো, বিশ্বের একসময়ের সর্বোচ্চ ভবন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের নকশা করেছেন বাংলাদেশি প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান। তাঁকে বলা হয় আকাশচুম্বি বহুতল ভবনের প্রকৌশলের জনক। ফজলুর রহমান খানের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি ছোট শহরে। তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা শেষ করে উচ্চতর পর্যায়ের অধ্যয়নের জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। পরে সেখানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ সংস্থায় কাজ করার সূত্রে আকাশচুম্বি ভবনের নির্মাণকৌশল আবিস্কার করেন। এই আবিস্কারের বিশেষত্ব হলো, এর মাধ্যমে অতিরিক্ত উঁচু ভবন নির্মাণে

Draft Copy

বাতাসের গতি ও ভূকম্পনের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ। প্রকৌশলী খানের উদ্ভাবিত টিউব পদ্ধতি পরবর্তীকালে সুউচ্চ ভবন নির্মাণে সবাই ব্যবহার করছেন। স্থাপত্য ও কাঠামো-প্রকৌশলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের এই মানুষটি একজন কিংবদন্তি বিশেষ। পর পর ছয় বছর তিনি আমেরিকার সেরা স্থপতির রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন। সর্বশেষ এই সম্মানের সাল ১৯৭১ সাল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর। ফজলুর রহমান খান তাঁর কতিপয় আমেরিকান বন্ধু এবং আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের সহায়তায় মুক্তযুদ্ধে সহায়তার জন্যে ওয়েলফেয়ার আপিল ফান্ড এবং বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ গঠন করেন। প্রবাসে থেকে এবং একজন আমেরিকান হয়েও তিনি প্রকৃত বাঙালি ছিলেন, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

চিত্র: সিয়ার্স টাওয়ার ও প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খান (১৯২৯-১৯৮২)

তখনকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার থেকে সারা বিশ্বের পাকিস্তানী দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিলো। তিনি ওইসব বাঙালিদের চাকুরি ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রনে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ মার্চ ফজলুর রহমান খান মাত্র ৫৩ বছর বয়সে হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৯ সালে ফজলুর রহমান খানকে স্বাধীনতার পদক (মরনোত্তর) প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভুষিত করা হয়। ভেবে দ্যাখ, কোনো দেশের মানুষ কোথায় গিয়ে কীভাবে খ্যাতিমান হচ্ছেন, এমনকি বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাচ্ছেন।

তোমরা এবার বুঝতে পারছ একজন মানুষ একাধিক দেশের পরিচয় বহন করতে পারেন। তাছাড়া, তোমরা আগেই জেনেছ মানুষের চলাচল শুরু হয়েছে অনেক আগেই। শুনেছ যে আদি মানুষের উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত আফ্রিকায়। সেখান থেকে তাদের কিছু কিছু মানুষ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটা ছিল আদিকালের অভিবাসন। অভিবাসন এখনও আছে, তবে পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে।

এবার এই অধ্যায়ের ইতিহাসের পাঠ থেকে বাংলা অঞ্চলের আদি বসতির স্থানগুলো মানচিত্রে দেখে নাও।

Draft Copy

বাংলা অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তাদের বসতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির চার্ট তৈরি কর।

বাংলা অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তাদের বসতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির চার্ট তৈরি কর।

নৃগোষ্ঠী	বসতি	ভাষা	ধর্ম
গারো	শেরপুর		খ্রিস্টান ও প্রকৃতির পূজারি

সেদিন ক্লাসের সেরা ফুটবলার দীপককে দেখা গেল খোশ মেজাজে। তানিয়া জিজ্ঞেস করল, কিরে দীপক এত খুশি খুশি লাগছে কেন তোকে? দীপক হেসে বলল, আমাদের জমির ফসলের মামলায় আদালত দখলদারদের জরিমানা করেছে।

তখনই ক্লাসে ঢুকছিলেন সমাজবিজ্ঞানের স্যার, শেষ কথাটা তাঁর কানে গেল। ক্লাসে ঢুকে সবাইকে বসতে বলে উনি বললেন, দীপক এক্ষুণি যে কথাটা বলল তোমরা তা আরেকবার শোন। বলে তিনিই বাক্যটা বললেন‘আমাদের জমির ফসলের মামলায় আদালত দখলদারদের জরিমানা করেছে’। একটু হেসে তারপর স্যার বললেন, দ্যাখ এ বাক্যে একটি-দুটি ছাড়া বাকি শব্দগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

কয়েকজন সোৎসাহে বলে উঠল, আমরা জানতে চাই বৈশিষ্ট্যগুলো। তখন স্যার বললেন জমি, ফসল, মামলা, আদালত, দখলদার, জরিমানা এই শব্দগুলো বাংলাভাষায় এসেছে অন্য ভাষা থেকে। কোন ভাষা বলতে পার?

প্রশ্ন শুনে উৎসাহী একজন প্রশ্ন করল স্যার, উর্দু?

স্যার মাথা নাড়লেন।

এবারে হাসান, অর্পিতা, আসমা একসাথে বলল, বোধহয় ফার্সি। আসমা বলল, আমি শুনেছি আগে আমাদের দেশে ফার্সি ভাষার চর্চা ছিল।

এবারে স্যার হেসে বললেন, তোমাদের উত্তর অনেকটাই ঠিক আছে। শব্দগুলো আরবি-ফার্সি থেকে এসেছে বাংলায়। কেমনভাবে এলো?

ওর প্রশ্ন শুনে মনীষা বলল, আমরা সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসে পড়েছি যে এদেশে যেমন মঙ্গোলয়েড, নিগ্রোয়েডসহ নানা নৃগোষ্ঠীর মানুষের মিশ্রণ হয়েছে তেমনি আবার অষ্ট্রিক, কোল, মুন্ডা, তিব্বতি চৈনিক, দ্রাবিড় এবং আর্যভাষী মানুষ এসেছে।

Draft Copy

স্যার খোলসা করে বললেন, প্রথমে বলেছ নৃতাত্ত্বিক জাতির কথা। আর পরে বলেছ ভাষাভিত্তিক জাতির পরিচয়ের কথা।

তোমরা জেনে রেখো, ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন ভাষা হল নদীর মত, বহমান স্রোত, তাতে অনেক ভাষার শব্দ এসে মেশে আবার অনেক শব্দ হারিয়েও যায়, ব্যবহার হয় না আর। অনেক ভাষার মতই বাংলাতেও ভাষার ব্যাপক মিশ্রণ ঘটেছে, কারণ এখানে ইতিহাসের গতিপথ ধরে অনেক ভাষার মানুষই এসেছে। তবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় আর্যভাষীদের আনা সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশ জোরালোভাবেই ঘটেছে, বাংলাতেও তা রয়েছে। তোমরা ইতিহাস পড়ে জেনেছ যে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় তুর্কি-আফগান বিজয় ঘটেছিল। তারপরে বাংলা এবং ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম, পূর্ব অঞ্চলে তাদের প্রভাব বেড়েছে। তাদের মাধ্যমে দীর্ঘদিনে জায়গা করে নিয়েছে ফার্সি, এ ভাষা ছিল রাজভাষা বা শাসনকাজের ভাষা। তাদের মাধ্যমে ফার্সি ছাড়াও আরবি, তুর্কি, উর্দু, হিন্দি শব্দও বাংলা ভাষায় জায়গা করে নিয়েছে। এদের মাধ্যমে বাংলা ও ভারতে ইসলাম ধর্মেরও প্রসার ঘটেছিল। তারা একসময় দক্ষিণে মনে রেখো এ প্রভাব কেবল ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। তা খাদ্য, পোশাক, নাম, সঙ্গীত, চিত্রকলা, স্থাপত্য, উদ্যান রচনা পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

এবারে তোমরা দলে ভাগ হবে একটা কাজ ক আরবি-ফার্সি ভাষী যারা একদিন বাইরে থেকে এদেশে এসেছিল তাদের কাছ থেকে বাংলায় ও উপমহাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে কী কী প্রভাব পড়েছে তার একটা তালিকা তৈরি করি। এই বিষয়ে তোমরা কিছু কিছু জান, ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে।

ধর্ম	
পোশাক	
খাদ্য	
স্থাপত্য	
ভাষা	
সঙ্গীত	
চিত্রকলা	

Draft Copy

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

খেয়াল করলে দেখবে, ভাষায় নতুন নতুন শব্দের প্রবেশ কিন্তু থেমে নেই। তেমনি পোশাক খাদ্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রেই দেওয়া-নেওয়া চলছে। বলা হয় সংস্কৃতিতে গ্রহণ-বর্জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে আমরা আজকাল দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি করছি। অনেক আগেই টেবিল, চেয়ার, পিন, ফ্যান, ফ্রিজ, অ্যালার্ম, পুলিশ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানীং মাউজ, ক্লিক, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ছাড়া চলছেই না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তা বলে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ভুলে গেলেও চলবে না। ঐ যে বলা হয়েছে গ্রহণ-বর্জন সে কথাটা মনে রাখবে।

ভাবো একবার, এইভাবে নিতে নিতে আর ছাড়তে ছাড়তে মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে যায়। আর এইভাবেই কেউ হয়ে ওঠেন একজন অর্মত্য সেন, কেউবা হয়ে ওঠেন সত্যজিৎ রায়, কেউ জয়নুল আবেদীন, কেউ জসীম উদ্দীন। তোমরা এ বইয়ের (অধ্যায়রে নাম?) গ্রামের নদী-খাল-কাদা আর কৃষি ক্ষেতের মধ্য থেকে উঠে আসা বালক মুজিবের বঙ্গবন্ধু, এমনকি বিশ্ববন্ধু হয়ে ওঠার কাহিনি পড়ে নিও।

অমর্ত্য সেন বিদেশে বাস করলেও তাঁর স্বদেশের পরিচয় পাল্টান নি। তবে অনেকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। তোমরা অতীতের অভিবাসনের কথা জেনেছ। আবার আজকাল অভিবাসন শব্দটা খুব শোনা যায়। নিজের দেশ ছেড়ে মানুষ অন্য দেশে গিয়ে কেউ কাজ করে রোজগার করে, দেশে পরিবার চালায়। কেউবা পড়াশুনা করে নিজেকে আরও ভালোভাবে তৈরি করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ সপরিবারেও উন্নত দেশে বসতি করে।

জাতীয় পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির তারেকের মামা পনেরো বছর আগে উচ্চ মানের শিক্ষার জন্যে কানাডায় গিয়েছিলেন। পড়াশুনা শেষ করে সেখানে ভালো চাকুরি পেয়ে যান। সেখানেই বিয়ে করে সংসার পাতেন তারপর থেকে তিনি ওখানেই থাকেন। মাঝে মাঝে পুরো পরিবার নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। তারা সবাই কানাডার নাগরিক। বাঙালি হয়েও তারা কানাডিয়ান হিসেবে পরিচয় দিতে পারেন। অবশ্য মামা ও মামি এখনও রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশের নাগরিক, একই সঙ্গে কানাডারও নাগরিক। তাদের ছেলে মেয়েরা কানাডায় জন্ম নিয়ে কানাডার নাগরিক পরিচয় বহন করছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়। তাদের সন্তানেরা কানাডার নাগরিক হলেও নিজেদের বাঙালি হিসেবে পরিচয় দেয়। কারণ তারা মা-বাবার কারণে বাঙালি সংস্কৃতি ধারন করে, বাংলায় কথা বলে, খাদ্য-পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের দেশের আর সবার মতই। অর্থাৎ তাদের নাগরিক পরিচয় কানাডিয়ান হলেও তারা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি। কানাডায় ওদের পরিচয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে অভিবাসন আইন অনুসারে স্থায়ীভাবে বাস করতে হলে জন্মস্থানের দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হয়, তবে তারা নৃতাত্ত্বিক জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি। তারা ইচ্ছা করলে নাগরিক পরিচয়ে বাংলাদেশী হতে পারে, সেক্ষেত্রে কানাডায় তাদের নাগরিক পরিচয় হবে প্রবাসী হিসেবে।

Draft Copy

নাগরিকের ধারণা

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। নগর বা সিটি থেকে নাগরিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, প্রাচীনকালে নগরে বসবাসরত অধিবাসীদের নাগরিক বলা হতো। মানব সমাজ মূলত নগরায়নের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ধীরে ধীরে নগর রাষ্ট্রের জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নততর যোগাযোগ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে একত্র হয়েছে। একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে রাষ্ট্র-প্রদত্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করার অধিকার অর্জন করে।

অর্থাৎ, নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ঐ রাষ্ট্রে বসবাস করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান ও অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন । তবে একজন ব্যক্তি বসবাস না করেও কোনো রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানে অনুগত থেকে অন্য দেশে প্রবাসী হিসেবে বাস করতে পারেন কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেন। একজন নাগরিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবেন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখবেন । রাষ্ট্র নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র, নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

অন্যদিকে রিমঝিমের চাচা চাকুরি নিয়ে মালয়েশিয়ায় চলে গিয়েছিলেন প্রায় আট বছর আগে। কিছুদিন পর বাংলাদেশে এসে বিয়ে করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে চলে যান। কিছুদিন পর তাদের এক এক করে দুটি সন্তানের জন্ম হয়। এখন তারা চারজনের পরিবার, সকলেই মালয়েশিয়ায় বাস করছেন। কিন্তু তারা এখনও বাংলাদেশের নাগরিক। চাচা ও চাচি তো জন্মসূত্রেই বাংলাদেশী, তাদের সন্তানেরা মা-বাবার সূত্রে বাংলাদেশী। ওরা আরো অনেকদিন ওখানে থাকবে বলে ঠিক করেছে, প্রবাসী হয়ে তারা মালয়েশিয়ায় বসবাস করছে। তারা ওখানের নাগরিকত্ব নিতে চায় না কিংবা ওই দেশে নাগরিকত্ব নেওয়ার আইন হয়ত আলাদা। অধিক জনসংখ্যার দেশগুলো দেশের জনসংখ্যা বাড়াতে চায় না বলে অভিবাসন আইন জটিল করে রাখে।

আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় আমরা বাংলাদেশী, অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে জাতীয়তা বা ন্যশনালিটি বলা হয়। সেই অর্থে আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক (সাংস্কৃতিক, ক্ষেত্রবিশেষে জাতি বা বর্ণ ভিত্তিক) পরিচয়ে একটি দেশের মানুষের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকতে পারে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি বাঙালি আর সঙ্গে আছে আরো অনেক জাতিগোষ্ঠি। অর্থাৎ আমাদের পরিচয় যখন সংস্কৃতিভিত্তিক বা নৃতাত্ত্বিক, তখন আমরা বাঙালি অথবা চাকমা, সাঁওতাল, মান্দি বা গারো, হাজাং, খাসিয়া, রাখাইন ইত্যাদি। আমাদের দেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে অবাঙালি এইসব জনগোষ্ঠিকে এক কথায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বলা হয়। কোনো কোনো দেশে বা ক্ষেত্রবিশেষে সেই দেশের জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির তুলনায় অনেক কম কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতির এই জনগোষ্ঠিকে ইংরেজিতে ইথনিসিটি বলে। আমাদের দেশে এই ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠিদের আগে উপজাতি বা আদিবাসী বলা হতো। একটু ভিন্নতর এই জাতিগোষ্ঠিগুলোকে 'উপ' বলা যায় না, কারণ তাঁরা সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু তাদেরও রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে কোনো নৃগোষ্ঠি নানা সময়ে নানা দিক থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে, এদের মধ্যে কারা সবার আগে থেকে বাস করা শুরু করেছে তা সুনির্দিষ্ট করে জাতিগত বিভাজন রেখা টানা অর্থহীন। সেই অর্থে আমরা

Draft Copy

নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠিকে আদিবাসী বলতে পারিনা। বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠির এই মানুষজন বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশী জাতীয় (ন্যশনালিটি) পরিচয়ের দিক থেকে স্বজাতি।

ছবি: অন্য নৃগোষ্ঠি ও বাঙালি নরনারীর

নানা কারণে মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে থাকতে পারে। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে কেউ কেউ, আবার অনেকে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনভাবে প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছে। কেউ বাস করছে প্রবাসী হয়ে, কেউ ওই দেশের অভিবাসন আইন মেনে নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে বাস করে। অনেক বাঙালি কয়েক প্রজন্ম ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করছে। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে এক কোটির অধিক সংখ্যাক বাংলাদেশী নাগরিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হিসেবে বসবাস করছে।

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে বসবাসের জন্যে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বেড়িয়েছে। ইতিহাসের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মানব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে আফ্রিকা মহাদেশে। এখন থেকে প্রায় যাট হাজার বছর আগে মানুষ অভিবাসনের জন্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। ভালোভাবে বাঁচার প্রচেষ্টা থেকে মানুষ সৃষ্টির আদিকালে যেমন জন্মস্থান বা মাতৃভূমি পরিবর্তন করেছে, এখনও তাই করছে। কয়েক শতাব্দি থেকে হাজার বছর বসবাসের ফলে সেই দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে চলমান পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ফলে তাদের পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ হয়। অন্যদিকে দেশান্তরী হয়ে মানুষ নিজের জীবনযাপন প্রণালীসহ তার ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে সেখানেও ছড়িয়ে দেয়। ওখানকার মানুষজনও সেইসব সাংস্কৃতিক উপাদান ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছে। এভাবে মানুষের পরিচয়ে বিশেষ করে জাতিগত পরিচয়ে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়েছে।

তোমরা আরবের বেদুইন বা উত্তর মেরুর এস্কিমোদের জীবনের তুলনা করলে দেখবে আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে একজন মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে ও বিশিষ্ট করে তোলে। সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দেওয়া হল।

Draft Copy

বেদুইন: আরব উপদ্বীপের প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী জাতি। এরা স্বাধীনচেতা যাযাবর শ্রেণির মানুষ। এরাই আরবের আদিম আদিবাসী। এরা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে, উট, ভেড়া, দুম্বা পালন করে, ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করে। তাদের জীবন সরল ও সাদাসিধে ধরনের। মূলত পশুপালনই তাদের পেশা। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তবে আজকাল সময়ের সাথে সাথে এদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসছে। ওরা মরুভূমিতে থাকে বলে চাষবাস করার সুযোগ পায় না। মরুদ্যান হল তাদের প্রাকৃতিক মনোরম স্থান। তবে তারা কঠিন এবং সবল জীবনেই অভ্যস্ত।

এস্কিমো : উত্তর মেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের চেহারায় মঙ্গোলীয় ধাঁচ রয়েছে বলে ধারণা করা হয় এরা এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে এসেছিল। এরকম কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথিবীর কম মানুষই বসবাস করে থাকে। রেড ইন্ডিয়ান ভাষায় এস্কিমো শব্দের অর্থই হল কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী। তারা তীর, বল্লম ও ফাঁদ ব্যবহার করে কয়েক ধরনের মাছ, সিল ও অন্যান্য মেরুপ্রাণী শিকার করে। এসব প্রাণী থেকেই তারা খাদ্য, বস্ত্র (চামড়া) আলো, তেল, হাতিয়ার সংগ্রহ ও তৈরি করে নেয়। তারা পরিবহন ও যাতায়াতে চামড়ার তৈরি নৌকা কায়াক এবং কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ি ব্যবহার করে। মাছ ও বল্গা হরিণ তাদের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা পালন করে। তারা সাধারণত ছোট ছোট দলে বাস করে। নিজস্ব পুরাণের ভিত্তিতে তারা ধর্ম ও আচার পালন করে। গ্রীষ্মে তারা তাঁবুতে ও শীতে বরফের তৈরি ইগলুতে বাস করে। মনে রেখো ওদের দেশে ছয় মাস রাত আর ছয় মাস দিন।

চিত্র: বেদুইনদের

চিত্র: এস্কিমো

পারিবারিক পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর নাম কাজী ফরিদ, যার বাবার নাম কাজী বশির উদ্দিন; একজনের নাম শান্তা সাহা এবং তার বাবার নাম নন্দলাল সাহা। আবার এখানেই একজন আছে লিরা দ্রোফো এবং তার মায়ের নাম দিপালী দ্রোফো। মানুষের নামে দুই তিনটি শব্দ থাকে। একটি হলো তার একেবারেই নিজস্ব নাম, দুটি নামও নিজস্ব হতে পারে, আর একটি শব্দ তার পারিবারিক পরিচয় বহন করে। পারিবারিক পরিচয়ের শব্দটি বাবার বা কোনো কোন সময় বাবা ও মা উভয়ের নামের সঙ্গেও থাকে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের পরিচয়ের শব্দ থেকে নেওয়া হয়। পারিবারিক পরিচয়ে একটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার বেশ প্রাচীন কাল থেকেই নানা দেশে নানাভাবে প্রচলিত। আমাদের সমাজে পাবিবারিক পরিচয় বহনকারী শব্দের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। যেমন

Draft Copy

মুসলিম পরিবারে উদ্দিন, আহমেদ, কাজী, সৈয়দ, খান ইত্যাদি; সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রায়, ঘোষ, শীল, দত্ত, মিত্র ইত্যাদি এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বড়ুয়া পারিবারিক নাম হিসেবে বেশ প্রচলিত। অন্যদিকে কিছু শব্দ একাধিক ধর্মাবলম্বিদের মধ্যে ব্যবহার দেখা যায়, যেমন চৌধুরী, মজুমদার, বিশ্বাস, তালুকদার, ঢালী ইত্যাদি। অন্যদিকে বাংলাদেশের অবাঙালিদের মধ্যে ভিন্ন ধরনের শব্দের ব্যবহার আছে। যেমন রুরাম, মাজি, হাদিমা ইত্যাদি। ইদানিং বাঙালিদের মধ্যে পারিবারিক (ঐতিহ্যগত) পরিচয় বহনকারী নাম ব্যবহার করার প্রচলন কমে আসছে।

সামাজিক প্রাণি হিসেবে মানুষের বন্যদশা কাটিয়ে ওঠার পর্যায়ের আরম্ভ হয়েছিল সামাজিকীকরণের মাধ্যমে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমান তালে সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান সরল থেকে জটিলতর হতে হতে বর্তমান পর্যায় এসেছে। পরিবারকে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানব সমাজের আদি বা প্রথম একক বলা যায়। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন মা-বাবা সন্তান লালনপালনের নিমিত্তে একসঙ্গে বসবাস শুরু করতে করতে পরিবার প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে প্রকৃতিতে টিকে থাকার সংগ্রামের প্রশ্নে অনেক মানুষ একসঙ্গে থাকাও জরুরি ছিল। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের প্রারম্ভিক কাল থেকে মধ্যযুগের পরেও আত্মিয়তার সূত্র ধরে অনেকগুলো পরিবার একসঙ্গে একসঙ্গে বসবাস করতো, বলা হতো বংশ বা গোষ্ঠি, ইংরেজিতে ক্ল্যান। এখনও কিছু কিছু অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মধ্যে এই রীতির প্রচলিত আছে। আধুনিক যুগে একটি পরিবারে মা-বাবা ও সন্তান একসঙ্গে বসবাস করেন। কোনো কোনো সময় মাতামহ-পিতামহ অর্থাৎ তিন প্রজন্মের মানুষ এক পরিবারে বসবাস করে।

ক. বৈচিত্র্য অনুসন্ধানের উৎসব: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে একজন মানুষের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও সামাজিক পরিচয় জানবে।

- ভৌগোলিক পরিচয়: সমভূমি, পাহাড়, হাওর অঞ্চল বা ব্যাস্ত জনপদে বসবাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা
- রাজনৈতিক পরিচয়: জাতীয় বা নাগরিক/ রাষ্ট্রীয় পরিচয়
- সাংস্কৃতিক পরিচয়: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
- পারিবারিক পরিচয়: পারিবারিক কাঠামো (যৌথ বা একক), পরিবারে অবস্থানগত পরিচয়
- সামাজিক পরিচয়: পেশা বা জীবিকাধর্মী, সামাজিক অবস্থানভিত্তিক

Draft Copy

অনুশীলনী : ১

অনুশীলনী : সকল শিক্ষার্থী নিজ পরিবারের অন্তত দুই প্রজন্মের (মা-বাবা/অভিভাবক এবং মাতামহ-পিতামহ) পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে নিজ নিজ পরিবারের ইতিহাস জানার মাধ্যমে তাঁদের পরিচয় সম্পর্কে জানবে। তাঁরা তখন সমাজে কী হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং জীবনের কোন কোন ধাপে পরিচয় কীভাবে পরিবর্তীত হয়েছিল। সংগৃহীত এই তথ্য নিয়ে দলগত কাজের মাধ্যমে নিজেদের মত করে সাজিয়ে উপস্থাপন করবে। প্রত্যেক দলে কমপক্ষে পাঁচজন থাকবে। উপস্থাপন যেকোনো মাধ্যমে হতে পারে, তবে বৈচিত্র্য থাকলে ভালো হয়। যেমন একদল নিজেরা স্ক্রিপ্ট লিখে নাটক করতে পারে, কোনো দল হাতে লেখা পুস্তিকা বা দেয়ালিকা করতে পারে; কিংবা লেখা ও আঁকা-গড়া উপকরণের সমন্বয়ে প্রদর্শনী হতে পারে।

Draft Copy

বাংলা অঞ্চলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্রময় গতিপথ

আত্মপরিচয় অনুসন্ধান প্রতিটি মানুষের কাছেই আনন্দের। মানুষ নিজেকে জানতে চায়। আর নিজেকে জানতে হলে নিজের অতীত অনুসন্ধান করতে হয়।

কে আমি? আমার পূর্বপুরুষ কারা? কী ছিল তাদের পেশা? কেমন ছিল তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারা? কোথা থেকে এসেছিলেন তারা? এমন হাজারটা প্রশ্ন করে মানুষ আত্মানুসন্ধান করতে চায়, শেকড় খুঁজে বের করতে চায়। শেকড় খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁর পূর্বপুরুষের দক্ষতা, যোগ্যতা এবং দুর্বলতাগুলো জানতে পারে। এই জ্ঞান মানুষের বর্তমানকে কার্যকরভাবে চালিত করতে সাহায্য করে। সুসংহত এবং দূরদর্শী করে। আর নিজের যেকোনো পদক্ষেপ যৌক্তিকভাবে গ্রহণ করতে সহায়তা করে।

সমাজ ও সংস্কৃতি রচিত হয় মানুষের হাত ধরে। মানুষকে উপজীব্য করে। কোন একটি অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমেই সে অঞ্চলের মানুষ সম্পর্কে ধারণা নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রত্নিদর্শন এবং প্রাচীন মানুষের প্রাপ্ত দেহাবশেষ থেকে শুরু করে নানান প্রকারের উৎসের ভিত্তিতে আমরা শুরুতেই আঞ্চলিক বাংলা ভূ-খণ্ডে বিভিন্ন সময়ে আগত মানুষ ও বিভিন্ন জনধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করবো। এরপর আমরা অনুসন্ধান করে দেখবো, কীভাবে সেই মানুষেরা শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক যাযাবর জীবন থেকে ধীরে ধীরে স্থায়ী বসতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। নগর ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন ধরনের রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-পদ্ধতি, খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র, ব্যবহৃত দৈনন্দিন উপকরণ, উৎসব, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি নানাবিধ উপাদানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্য ও বহুত্বে ভরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উর্ণনাভ রচনা এবং রূপান্তরের মাধ্যমে সেই জীবনের অবিরাম বদলের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

অনুশীলনী: ১

"উর্ণনাভ" শব্দটি কি খুব অচেনা লাগছে তোমাদের কাছে? কেউ কেউ নিশ্চয়ই এর মানে জানো। যারা জানো না, তারাও জেনে নেই চলো। উর্ণনাভ অর্থ হচ্ছে, মাকড়সার জাল। মাকড়সার জাল নিশ্চয়ই দেখেছো তোমরা সবাই। অনেকগুলো সুতো একটি আরেকটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুন্দর একটা কাঠামো তৈরি করে। সমাজ ও সংস্কৃতি নানান উপাদান মাকড়সার জালের মতোই একটা আরেকটার সঙ্গে জুড়ে থাকে। এইসব উপাদানের পারস্পরিক বিন্যাসের মধ্য দিয়েই একটি ভূখণ্ডের মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন রচিত হয়।

[বাংলা অঞ্চলকে চিহ্নিত করে মানচিত্র। মানচিত্রে থাকবে বঙ্গ, বঙ্গাল, চন্দ্রদ্বীপ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, গৌড়, রাঢ, পাণ্ডু রাজার ঢিবি, তাম্রলিপ্তি, চন্দ্রকেতুগড়, উয়ারি-বটেশ্বর, বিক্রমপুর, দেবপর্বত, সমতট, হরিকেল, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কোলকাতা, আসাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, এবং আরাকান]

Draft Copy

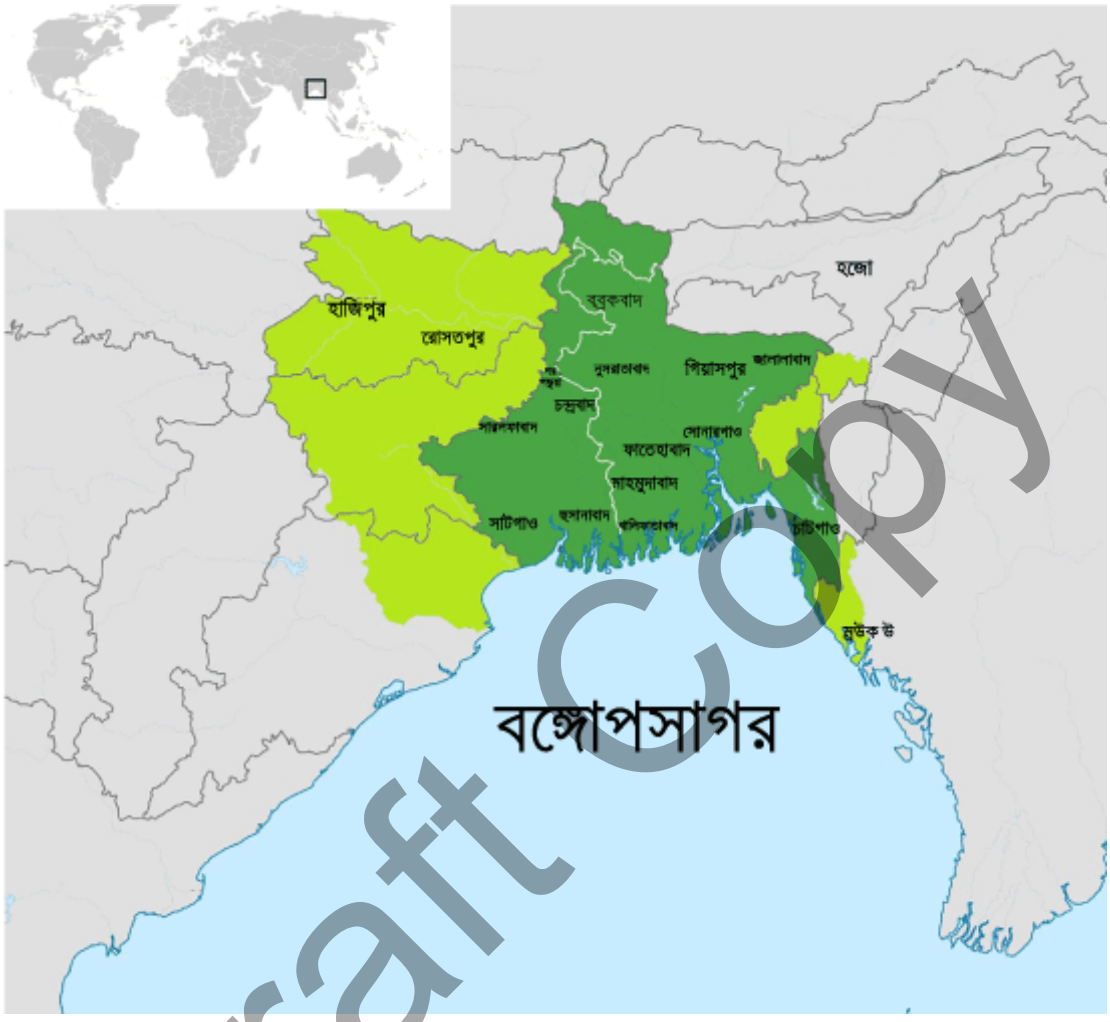

বাংলা অঞ্চলের মানচিত্র

আঞ্চলিক বাংলায় মানুষের প্রাথমিক বসতি ও পরিচয়

যুগে যুগে নানান ধারার মানুষ পৃথিবীর নানান অংশ থেকে বাংলা অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। বাংলা অঞ্চলের নানান রকমের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। আবার প্রকৃতির অফুরন্ত নিয়ামক গ্রহণ করেই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের পথ রচনা করেছে। চলো, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মমতাজুর রহমান তরফদার এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার আলোকে এই মানুষের দৈহিক গড়ন এবং ভাষাভিত্তিক আদি পরিচয় সংক্ষেপে জেনে নেই।

Draft Copy

দৈহিক গড়নভিত্তিক জনগোষ্ঠী

পাণ্ডুরাজার ঢিবির কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে তোমরা জেনেছো। বাংলা অঞ্চলের পশ্চিমাংশে প্রাচীনতম সুসংগঠিত মানববসতি পান্ডুরাজার ঢিবি। আদি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। এই কঙ্কাল আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের। নৃ-বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী, বাংলা অঞ্চলের আদিতম দৈহিক গড়ানার মানুষ ছিল প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড। এরাই খুব সম্ভবত বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খন্ডে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। এই মানুষের জীবন ছিল শিকার ও চাষকেন্দ্রিক। প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড দেহ গড়ানার মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলতো তার ভিত্তিতে তাদেরকে অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বলা হয়। এই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীরও ছিল অসংখ্য ধারা ও উপধারা। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যাদেরকে নিষাদ বলা হয়েছে এবং বর্তমানকালে আমরা যাদের সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে চিনে থাকি তারা সবাই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ।

দৈহিক গড়নের ভিত্তিতে আরও যেসব জনধারা বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেছে তার মধ্যে নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েড অন্যতম। নিগ্রোয়েড এবং মঙ্গোলয়েডদের মধ্যেও রয়েছে অনেক ধারা ও উপধারা। বাংলায় গারো নামে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তারা মূলত মঙ্গোলয়েড জনধারারই ক্ষুদ্র একটা অংশ বা উত্তরাধিকার। হাজার বছর ধরে বাংলা অঞ্চলে বসবাস করার ফলে এই সকল মানুষের প্রায় সবাই মিলে-মিশে নতুন যে জনধারা সৃষ্টি করেছে তা বর্তমানে বাঙালি নামে পরিচিত।

আদিম মানুষের কঙ্কালের ছবি

Draft Copy

ভাষাভিত্তিক জনগোষ্ঠী

অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অল্প কিছু আগে বা পরে বাংলা অঞ্চলে যাদের আগমন ঘটে তারা হচ্ছে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ। এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের উৎপত্তি কোথায় তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণের অনেকেই বলে থাকেন যে, দ্রাবিড় ভাষীরাই ভারতীয় উপমহাদেশের আদিম বাসিন্দা। কেউ কেউ আবার এদের ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে আগত বলেও মত দিয়ে থাকেন। তবে এদের উৎপত্তি যেখানেই হোক, সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের হাতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন নগর সভ্যতার নাম হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা। একজন বাঙালি গবেষক বহতা অংশুমালী মুখোপাধ্যায় অতি সম্প্রতি হরপ্পায় প্রাপ্ত লিপি পাঠোদ্ধার করে দ্রাবিড় ভাষার প্রমাণ হাজির করেছেন। বাংলা অঞ্চলেও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর কিছু মানুষ আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অনেক আগেই বসতি স্থাপন করেছিল। চীনা-তিব্বতি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা-উপশাখায় কথা বলা মানুষের অস্তিত্বও পাওয়া গিয়েছে বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খণ্ডে। এমনকি বঙ্গ শব্দটিও চৈনিক ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। [বহতার ছবি। সাথে হরপ্পালিপি পাঠের ছবি।]

যাহোক, আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বসতি স্থাপন করেছিল প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর বা তারও কিছু আগে। কিন্তু ভারতবর্ষের একেবারে পূর্ব অংশে অবস্থিত বাংলা ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করতে তাদের সময় লেগেছে প্রায় এক হাজার বছর। আজ থেকে আনুমানিক আড়াই হাজার বছর আগে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা বাংলায় প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে গবেষকগণ দাবি করেন।

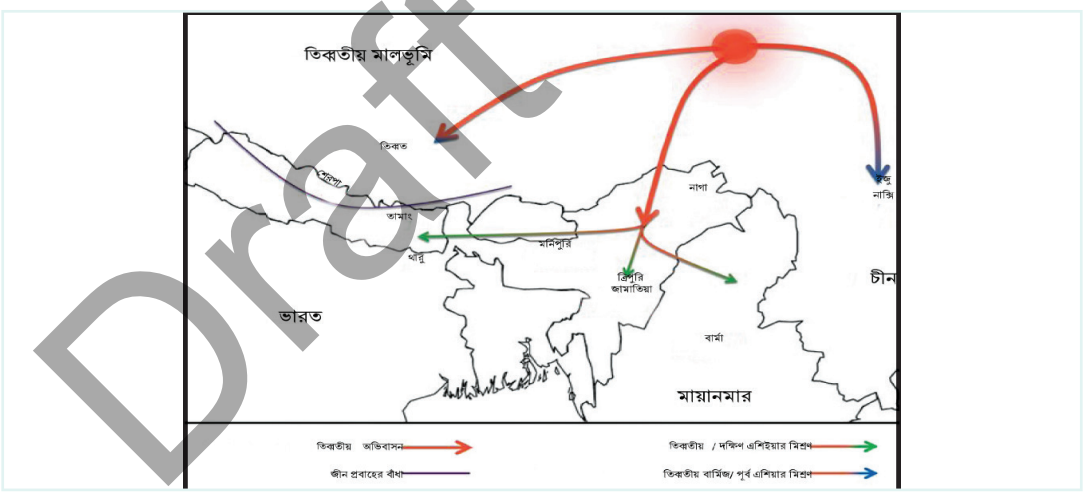

তিবেতোবার্মিজ ভাষাগোষ্ঠীগুলোর উত্তরপূর্ব দিকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পশ্চিম দিকের ভারত উপমহাদেশে ও বাংলা অঞ্চলে অভিবাসনের ধারা।

Draft Copy

ভারত বর্ষের মানচিত্রে দৈহিক গড়নভিত্তিক অভিবাসনের চিত্র

বৈচিত্র্য ও বহুত্ব

দৈহিক গড়ন ও ভাষার ভিত্তিতে আদিকালে বাংলা অঞ্চলে আগত ও বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় আমরা সংক্ষেপে জেনে নিয়েছি। দূরবর্তী ভূ-খণ্ড হতে আগমন ও বসতি স্থাপনের এই ধারা যে শুধু প্রাচীন যুগেই চলমান ছিল তা কিন্তু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আর্য সহ উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মানুষ নানান পরিচয় (যেমন- মৌর্য, কুষাণ, হূণ, গুপ্ত, আরব, যবন, তুর্কি, আফগান, পারসিক, তাজিক, মুগল, ওলন্দাজ, ইংরেজ, ডেনিশ, রাজপুত প্রভৃতি) ধারণ করে বাংলার আঞ্চলিক ভূ-খণ্ডে প্রবেশ করেছে। স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রচার ঘটিয়েছে। অপেক্ষাকৃত আগে বসতি স্থাপনকারী জনধারার সাথে মিশে গিয়ে বহুমাত্রিক এবং বৈচিত্র্যময় সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে।

অনুশীলনী: ১

হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে উঠেছে। নানান ধারার মানুষের মিলন ও মিশ্রণের মধ্য দিয়ে আমরা হয়ে উঠেছি একই সঙ্গে অনন্য ও বৈচিত্র্যময়। উপরের পাঠ থেকে চলো এই অনন্যতা ও বৈচিত্র্য অনুধাবণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও দেহগড়ানার মানুষের নাম অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন লিখি।

Draft Copy

আঞ্চলিক বাংলায় সমাজ গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাস

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। মানুষের বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে ইতিহাসের ঊষালগ্নেই সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল। প্রতিটা সমাজে মানুষ নির্দিষ্ট কিছু নিয়মকানুন এবং আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলে। অন্যদিকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতির অংশ। হাজার বছরে গড়ে উঠা রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম-সংস্কৃতি, লোকাচার, বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংগীত, নন্দন-শিল্প, জামা-কাপড়, খাদ্যাভ্যাস, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের অর্জিত অভিজ্ঞতার সবকিছুই সংস্কৃতি। সমাজ ও সংস্কৃতি কোনো একরৈখিক প্রতিষ্ঠান নয়। স্থান এবং কালভেদে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে পার্থক্য তৈরি হয়। আবার কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের মধ্যেই একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারার মানুষ বসবাস করে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখন অবধি আমরা যদি বাংলা অঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতির গঠন এবং রূপান্তরের অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করবো, রাজনৈতিক এবং ধর্ম-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আর বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানেও এসেছে বড় পরিবর্তন। আগে থেকে বিদ্যমান একটি সমাজ কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে দূরের ভূখণ্ড থেকে আগত মানুষেরা নতুন নতুন উপাদান যুক্ত করেছেন। নতুন এবং পুরাতনের মধ্যে সংঘাত ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। সমাজ ও সংস্কৃতির এই নিরন্তর ভাঙা-গড়া, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়েই মানুষ বৈচিত্র্যে, বহুত্বে আর বহুমাত্রিকতার অভিজ্ঞতায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন।

[একটা ডায়াগ্রামের ছবি যাবে যেখানে দ্বন্দ্ববাদ কীভাবে সমাজের পরিবর্তন ঘটায় তা দেখানো হবে।]

সমাজ-সংস্কৃতি গঠনের আদি পর্ব: কৃষি আবিষ্কার থেকে নগর বিপ্লবের কথা

(প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ)

আদিকালে মানুষ যখন চাষাবাদ জানতো না, স্থায়ী বসতি ছিল না, তখনও তারা দলবদ্ধ হয়েই শিকার এবং সংগ্রহের কাজ করতো। আদিম সেই সমাজকে বলা হয় গোত্রভিত্তিক সমাজ। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই, হবিগঞ্জ জেলার চাকলাপুঞ্জি চা বাগান, চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড, নরসিংদী জেলার ওয়ারি-বটেশ্বর, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া ও মেদিনীপুর জেলা, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের বেশ কিছু স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। এর কোন কোনটির বয়স আনুমানিক দশ হাজার বছর। এইসব প্রত্ন নিদর্শন থেকে বাংলা অঞ্চলের শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক সমাজের মানুষের বিচরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

Draft Copy

প্রস্তর যুগের মানুষের মাছ শিকারের কাল্পনিক ছবি

নারী শিকারির হরিণ শিকারের কাল্পনিক দৃশ্য। আবিষ্কৃত প্রমাণের ভিত্তিতে আঁকা হয়েছে।

মানুষের সমাজ কাঠামোতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন আসে কৃষির আবিষ্কারের ফলে। আদি যুগে মানুষ বৃদ্ধি পেলেই গোত্রগুলো ভেঙে যেতো এবং পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যেতো। কিন্তু কৃষির আবিষ্কারের ফলে এই ভাঙন থেকে তারা মুক্তি পায় এবং কোন একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে চাষের মাধ্যমে নিজেদের খাদ্য উৎপাদন করে জীবন ধারণে সক্ষমতা অর্জন করে। কৃষির আবিষ্কার মানুষকে খাদ্যের সংকট থেকে মুক্তি দেয়। স্থায়ী ঘরবাড়ি নির্মাণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। গোত্রভিত্তিক জীবন ধারার পরিবর্তে গ্রাম বা নগরভিত্তিক স্থায়ী জীবন ধারার সূত্রপাত ঘটায়। মহাস্থানগড় এবং পাণ্ডুরাজার ঢিবি প্রভৃতি প্রত্নস্থলে খননকাজ পরিচালনা করে দেখা গেছে, এই স্থানগুলোতে নগর প্রতিষ্ঠার আগে কৃষিকে কেন্দ্র করে গ্রামীন কৃষিভিত্তিক বসতির সূচনা হয়েছিল। চাষাবাদের পাশাপাশি তারা শিকার এবং মাছ ধরার কাজেও দক্ষ ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকেই ধীরে ধীরে পাণ্ডুরাজার ঢিবি, মহাস্থানগড়, ওয়ারী-বটেশ্বর প্রভৃতি নগর সমাজের উদ্ভব হয়।

বাংলা ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষ আজ থেকে আনুমানিক আড়াই হাজার বছর পূর্বকালের মধ্যে গঙ্গারিডাই, বঙ্গ ও পুন্ড্র নামের রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এরপর এক এক করে বাংলার আঞ্চলিক ভূখণ্ড জুড়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র ছাড়াও গৌড়, রাঢ়, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক ইউনিট গড়ে উঠেছিল। এইসব ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক ইউনিট বা রাজ্যগুলোকে কেন্দ্র করেই বাংলার বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অধ্যায়সমূহ রচিত

অনুশীলনী: ২

চলো, এই অধ্যায়ের শুরুতেই তোমরা যে মানচিত্র দেখেছি সেখানে এই রাজ্য বা জনপদ বা ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক ইউনিটগুলো খুঁজে বের করি।

বাংলা অঞ্চলের কৃষিনির্ভর এলাকাগুলোতে বা গ্রামে প্রাচীনকাল থেকেই ফসল কাটার দিনটি ছিল সবচেয়ে আনন্দের দিন। চন্দ্রকেতুগড়ে একটি পোড়ামাটির ফলকে দেখা যায়, অর্ধ চন্দ্রাকৃতির কাস্তে হাতে নিয়ে কয়েকজন কৃষক কৃষি

Draft Copy

কাজ করছেন। অপর একটি ফলকে ধরা দিয়েছে প্রাচীন আশ্চর্য সুন্দর একটি ফসল কাটার উৎসবের দিন। ফসল হাতে নিয়ে বাদ্যবাজনা সহযোগে নৃত্যরত মানুষের এই চিত্র প্রথম/দ্বিতীয় শতকে অঙ্কিত হলেও তার মধ্যেই বাংলার কৃষকদের জীবনের একটি শ্বাশত রূপ ধরা পড়েছে। কৃষিকে কেন্দ্র করেই বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে স্থায়ী বসতির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনে এই কৃষির সম্পর্ক অতি প্রাচীন এবং অবিচ্ছেদ্য

চিত্র- কয়েকজন পুরুষ একটি শিকার করা পশু নিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করছে। আঙিনায় কয়েকজন নারী শস্য চাষ করছে।

মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। বাঙলা অঞ্চলে বসতি স্থাপনকারী মানুষের মধ্যে ইতিহাসের আদিকালেই লোকজ ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল। প্রাগৈতিহাসিককালে বাংলা অঞ্চলে যে আদিম কৌমভিত্তিক সমাজ ছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে এখনও যে ব্রত অনুষ্ঠান, প্রাচীন বৃক্ষের জন্যে ভোগ প্রদান, ধান-দুর্বা, পান-সুপারি, নারকেল, কলা, ঘট নিয়ে নানান আচার-অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়, সেগুলো আদিকাল থেকেই এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চালু ছিল। প্রাচীন উৎসগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেই এ বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। বাংলা অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আজও দেখা যায়, গাছ, পাথর, পাহাড়, নদী, বিভিন্ন পশু-পাখির পূজা-বন্দনা। বাংলার আদি মানুষের মধ্য থেকেই এইসব প্রথা-পদ্ধতি উঠে এসেছে বলে ইতিহাসবিদ নীহাররঞ্জন রায় এবং মমতাজুর রহমান তরফদার মত দিয়েছেন।

Draft Copy

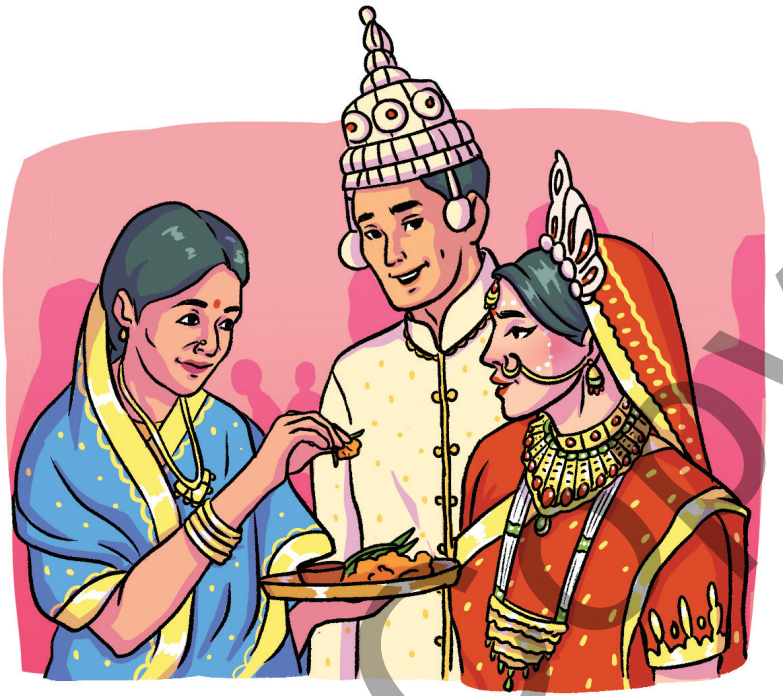

চিত্র- প্রাচীনকালের রীতি অনুসরণ করে বর্তমানে ধান-দুর্বা মাথায় ছিটিয়ে নববধূ বরণ।

অনুশীলনী: ২

আদি যুগে বাংলা অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষাপট এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা জানলাম। উপরের পাঠ থেকে চলো নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে বের করি-

- আদি যুগে মানুষের পারিবারিক কাঠামো কেমন ছিল?
- প্রধান রাজনৈতিক-ভৌগোলিক ইউনিটগুলোর নাম কী ছিল?
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান উৎসবগুলো কেমন ছিল?

Draft Copy

আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের আগমন, নতুন বসতি, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল

(৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

আর্য ভাষার মানুষেরা আনুমানিক ৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বাংলা অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল বলে তথ্য পাওয়া যায়। বেদ সাহিত্যে এবং মহাভারত ও রামায়ণে বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ তৎকালীন ভারতবর্ষের সর্বত্র তাদের রাজ্য বিস্তার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বঙ্গ-পুণ্ড্র-রাঢ়-সমতট এলাকায় একের পর এক অভিযান পরিচালনা করেন।

সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী গুপ্ত শাসকদের প্রচুর মুদ্রা এবং তাম্রশাসন পাওয়া গেছে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল তথা বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে। এইসব দলিলে দেখা যায় যে, গুপ্ত রাজারা বাংলার বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণদের জমিদান করছেন। গুপ্ত রাজাদের সময়ে এইভাবে জমিদানের মাধ্যমে বাংলার বাইরে থেকে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে বাংলায় পাঠানো হয়। গুপ্ত শাসক এবং ব্রাহ্মণগণ ছিলেন কোনো না কোনো আর্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মানুষ। বাংলা অঞ্চলের নগরকেন্দ্রগুলোতে আর্য ভাষাভাষী মানুষের আগমন এবং সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি বিস্তারে গুপ্ত শাসকদের এই ভূমিদান নীতি জোরালো ভূমিকা রাখে।

[গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ও মন্দিরের চিত্র ক্যাপশন সহ নিতে হবে সপ্তম শ্রেণির অনুসন্ধানী বইয়ের ৭০, ৭১ এবং ৭২ পৃষ্ঠা থেকে।]

আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা নতুন যে ধর্ম-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে সেটি ছিল মূলত জাত-বর্ণ প্রথাভিত্তিক। সমাজের সকল মানুষকে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণে ভাগ করেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা মূলত ধর্মকর্ম, যুদ্ধবিদ্যা এবং প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির আগমণের পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এইরূপ শ্রেণিভেদ ছিল বলে জানা যায় না। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ মূলত নানান প্রকার স্থানীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল।

মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতুগড়, ওয়ারী-বটেশ্বর, বানগড়, দেবপর্বত, বিক্রমপুর প্রভৃতি নগরকেন্দ্রিক মানব বসতির যে নিদর্শনগুলো প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খুঁজে বের করেছেন তার অধিকাংশই এই সময়ে পরিপূর্ণভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কৃষিভিত্তিক জীবন ধারার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলে নগর সংস্কৃতির বিকাশের কাল হিসেবে সময়কালটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষেরা নতুন যে ধর্ম-সামাজিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে সেটি ছিল মূলত জাত-বর্ণ প্রথাভিত্তিক। সমাজের সকল মানুষকে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারটি বর্ণে ভাগ করেন। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা মূলত ধর্মকর্ম, যুদ্ধবিদ্যা এবং প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির আগমণের পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে এইরূপ শ্রেণিভেদ ছিল বলে জানা যায় না। এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ মূলত নানান প্রকার স্থানীয় ধর্ম-বিশ্বাস এবং প্রথা-পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত ছিল।

মহাস্থানগড়, চন্দ্রকেতুগড়, ওয়ারী-বটেশ্বর, বানগড়, দেবপর্বত, বিক্রমপুর প্রভৃতি নগরকেন্দ্রিক মানব বসতির যে নিদর্শনগুলো প্রত্নতত্ত্ববিদেরা খুঁজে বের করেছেন তার অধিকাংশই এই সময়ে পরিপূর্ণভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কৃষিভিত্তিক জীবন ধারার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলে নগর সংস্কৃতির বিকাশের কাল হিসেবে সময়কালটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে।

Draft Copy

মহাস্থানগড়। এই দেয়াল ঘেরা স্থানটিই একটি নগর ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধারসহ চারদিকে পরিখা ও ডান দিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতোয়া নদীর তীরেই বগুড়ার মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই নগর মৌর্যদের সময় থেকে মোগল আমল অব্দি বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বিভিন্ন আমলে এই নগরের বৈশিষ্ট্য ও বসতি পরিবর্তিত হয়েছে।

[ক্যাপশনঃ মহাস্থানগড়। এই দেওয়াল ঘেরা স্থানটিই একটি নগরী ছিল। সেই নগরের কাল্পনিক চিত্র এটি। প্রাচীনকালে এর নাম ছিল পুন্ড্রনগর। এই চিত্রে ওই দুর্গে প্রবেশ করার দরজাগুলো, নগরের মধ্যে জলাধার সহ চারদিকে পরিখা ও ডানদিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত ছিল। করতোয়ার তীরেই মহাস্থানে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে এই রাজধানী নগরটি স্বাধীন বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় পড়েছে। এই নগরে প্রথম মানব বসতি স্থাপিত হয় মৌর্য শাসকদের শাসনকাল শুরু হবারও আগে। পনের শতকেও এই নগরে জনবসতি অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন সময়ে নগরটির বৈশিষ্ট্য এবং বসতির ধরণ পরিবর্তিত হয়েছে। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এখানে জনবসতি ছিল। এরপর বহিঃশক্তির আক্রমণ বা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগের কারণে নগরটি পরিত্যক্ত হয়। ধীরে ধীরে মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। আধুনিককালে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ স্থানটিতে খননকার্য পরিচালনা করে মাটির নিচ থেকে সম্পূর্ণ নগরটির ধ্বংসাবশেষ পুনরুদ্ধার করেন। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন বিশ্লেষণ করে থাকেন ইতিহাসবিদগণ। ইতিহাস গবেষণার প্রথা-পদ্ধতি ও কলা-কৌশল মেনে, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান চালিয়ে একজন ইতিহাসবিদ বিভিন্ন সময়ের মানুষদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ইতিহাস রচনা করে থাকেন।]

নগরীর দুর্গ এলাকায় বাস করতেন রাজা, রাজপরিবার, রাজকর্মচারী, পুরোহিত এবং যোদ্ধারা। দুর্গের বাইরে বাস করতেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিল্পী ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। অন্যদিকে গ্রামে বাস করতেন ব্রাহ্মণ, সাধারণ কৃষক ও সেবক শ্রেণির মানুষ। গ্রামগুলো ছিল সম্পদ উৎপাদনের কেন্দ্র। অন্যদিকে স্থাপত্য, সংগীত, শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার বিকাশ ঘটেছিল নগরকেন্দ্রগুলোতে।

Draft Copy

চিত্র- পাহাড়পুরে পোড়ামাটির ফলকে প্রাপ্ত একজন প্রাচীন যোদ্ধা

[চিত্র- পাহাড়পুরে পোড়ামাটির ফলকে প্রাপ্ত দুইজন প্রাচীন যোদ্ধার ছবি]

[ক্যাপশনঃ পাহাড়পুরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে খোদাই করা দুইজন যোদ্ধার ছবি। সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের রাজাগণ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেন এই যোদ্ধাদের পেশীশক্তিকে ব্যবহার করে। যোদ্ধারা বাস করতেন নগরের ভেতরে।]

অনুশীলনী : ৩

উপরের পাঠে আমরা আমরা বাংলা অঞ্চলে গড়ে উঠা গ্রামীন এবং শহুরে সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছি। চলো, এইবার আমরা একটা তালিকা তৈরি করি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে গ্রাম এবং নগরে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী মানুষের নাম লিখি-

গ্রামে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী মানুষের নাম	নগর বা শহরে বসবাসকারী ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবী মানুষের নাম

Draft Copy

আঞ্চলিক পরিচয় গঠন, সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য ও বহুত্ব

(৬০০ থেকে ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

ষষ্ঠ শতকের পর বাংলা অঞ্চলে তদানীন্তন কিছু ক্ষমতাবান মানুষের হাতে বঙ্গ নামে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে বলে বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বর্তমান বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়। ৫ জন স্বাধীন রাজা ৬ষ্ঠ/৭ম শতকে ধারাবাহিকভাবে এখানে রাজত্ব করেছেন বলে তাম্রশাসন থেকে জানা গেছে। এঁরা হলেন গোপচন্দ্র, সমাচারদেব, ধর্মাদিত্য, দ্বাদশাদিত্য ও সুধন্যাদিত্য। বঙ্গের কিছু পরে গৌড় নামে আরো একটি রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের স্বাধীন একজন রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। যাহোক, অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে দীর্ঘ প্রায় চারশো বছর পাল বংশের শাসকেরা বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও পশ্চিম দিকের প্রধান অংশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তখন দেব, খড়্গ, রাত, চন্দ্র নামের বেশ কয়েকটি ছোট ছোট রাজবংশের শাসন অব্যাহত ছিল। এইসকল রাজবংশের অধীনে বাঙলা অঞ্চলে ধীরে ধীরে সমাজ-সংস্কৃতির কাঠামো মজবুত হয়। নগরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক কাঠামো স্পষ্ট হতে থাকে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুত্ব নিয়েই গড়ে ওঠে সামাজিক বুনিয়াদ।

পাল রাজাগণ বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হলেও তাদের শাসনকালে বাংলার অভিজাত শ্রেণির সমাজ ব্যবস্থা গুপ্ত শাসকদের সময় প্রবর্তিত ব্যবস্থার মতোই ছিল। পরবর্তীকালে সেন শাসকদের সময়েও মোটামুটিভাবে একই ব্যবস্থা চালু ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল সবার উপরে। পাল যুগের লিপিমালা থেকে দেখা যায়, ব্রাহ্মণদের ধর্মকর্ম করার জন্যে রাজার পক্ষ থেকে প্রচুর পরিমাণে ভূমিদান করা হচ্ছে। লিপিমালায় ব্রাহ্মণদের উচ্চ মর্যাদার মানুষ বলে সম্বোধন করা হচ্ছে।

বাংলা অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় ভূভাগে নানান ধারার বিশ্বাস, প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতির মানুষের বসবাস ছিল। এই সময় বাংলা অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন- বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরীয় ইত্যাদি), বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মতবাদ (যেমন- মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান, কালচক্রযান, থেরবাদী, সহজিয়া ইত্যাদি), জৈন ধর্মের নানান মতবাদ এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্র করে বাংলা অঞ্চলে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান বর্ণিল অধ্যায় রচিত হয়েছে।

বাংলা অঞ্চলের প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপনার মধ্যে স্তুপ, বিহার, মন্দির উল্লেখযোগ্য। বাংলায় প্রথম মন্দিরের উল্লেখ

Draft Copy

পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শতকের একটি পোড়ামাটির ফলকে। মন্দির স্থাপত্যের আদিমতম রূপ উৎকীর্ণ হয়েছে ফলকটিতে। ষষ্ঠ শতক থেকে বাংলা অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের মন্দির নির্মিত হতে শুরু করে। নবম থেকে এগারো শতকে পাল ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে অসংখ্য মন্দির এবং মন্দির সংশ্লিষ্ট ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষা ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল বিহার। এখানে সন্ন্যাসী ও শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি দর্শন, যোগশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ধ্বনিতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা, চিত্রকলা, সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। বাংলা অঞ্চলে নির্মিত বিহারগুলোর মধ্যে সোমপুর মহাবিহার (বর্তমানে বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর), শালবন বিহার (বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতীতে অবস্থিত), রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অবস্থিত) ছিল জগৎবিখ্যাত।

দক্ষিণ এশিয়ার ২য় বৃহত্তম বিহারের নাম সোমপুর বা পাহাড়পুর বৌদ্ধ মহাবিহার। বিশাল এই স্থাপনার চারদিকে ছিল ১৭৭টি বসবাসের উপযোগী কক্ষ, যেখানে বসে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জ্ঞানচর্চা করতেন। বিস্তৃত প্রবেশপথ, অসংখ্য নিবেদন স্তুপ এবং ছোট ছোট মন্দির শোভিত বিহারের কেন্দ্রে রয়েছে সুউচ্চ একটি মন্দির। খননকাজের মাধ্যমে এখানে পাওয়া গিয়েছে অনেক অনেক পোড়ামাটির ফলক (টেরাকোটা), প্রস্তর ও ধাবত নির্মিত মূর্তি। এইসব ফলকে অঙ্কিত চিত্র থেকে আমরা সে যুগের মানুষের জীবন সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য জানতে পারি। এইসব নির্দশন বাংলার স্থাপত্য ও ভার্স্কয শিল্পের ইতিহাসে অত্যন্ত মূল্যবান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ভারতের বিহারে অবস্থিত নালন্দা মহাবিহারের বিহার ও মন্দিরগুলোর ছবি।

Draft Copy

ভারতের বিহারের আন্তিচকে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরের ছবি।

বাংলাদেশের নওগাঁয় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দিরসহ ছবি।

Draft Copy

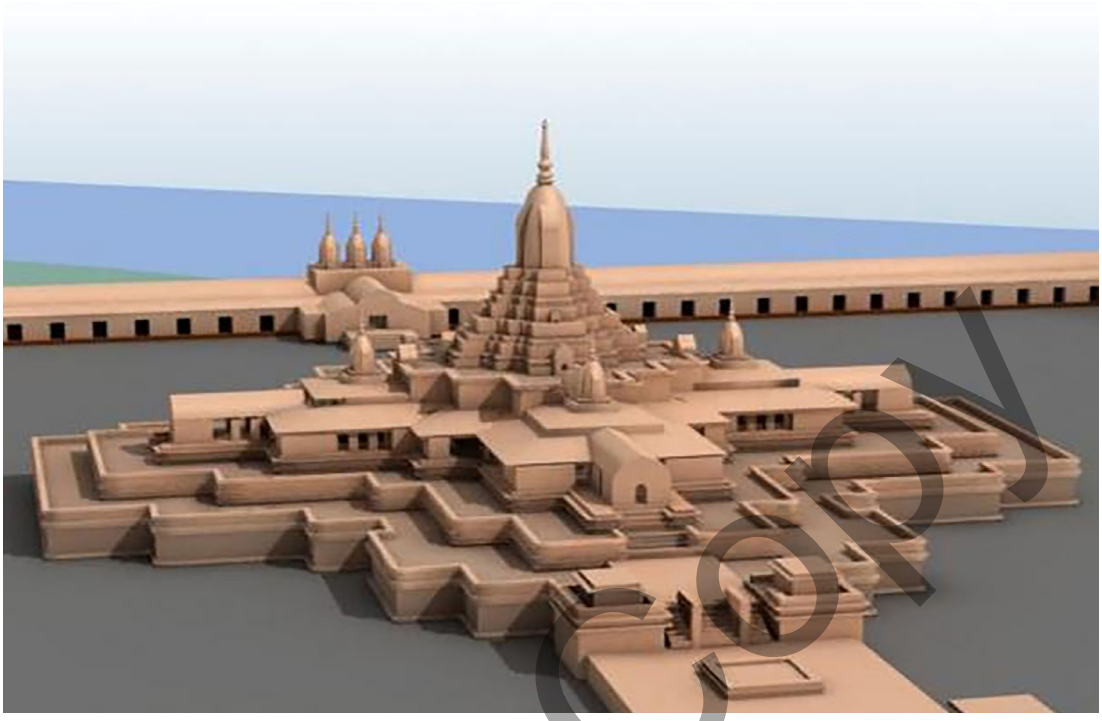

সোমপুর মহাবিহারের কেন্দ্রীয় মন্দির দেখতে এমন ছিল বলে মনে করেন ইতিহাসবিদগণ

শালবন বিহার

Draft Copy

লতিকোট বিহার

একাদশ-দ্বাদশ শতকে সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। পবনদূত, গীতগোবিন্দ, সদুক্তিকর্ণামৃত নামে বেশকিছু গ্রন্থ এ সময়ে রচিত এবং সংকলিত হয়। এইসব গ্রন্থ থেকে সমকালীন বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নানান তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থগুলোও তাই বাংলা অঞ্চলের ইতিহাসের উৎস হিসেবে পন্ডিতগণের কাছে বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শাহানারা হোসেন এই সময়ে সংকলিত 'সুভাষিত রত্নকোষ' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও পর্যালোচনা করে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ-দারিদ্র্য ও টিকে থাকার লড়াইয়ের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। বাংলা অঞ্চলের মানুষের যেকোন প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা এই শ্লোকগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে।

সুভাষিত রত্নকোষে মানুষের জীবন-যাপন

সুভাষিত রত্নকোষ একটি সংস্কৃত গ্রন্থ। গ্রন্থটি সংকলন করেন বিদ্যাকর নামে একজন আচার্য। জগদ্দল মহাবিহারে বসে তিনি বাংলা এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত কবিদের বাছাইকৃত শ্লোকসমূহ সাজিয়ে সংস্কৃত এই কাব্যগ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। বাংলার প্রাচীন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে গ্রন্থটির প্রতিটি শ্লোকে। গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায়, দরিদ্র গৃহকর্তা তার স্ত্রীকে নিয়ে অনেক কষ্টে গ্রীষ্মকাল পার করছে। যেভাবেই হোক এই সময়টা বেঁচে থাকতে হবে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসবে। তখন লাউ ও কদু উৎপাদন করে রাজার মতো সুখ ভোগ করবে। দরিদ্র শিশু খাদ্যের অভাবে অপুষ্ট দেহ ধারণ করেছে। প্রায়শই অন্য মানুষের বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে ভেতরে বসে যারা খাবার খাচ্ছে তাদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে। একজন দরিদ্র গৃহিণীর পরনের জামাটা প্রতিদিনই ছিঁড়ে যাচ্ছে, প্রতিদিনই জামাটা সেলাই করার জন্যে প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা সুঁই চেয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে। শরৎকালে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়েছে। ধনী পরিবারদের গৃহে নিমন্ত্রিত হয়ে ব্রাহ্মণেরা ভোজ গ্রহণ করছে।

Draft Copy

বাংলা সাহিত্যের আদি নির্দশন “চর্যাপদ” রচিত হয়েছিল অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই। চর্যাপদের পদগুলোতে সেই সময়ের ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশ তথা বাংলা অঞ্চলের সমাজ জীবন ও সংস্কৃতির নানান বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া যায় মানুষের দারিদ্র্য, উচু-নিচু ভেদাভেদ, বৈষম্য আর বিভিন্ন পথে সাধনার মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণের নানান উদাহরণ।

পাল শাসনামলে তালপাতায় লিখিত ও চিত্রিত বৌদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের চিত্র ও লেখা।

চর্যাপদ

চর্যাপদ হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্যের নমুনা। চর্যাপদ থেকে বাংলায় বসবাসকারী নানান ধারার মানুষের নাম, পরিচয় এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে নানান তথ্য জানা যায়। ডোম, শবর, পুলিন্দ, নিষাদ নামক মানুষদের কথা জানা যায়। এইসব মানুষেরা আর্যভাষী মানুষদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলার আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নিজস্ব রীতি-নীতি আর প্রথা-পদ্ধতি মতো সমাজ গঠন করে তারা নিজেদের জীবন পরিচালনা করছিলেন। চর্যাপদ কাব্যে শবরদের জীবনধারা সম্পর্কে চমৎকার তথ্য পাওয়া যায়। শবর মানুষরা অপেক্ষৃত উঁচু এলাকা বা পাহাড়ে বসবাস করতো। অরণ্য থেকে সংগ্রহ করা সুন্দর ফুল আর পাখির রঙিন পালক দিয়ে শবর বালিকারা সাজ-সজ্জা করতো।

Draft

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও প্রাচীন বাংলার মানুষ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল। চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে এবং চিত্রযুক্ত পুঁথিতে। নবম শতকে বাংলার বরেন্দ্রীতে ধীমান এবং বীতপাল নামে শিল্পী বাস করতে জানা যায়। চিত্রকলায় তারা ছিলেন সেই যুগের বিখ্যাত মানুষ।

পালবংশের রাজা রামপালের সময়ে রচিত "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" নামে একটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে যাকে প্রাচীন বাংলার চিত্রশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। বিভিন্ন স্থাপনার দেয়াল অলংকরণ, ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রীর শোভাবর্ধন এবং গৃহসজ্জায় চিত্র অঙ্কনের রীতি বাংলায় আবহমানকাল ধরেই চর্চা হয়ে আসছে।

অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ। পাল যুগে লিখিত। বাংলাদেশসহ ভারত উপমহাদেশের পূর্বাংশে বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার ও মহাবিহারে এ ধরনের গ্রন্থ লিখিত ও চিত্রিত হতো।

ভাস্কর্য শিল্প বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল একটি দিক। বাংলা অঞ্চলে শিল্পটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে এবং ৯০০ সাধারণ অব্দের মধ্যে এটি চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বিভিন্ন ধরনের পাথর, আগ্নেয়শিলা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গিয়েছে বাংলা অঞ্চলের প্রত্নস্থলগুলোতে। নবম শতাব্দী থেকে কালো আগ্নেয়শিলার ভাস্কর্য দেখা যায়। এগুলোকে পালরীতির ভাস্কর্য বলা হয়। এই ভাস্কর্যগুলোর অপূর্ব শিল্পগুণের কারণে অনেকেই একে পৃথিবীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরীতি হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

Draft Copy

শিলালিপি (১৫৮১-৮২ খিস্টাব্দ), মাসুম খান কাবুলি, চাটমোহর ,পাবনা

সুলতানি শিলালিপি রুপবৈচিত্র্য

ব্রাহ্মলিপি (খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩ শতক), মহাস্থানগড়

চিত্র- কালো আগ্নেয়শিলার ভাস্কর্য

বাংলার আদি অধিবাসীদের ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসবের সঙ্গে আরও যা যুক্ত হয়েছিল তা হলো নৃত্যগীতি। বিভিন্ন প্রাচীন সূত্র ও লৌকিক আচার থেকে জানা যায়, প্রাচীনকাল থেকেই বাংলার অধিবাসীরা নৃত্য-গীতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বাংলার প্রাচীনতম কাব্যসংকলন চর্যাপদের একটি কবিতায় একজন ডোম্বী রমণীর কথা বলা হয়েছে। সে যখন নৃত্য করে মনে হয় যেন একটি ফুল চৌষট্টিটি পাপড়ি মেলে দিয়ে শোভা/সৌন্দর্য বিকিরণ করছে। পাহাড়পুর বিহারে পোড়ামাটির যেসব ফলক পাওয়া যায় সেখানেও প্রাচীন বাংলার মানুষের নানান রকম উৎসব ও আনন্দের সুন্দর সব চিত্র আমরা দেখতে পাই। গায়ক ও গায়িকারা হাতে ডঙ্কা, বাঁশি, কাসর, কর্তাল বাজিয়ে গান গাইছে। বিবাহ উৎসবে পুরুষেরা গান গাইতো, মেয়েরা নৃত্য করতো। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বাংলার আদি এই অধিবাসীদের জীবন ও সংস্কৃতির গল্পই মূলত পরবর্তীকালে লিখিত কাব্য এবং পোড়ামাটির ফলকসমূহে উৎকীর্ণ হয়েছে। [পাহাড়পুর বিহারের একটি এবং অপরাপর আরো কয়েকটি পোড়া মাটির ফলকচিত্র]

অনুশীলনী : ৩

Draft Copy

উপরের পাঠে আমরা বিভিন্ন ধরনের উৎসের মাধ্যমে বাংলা অঞ্চলের বিভিন্ন রকমের মানুষের নাম এবং তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নানান উৎসব-আয়োজন সম্পর্কে জেনেছি। সুভাষিত রত্নকোষ এবং চর্যাপদ নামে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যের কথাও জেনেছি। এইসব গ্রন্থে বাংলার মানুষের জীবনের যেসব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাঁর সঙ্গে আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষের জীবনের মিল ও অমিলগুলো চিহ্নিত করে চলো একটা তুলনামূলক আলোচনা করি-

---

সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, রূপান্তর ও ধারাবাহিকতা

(১৩০০ থেকে ১৮০০ সাল বা সাধারণ অব্দ পর্যন্ত)

আরব বণিকদের সাথে বাংলার বাণিজ্য যোগাযোগ ছিল ৮ম/৯ম শতক থেকেই। বাণিজ্যসূত্রে চট্টগ্রাম এলাকায় আরবদের কেউ কেউ ধর্ম প্রচার করতে আসলেও তাদের কার্যক্রম দক্ষিণের সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৩০০ সাল বা সাধারণ অব্দের শুরুর দিকেই বাংলা অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমদিকে তুর্কি-আফগানদের আগমন ঘটে। তাঁরা বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকের একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে লখনৌতি নামে একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করে। এরপর থেকে তুরস্ক, ইরান, পারস্য, আফগানিস্থান, আরব প্রভৃতি এলাকা থেকে বাংলার বিভিন্ন অংশে নানান মতধারার যোদ্ধা, বণিক, ধর্মপ্রচারক পির, দরবেশ, সুফী-সাধকদের আগমন ঘটে। নবাগত শ্রেণীর অনেকেই বাংলায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে শুরু করলে এখানে নতুন ধর্ম-সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি আর সমাজ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়। খানকাহ, মসজিদ, মাদ্রাসা সহ নতুন ধারার নানান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষতা ও সূফীদের তৎপরতায় বাংলা অঞ্চলে আদি বসতি স্থাপনকারী মানুষদের কাছে নতুন এই ধর্ম-সংস্কৃতির কথা পৌঁছাতে শুরু করে। প্রাচীন কৌম সমাজ, সনাতনি ব্রাহ্মণ্য সমাজ, বৌদ্ধ, জৈন, ডোম, নিষাদ, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি বহুমাত্রিক উপাদান ও বৈচিত্র্যে সমাকীর্ণ সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই ইসলাম প্রবেশ করে এবং অন্যান্যদের পাশাপাশি অবস্থান গ্রহণ করে। বাঙলা অঞ্চলে সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, রূপান্তর আর সমন্বয় এগিয়ে চলে এই ভূ-খণ্ডের পুরানো নিয়মে, পুরোনো প্রক্রিয়ায়, নতুনভাবে।

Draft Copy

১৩ শতকের পর থেকে আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান থেকে যেসব মুসলমান বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করেন তারা সেইসব ভূখন্ড থেকে নিয়ে আসেন নতুন কিছু সামাজিক বিশ্বাস, রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক উপাদান। নতুন ধারার শিক্ষা, খাদ্যাভ্যাস, জামাকাপড়, স্থাপত্য রীতিও আসে তাদের সঙ্গে। তুর্কি, হাবসী, আফগান, মুগল শাসকগণ নিজ নিজ এলাকায় যে স্থাপত্য ও শিল্পরীতি দেখেছেন, বাংলা অঞ্চলে নির্মিত স্থাপত্য ও শিল্পে তার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবেই বাংলা অঞ্চলে ইসলাম সংস্কৃতির বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে প্রবেশ করেছে এবং এর বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় নানান বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্য দিয়ে।

উপরে উল্লিখিত মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় একের পর এক মসজিদ, দরগাহ, খানকাহ নির্মিত হয়েছে। স্থাপনাগুলোর মধ্যে পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়-লখনৌতির ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ, রাজশাহীর বাঘা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা অঞ্চলে নির্মিত আদিনা মসজিদটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের মালদহ জেলায়। এটা মসজিদ স্থাপত্যের একটি অনন্য নিদর্শন। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়, ১৩৭৩ সালে সিকান্দর শাহ মসজিদটি নির্মাণ করেন। এটি শুধু বাংলা অঞ্চল নয়, গোটা উপমহাদেশের মধ্যে অন্যতম একটি মসজিদ। বর্তমানে এটা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় টিকে রয়েছে। আদিনা মসজিদের অলংকৃত দেয়াল সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। মসজিদ স্থাপত্যের আদি রীতি মেনে এটা নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে উন্মুক্ত জায়গা রাখা হতো নামাজ পড়ার জন্য। ঝড়-বৃষ্টির কারনে বাঙলা অঞ্চলে মসজিদে উন্মুক্ত জায়গা রাখার এই রীতি পরিত্যক্ত হয়।

চিত্র- আদিনা মসজিদ, সাল : ১৩৭৩

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের শাসনকালে খান জাহান নামক একজন সুফিসাধক সুন্দরবন এলাকায় গভীর বন কেটে জনবসতি গড়ে তুলেন। খান জাহান ছিলেন একজন নির্মাতা। বর্তমানে যেখানে যশোর,

Draft Copy

খুলনা, বাগেরহাট অবস্থিত সেই এলাকায় তিনি অনেকগুলো শহর, মাদ্রাসা, মসজিদ, সেতু, সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। নতুন এক স্থাপত্যরীতিতে নির্মাণ করেন ষাটগম্বুজ মসজিদ। মসজিদের ৬০টি পিলার বা খাম্বা থেকে মানুষের মুখে মুখে এই নাম গড়ে উঠেছে। তোমরা মনে রাখবে, এই মসজিদের গম্বুজ আসলে ৮১টি। যাহোক, দিল্লির তুঘলক স্থাপত্যরীতির আদলে খান জাহান বাংলায় স্থাপত্যকর্মগুলো নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই স্থাপত্য রীতিকে "খান জাহান" রীতি বলেও অভিহিত করা হয়।

চিত্র- ষাটগম্বুজ মসজিদ

ষোড়শ শতকের শেষাশেষি থেকে বাংলায় মুগল শাসকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করে এবং শতকের গোঁড়ার দিকেই তা বাংলা অঞ্চলের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মুগল শাসনকালেও বাংলা অঞ্চলে আগ্রা, দিল্লি, ফতেহপুর সিক্রির মুগল-স্থাপত্য রীতির আদলে বাঙলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন ইমারত নির্মিত হয়। মুগল শাসনকালে নির্মিত ইমারত ও মসজিদগুলোর মধ্যে লালবাগ দুর্গ, ইদ্রাকপুর দুর্গ, গৌড়-লখনৌতির তাহখানা কমপ্লেক্স, ঢাকার করতলব খান মসজিদ, মুর্শিদাবাদের কাটরা মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মসজিদ, দুর্গ এবং কাটরার পাশাপাশি বিখ্যাত কিছু মন্দিরও নির্মিত হয় মুগল শাসিত বাংলা অঞ্চলে। এর মধ্যে বর্তমান পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির, পুটিয়ার শিবমন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মন্দির স্থাপত্যটি নবরত্ন বা নয় চূড়ার মন্দির। কান্তজির মন্দিরের বাইরের দেয়াল পুরোটা জুড়ে বসানো হয়েছে অনন্য সুন্দর পোড়ামাটির ফলক। এইসব ফলকে অংকিত হয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের নানান ঘটনাবলী আর তৎকালীন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমাজ-সংস্কৃতির খণ্ড চিত্র। এই মন্দির ছাড়াও আরো অসংখ্য মন্দির বাঙলা অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হয়েছিল। বাংলার গ্রামের কুড়ে ঘরের আদলে দো-চালা আর চৌ-চালা রীতিতে অনেকগুলো স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল।

Draft Copy

চিত্র: পাবনার জোড়া বাংলা মন্দির এবং দিনাজপুরের কান্তজির মন্দির

স্থাপত্যকলার পাশাপাশি সংগীত, সাহিত্য, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিত্রকলা সহ শিল্প-সংস্কৃতির নানান ক্ষেত্রে এইসময় লক্ষ্যনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। কৃষিভিত্তিক বাংলা অঞ্চলে ফসল কাটার দিনগুলো যে আদিকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা আমরা আগেই জেনেছি। মুগল শাসনামলে এই ফসলের মৌসুম ধরেই অনুষ্ঠিত হতো পুণ্যাহ নামে একটি উৎসব। পুণ্যাহ ছিল মূলত কৃষক ও রায়তদের কাছ থেকে জমিদারদের রাজস্ব গ্রহণের অনুষ্ঠান। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এই অনুষ্ঠানে নাচ, গান, যাত্রা, মেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই সহ নানান আনন্দ উৎসবের উদ্যোগ নেওয়া হতো। কৃষিভিত্তিক বাংলার সকল মানুষের কাছে ফসল তোলার দিনটি ছিল হাজার বছরের এক অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশের দিন।

১৩০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য হচ্ছে মঙ্গলকাব্য ও ময়মনসিংহ গীতিকা। মহাকাব্যের আদলে লেখা এই গীতিকবিতাগুলো বাদ্যবাজনা সহ গানের মতো করে পরিবেশন করা হতো। শুরুর দিকে সংস্কৃত এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃত ভাষায় বাংলা অঞ্চলের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য চর্চা করতেন। প্রাকৃত ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা। এই ভাষা থেকেই ধীরে ধীর বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটে।

এই সময়কালে বাংলায় আরবি এবং ফার্সি ভাষার আগমন ঘটে। বাংলা অঞ্চলে মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত সংস্কৃত এবং পালি ভাষার পাশাপাশি এই দুটি ভাষাও গৃহীত হয়। বাংলা অঞ্চলে মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত, পালি, আরবি, ফার্সি, পর্তুগিজ, ইংরেজি প্রভৃতি নানান ভাষার শব্দ মিশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

অনুশীলনী : ৩

চলো, একটা অনুসন্ধানমুলক কাজ করি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে ১৮০০ সাধারণ অব্দ পর্যন্ত সময়ে বাংলা অঞ্চলে আগমনকারী এবং বসতি স্থাপনকারী মানুষের পরিচয় খুঁজে বের করি। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই সকল মানুষের পৃথক পৃথক সামাজিক রীতি-নীতিগুলো খাতায় লিখি এবং কীভাবে এই পৃথক রীতি-নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় ঘটে তা শ্রেণীকক্ষে দলগত উপস্থাপনার মাধ্যমে তুলে ধরি।

Draft Copy

সমাজ-সংস্কৃতির অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য আর বহুত্ব, ভাষাভিত্তিক পরিচয় গঠন (১৮০০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত)

তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করে দেখেছো যে, ইতিহাসের নানান পর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলা অঞ্চলে নানান ভাষা, ধর্ম-সংস্কৃতি আর জাতির মানুষ এসেছে। বাংলার মানুষ এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে সমাজ-সংস্কৃতির নানান উপাদান গ্রহণ-বর্জন করে ইতিহাসের পথ ধরে সামনের দিয়ে এগিয়ে গেছে। এইজন্যেই বাংলার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এতো বেশি বৈচিত্র্য আর বহুত্ব চোখে পড়ে। এই বৈচিত্র্য আর বহুত্বের সুরকে একীভূত করেই সজ্জিত হয়েছে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আঙিনা যার ধারাবাহিকতা আমাদের জীবনে আজো বিদ্যমান।

পনেরো শতকের শেষ ভাগে বাংলা অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের জলপথে নতুন করে আগমন শুরু হয়। আঠারো শতকের মধ্যভাগে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, ইংরেজ বণিকেরা আঞ্চলিক বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান অংশগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজ ক্ষমতা অধিকার করে নিলে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে নতুন এক পরিবর্তনের ঢেউ উঠার ক্ষেত্র তৈরি হয়। শাসনকার্য পরিচালনা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ইংরেজ বাংলায় আসে। ধীরে ধীরে গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে বৃটিশ রাজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মিশনারী প্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজ শাসকদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা অঞ্চলে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। ইউরোপীয় শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতির আলোকে বিদ্যালয়গুলো পরিচালিত হতে শুরু করে। এর ফলে বাংলা অঞ্চলের মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। এই সময় থেকেই কোলকাতা হতে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

উনিশ শতকের শুরুর দিকে বাংলা অঞ্চলের ইংরেজ অধ্যুষিত এলাকাসমূহে সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন হয়। ইউরোপের নানান দেশ এবং ভাষার গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনূদিত হয়। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, সৈয়দ আমীর আলী, বেগম রোকেয়া প্রমুখ ব্যক্তিত্বের প্রচেষ্টায় শিক্ষার প্রসার ঘটে, সামাজিক বিভিন্ন কুসংস্কার দূর হতে থাকে এবং এক সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে শুরু করে। সামাজিক জীবনে আরো নানান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন দানবীর হাজি মুহম্মদ মহসীন, হাজি শরিয়তুল্লাহ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ।

উনিশ শতকে বাংলা অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের নতুন রূপে উপস্থাপন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মীর মোশারফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের হাত ধরে প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস রচিত হতে শুরু করে যা ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, জীবনানন্দ দাশ, জসীম উদ্দীন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হুমায়ূন আহমেদ, জাফর ইকবাল প্রমুখের লেখনির মাধ্যমে আরও ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ করে।

বাংলা অঞ্চলে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ জাগরণের কাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় উনিশ শতককে। ফরাসি বিপ্লবের মতো যুগান্তকারী রাজনৈতিক ঘটনাগুলো বাংলা অঞ্চলের মানুষ কিছু কিছু জানতে শুরু করে। যেকোন অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংস্কৃতি শিক্ষিত তরুণদের হাত ধরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। এরপর কখনও নিরস্ত্র আবার কখনও

Draft Copy

সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের মাধ্যমে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে এবিষয়ে বিস্তারিত পরিসরে তোমরা জানতে পারবে।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পাশাপাশি বাংলা প্রদেশকেও দুভাগে বিভক্ত করা হয়। বাংলা ভেঙে এর পশ্চিম অংশকে যুক্ত করা হয় ভারতের সঙ্গে আর পূর্ব অংশকে যুক্ত করা হয় ২২০০ কিলোমিটার দূরের পাকিস্তান নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে। সাধারণ মানুষের সম্মতি গ্রহণ না করেই তৎকালীন ব্রিটিশ, কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের রাজনীতিবিদগণ ধর্মের ভিত্তিতে এই ভাগ করেন। হিন্দু জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পশ্চিম অংশকে ভারতের সাথে এবং মুসলমান জনগোষ্ঠী বেশি এই কথা বলে বাংলার পূর্ব অংশকে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত করে দেয়া হয়। কিন্তু দেখা গেলো পশ্চিম বাংলায় বিপুল সংখ্যক মুসলমান, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে, একইভাবে পূর্ব বাংলায় রয়েছে বিপুল সংখ্যক হিন্দু, বৌদ্ধ আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই পাকিস্তান আর পূর্ব বাঙলার মানুষের সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভিজাত শাসকেরা তাদের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়। শাসকদের এই প্রস্তাবের বিপরীতে তৎকালীন পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি আদায়ে সক্ষম হয় পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষ। কিন্তু পূর্ব বাংলা এবং পাকিস্তানের নানান ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সাংস্কৃতিক বৈপরীত্যের তাতে অবসান ঘটেনি। ১৯৫৬ সাল থেকে পূর্ব বাংলার নাম আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তান করা হয়। তাতেও সংকটের কোনো সমাধান হয় নি। বাঙালি মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের রেশ ধরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী রেডিও-টেলিভিশন সহ নানান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত প্রচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। বাংলার পূর্বভাগের শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ সাধারণ মানুষ পাকিস্তান সরকারের এই ঘোষণায় আবারও বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। সরকারের নিষেধ উপেক্ষা করে মানুষ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন এবং রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করতে থাকেন।

সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যের রাজাগণ নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতেন এই যোদ্ধাদের পেশীশক্তিকে ব্যবহার করে। যোদ্ধারা বাস করতেন নগরের ভেতরে।

ছায়ানট

পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের শাসনকালে প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম ছায়ানট। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন করার ঐকান্তিক ইচ্ছায় রবীন্দ্র ভাবনা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অবলম্বন করে সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সঙ্গীতকে অবলম্বন করে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনার সমগ্রতাকে বরণ ও বিকাশে ছায়ানট অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক সংগঠনটি সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্রকর্মী, বিজ্ঞানী, সমাজব্রতীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। পাকিস্তানের এলিট স্বৈর শাসকদের দুঃশাসনের প্রতিবাদ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির পথযাত্রার অংশ ছায়ানট। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন অবধি বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গান, নৃত্য, যন্ত্রসংগীত প্রশিক্ষণ ও প্রচারে ছায়ানট নিরলসভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও মহামারীতে বিপন্ন মানুষের মধ্যে ত্রাণ সহায়তা সহ নানান ধরণের সেবামূলক কাজেও অংশ নেয় এই সংগঠন।

Draft Copy

চিত্র: রমনার বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান

বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে গেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম দিকভ্রান্ত এবং বিভ্রান্ত হয়নি কারণ বঙ্গীয় বদ্বীপের নদীনালা আর পানির ভূ-খন্ড থেকে উঠে আসা মানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতে নেতৃত্ব দেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র। ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলো ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে যখন বাংলা অঞ্চলে মানুষের রাজনৈতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করবে তখন আরো বিস্তারিত পরিসরে তোমরা জানতে পারবে।

ইতিহাসের দীর্ঘ পথযাত্রায় বাংলা অঞ্চলে ধর্ম-সংস্কৃতির পরিবর্তন আর রূপান্তর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সংস্কৃতির নানান রকমফের দেখা যায় বাংলা অঞ্চলের প্রত্যন্ত অংশে যেগুলোকে লোকজ সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে। সংস্কৃতির এই লোকজ উপকরণ বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রাণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানান ধর্ম-সংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে যারা বাঙলা অঞ্চলে এসেছেন তাদের সঙ্গে মিলনে-বিরোধে বাংলার সংস্কৃতির এই লোকজ ধারা টিকে রয়েছে। গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি হিসেবে শক্তিশালী রূপে গড়ে উঠেছে। তোমরা মনে রাখবে, বাংলার মানুষেরা আবহমানকালের ধারা অনুযায়ী পুরাতন সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিকে বজায় রেখে এবং নতুনের কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার মাধ্যমে সাংস্কৃতিকভাবে সব সময় সক্রিয় থেকেছে।

আঞ্চলিক বাংলার মানুষ যেভাবে ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে সেখানেও রয়েছে একটা নিজস্বতা। উৎসবে রয়েছে স্বকীয় কিছু মাত্রা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার সকল মানুষের প্রধানতম ধর্ম-সাংস্কৃতিক উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদ, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পুজা, দোল উৎসব, দেওয়ালি, শবে-বরাত, মহররম, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন, বিজু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিপুল আয়োজনে বৈশাখের প্রথমদিন উদযাপন করেন বাঙলা নববর্ষ উৎসব। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে হালখাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা থেকে বের হয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণকারী মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মোটিফ হিসেবে উঠে আসে কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনের নানান অনুষঙ্গ। বাংলা অঞ্চলের মানুষ হাজার

Draft Copy

বছর আগেও ফসল কাটার উৎসবটি যে নানান আয়োজনে উদযাপন করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায় নানান ঐতিহাসিক উৎসে। তোমরা জেনে খুশি হবে যে, ২০১৬ সালের ৩০ নভেম্বর জাতিসংঘের সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কর্তৃক মঙ্গল শোভাযাত্রা 'বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রা এখন আর কেবল বাঙ্গালির নয়, বিশ্ব সংস্কৃতির অংশ। ইউনেস্কো মঙ্গল শোভাযাত্রাকে স্বীকৃতি দেয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে, এটা শুধু একটা সম্প্রদায় বিশেষের নয়, এটা গোটা দেশের মানুষের, সারা পৃথিবীর মানুষের। [মঙ্গল শোভাযাত্রার ২/৩ টি ছবি যাবে।]

গান বা সঙ্গীত বাংলা অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম অনুষঙ্গ। লালন ফকির, হাসনরাজা, আব্বাসউদ্দীন, আবদুল আলীম, শাহ আব্দুল করিমের গান বাংলার মানুষের মুখে মুখে ভেসে বেড়ায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান বাংলা গানের জগতকে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়।

বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসও একই সঙ্গে প্রাচীন এবং আধুনিক উপাদানে সমৃদ্ধ। বর্তমান বাংলাদেশের সংসদ ভবন, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়াম প্রভৃতি ভবনগুলোতে পাশ্চাত্য নির্মাণধারার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। 'বাটারফ্লাই ক্যানপি' বা প্রজাপতির পাখার মতো দেখতে টিএসসির মূল অডিটোরিয়াম ভবনটিতে বাংলার কুড়ে ঘরের আদলে চালাযুক্ত স্থাপত্য রীতির সঙ্গে গ্রিক রীতির অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

চিত্র: টিএসসি অডিটোরিয়াম ভবন

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের ধারাবাহিক আলোচনাতে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে চিত্রকলা। তোমরা নিশ্চয়ই এসএম সুলতান ও জয়নুল আবেদিনের মতো প্রতিভাবান চিত্রকরদের নাম শুনেছো। এসএম সুলতানের চিত্রকর্মে ফুটে উঠেছে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও আবহমানকালের বাংলার মানুষের সক্ষমতার ইতিহাস আর টিকে থাকার অনুপ্রেরণার গল্প। সুলতানের চিত্রকর্মে বাঙ্গালি কৃষক সবসময় শক্তিশালী মানুষ হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

Draft Copy

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সংগ্রাম চিত্র

চিত্রকর্ম- কৃষক পুরুষের বলশালী দেহ, চিত্রকর -এস.এম সুলতান

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্মের মধ্যে রয়েছে নবান্ন, মনপুরা এবং সংগ্রাম। বাংলার মানুষের জীবনের উপগত নানা দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন এবং সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই মুর্তিমান হয়ে উঠেছে এই চিত্রকরের রঙতুলিতে।[সংগ্রাম চিত্র] শিল্পী কামরুল হাসান ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বিখ্যাত ছবিটি এঁকেছিলেন। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর অত্যাচার এবং গণহত্যা দেখে তিনি পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়ার ছবি এঁকে তার শিরোনাম দেন – 'ওরা মানুষ হত্যা করছে। আসুন আমরা পশু হত্যা করি'।

Draft Copy

অনুশীলনী : ৪

আত্মপরিচয় অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন

আদিকাল থেকে শুরু করে ১৯৭১ সাল অবধি বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ সম্পর্কে তোমরা কিছুটা ধারণা পেয়েছ। সমাজ-সংস্কৃতির এই গতিপথ নির্ধারণে রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং বাংলা অঞ্চলের ভৌগোলিক উপাদানসমূহেরও রয়েছে কিছু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভূমিকা। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র ও সমাজে আমাদের পরিচয় গঠন প্রক্রিয়ায় যুগে যুগে নানান উপাদান যুক্ত হয়েছে। নানান ধারার মানুষের সংমিশ্রন ঘটেছে। এর ফলে বৈচিত্র্য আর ভিন্নতাকে সাথে নিয়েই আমরা লাভ করেছি এক অনন্য আত্মপরিচয়। চলো, আদিকাল থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি যেসব রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে সেগুলো উল্লেখ করে একটি প্রতিবেদন লিখি। এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের আত্মপরিচয় গড়ে উঠার প্রক্রিয়াগুলো অনুসন্ধান করি।

শেষ মন্তব্য

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় অবধি মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বৈচিত্র্যময় গতিপথ এখনও ক্রিয়াশীল। প্রাচীনকাল থেকে যে বাংলা অঞ্চলের কথা আমরা জেনেছি, তারই পূর্বভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জন্ম অপেক্ষাকৃত নবীন, কিন্তু বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অভিজ্ঞতা কয়েক হাজার বছরের পুরনো। ইতিহাসের দীর্ঘ এই পথযাত্রায় সমগ্র বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের নানান ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অবিরাম বদল, বৈচিত্র্য আর বহুত্বের একসাথে পথ চলার অভিজ্ঞতা নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের নিজস্ব পরিচয়, তাদের সমাজ-সংস্কৃতির শ্বাশত রূপ আর ইতিহাস আর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা। আমরা বর্ণিল ও বহুমাত্রিক সেই সমাজ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছি।

Draft Copy

দক্ষিন এশিয়া: ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধানে

নিসর্গের প্রিয় শখ হলো ডাক টিকেট সংগ্রহ করা। মা তাকে এই সংগ্রহের জন্য একটি অ্যালবাম কিনে দিয়েছিলেন। মা নিজেও একসময় ডাকটিকেট সংগ্রহ করতেন। তাই কাজটিতে মায়ের উৎসাহেরও কোনো কমতি নেই। সেদিন মা আলমারি গুছাতে গিয়ে তাঁর ডাকটিকেট সংগ্রহের পুরোনো খাতাটি খুঁজে পেলেন। নিসর্গকে মা বললেন, এখন থেকে এগুলো তোমার সংগ্রহে রাখতে পারো। একই সাথে অনেকগুলো পুরোনো ডাকটিকেট পেয়ে নিসর্গের সে কী আনন্দ! খাতার পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে। পাতা উল্টাতে উল্টাতে অনেকগুলো দেশের ডাকটিকেটে নিসর্গের দৃষ্টি আটকে গেল। আচ্ছা, ডাকটিকেটে কি সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কোনো উপাদান থাকে? দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সন্ধানে ডাকটিকেট কি কোনোভাবে সাহায্য করতে পারে? নিচে কয়েকটা ডাকটিকেটের ছবি দেখতে পাচ্ছো। এগুলোতে প্রতিটা দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির কিছু কিছু ছাপ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ডাকটিকেটগুলো দেখে এরকম কয়েকটা বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারবে?

বাংলাদেশী, ভারতীয়, নেপালি, পাকিস্তানি ও শ্রীলঙ্কান, ষ্ট্যাম্প-এর ছবি

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হতে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতীয় উপমহাদেশ একটি বিশেষ বৈচিত্র্যমন্ডিত অঞ্চল। সাগর, পর্বত, মালভূমি, বনভূমি, জলাভূমি, মরুভূমি প্রভৃতির সমন্বয়ে এটি বিশাল একটা ভূ-খন্ড। তাই এর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদানগুলোও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতবর্ষে কখন প্রথম মানুষের বসবাস শুরু হয় তা সঠিকভাবে বলা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের

Draft Copy

ব্যবহৃত পাথুরে হাতিয়ার পরীক্ষা করে ভূ-তত্ত্ববিদগণ বলেন যে, প্রায় ৫ লক্ষ বছর পূর্বে ভারতে প্রথম মানুষের বসবাস শুরু হয়েছিল। আর এই মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যের কথা ব্যাপকভাবে জানা যায় লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর হতেই।

কৃষি ও নগর বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় মানুষ নানান ধারার সাংস্কৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছে। ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মিশ্রণ ও মিলনের ধারা প্রত্যক্ষ করেছে। এইভাবে সময়ের সাথে সাথে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। যুক্ত হয়েছে নিত্য নতুন উপাদান। সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। বৈচিত্র্য, বহুত্ব আর ভিন্নতা বাস্তবতা হিসেবে বারবার সামনে এসেছে। আর এই কারণেই সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিক রূপান্তরের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান মানুষের ইতিহাসের সবচাইতে বর্ণিল অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে অন্যতম।

হরপ্পা সভ্যতা: দক্ষিণ এশিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশে সমাজ ও সংস্কৃতি রচনার প্রথম ধাপ

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক উপাদানকে উপজীব্য করে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হরপ্পা সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। ১৯২২ সালে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে বিরাট দুইটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। এই নগর দুটি হলো: মহেনজোদারো আর হরপ্পা। এই দুটো নগরের একটি বর্তমানে ভারত এবং অন্যটি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পড়েছে। হরপ্পা সভ্যতার বিস্তীর্ণ এলাকায় এক হাজারেরও বেশি প্রাচীন নগর ও বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থল হতে পাওয়া গেছে অসংখ্য নিদর্শন। এই সভ্যতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুসন্ধান করে তার কিছুটা জেনে নেয়া যাক।

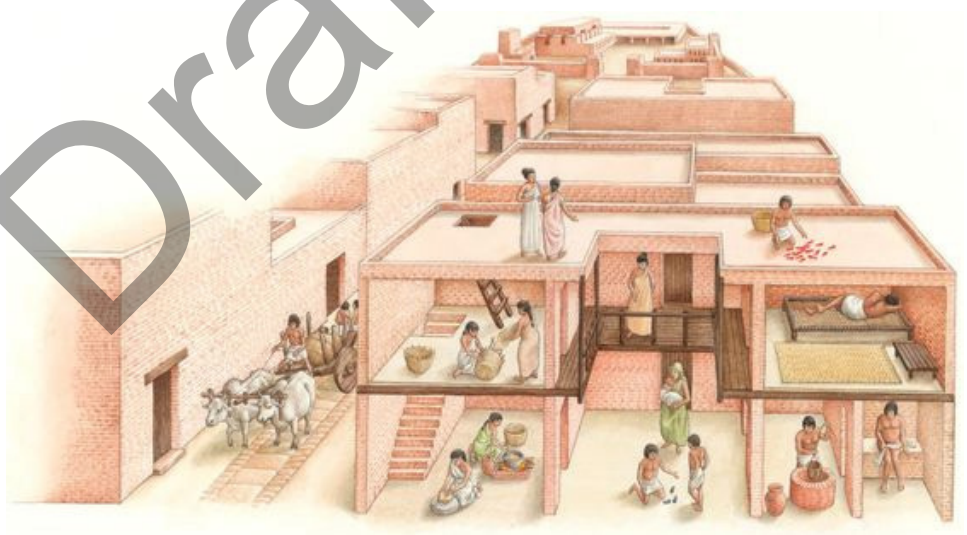

মহেনজোদারোর রাস্তা আর রাস্তার পাশের ঘরবাড়ি।

Draft Copy

বিশ শতকের গোড়ার দিকেও এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা বৈদিক যুগ থেকে শুর হয়েছে। কিন্তু ১৯২২ সালে মহেনজোদারোতে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার খুঁড়তে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিক মাটির পাত্র ও কিছু পাথরের শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে হরপ্পা, লোথাল প্রভৃতি স্থান খননের ফলে এমনসব গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, সিন্ধু নদীর তীরে মিশরীয়, ব্যবিলনীয়, অ্যাসেরীয় প্রভৃতি সভ্যতার প্রায় সমসাময়িক একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা ভারতবর্ষেও বিকশিত হয়েছিল বলে প্রমাণিত হয়। উৎখনন হতে প্রাপ্ত বস্তুগত নিদর্শন এবং নগর বিন্যাস হতে তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সমসাময়িক নীল নদের অববাহিকায় বিকশিত মিসরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমীয় সভ্যতা, চীনের হোয়াং হো নদীর অববাহিকার সভ্যতার দূরত্ব ও বিস্তার বোঝার জন্য মানচিত্র

শ্রেণিভিত্তিক সমাজ: হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলোতে শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বিদ্যমান ছিল। প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে মনে করা হয়, তৎকালীন সময়ে ৪টি শ্রেণি ছিল। শিক্ষিত শ্রেণি; যোদ্ধা শ্রেণি; ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণি; এবং শ্রমজীবী শ্রেণি। শাসক, পুরোহিত, জ্যোতিষী, চিকিৎসক প্রভৃতি অভিজাত-শিক্ষিত শ্রেণির অন্তর্গত ছিল। তারা বাস করতেন বৃহৎ প্রসাদ ও দুর্গ এলাকায়। অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরা সাধারণত ক্ষুদ্র দু'কামরার ঘরে বসবাস করতেন।

খাদ্য: বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, নগরবাসী গরু, ছাগল, শূকর, হাঁস-মুরগি, কচ্ছপ ইত্যাদির মাংস খেত। তবে তাদের প্রধান খাদ্য ছিল গম। যব ও খেজুরও তারা খেত। এছাড়াও মাছ, সবজি, ফল ইত্যাদিতে এ সভ্যতার অধিবাসীরা খেত বলে মনে করা হয়।

পোশাক: সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় পোশাকের নিদর্শন একটি ক্ষুদ্র মূর্তি হতে অনুমান করা যায়। এ মূর্তির পরনে ছিল ধুতির মতো কাপড় এবং একটি চাদর। হরপ্পায় বস্ত্রবয়ন একটি বড় শিল্প ছিল,

Draft Copy

মহেঞ্জোদারোর বিভিন্ন বাড়ি থেকে সুতা কাটার যন্ত্রও পাওয়া গেছে। অভিজাত শ্রেণির নারীরা নানাবিধ অলংকার পরতো, তারা দুই প্রস্থ পোশাক ব্যবহার করতো। কানে, হাতে, গলায় সোনা, রূপা ও দামী পাথরের অলংকার পরতো। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করতো এবং চোখে সুরমা ব্যবহার করতো।

শিল্পকলা: শিল্পকলার ক্ষেত্রে সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নস্থলগুলোতে উন্নত নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও অলংকার শিল্পের দক্ষতা হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর শিল্পীদের শিল্পকুশলতার পরিচয় বহন করে। এখানে চুনাপাথরের মূর্তি, আবক্ষ মূর্তি প্রভৃতি পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের একটি বড় নিদর্শন হচ্ছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত ২৫০০টি সিল।

হরপ্পা ও মহেনজোদারো সভ্যতার মানুষদের ব্যবহৃত পোড়ামাটির, খেলনা, চাকতি, জীবজন্তুর প্রতিকৃতি, স্বল্পমূল্যের পুঁতি, ধাতুর হাতের চুরি, গলার হারসহ নানা ধরনের অলংকার।

ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা ও অন্যান্য: হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নস্থানগুলোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির মূর্তিগুলোর অধিকাংশই ছিল নারী প্রতিকৃতি। এ থেকে মনে করা হয়, সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতায় মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। সিলের ছবি থেকে ধারণা করা হয়, এখানে পশু ও বৃক্ষ উপাসনা প্রচলিত ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার প্রচলন ছিল। সমাধিতে মৃতের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি রাখার প্রচলন ছিল। এ থেকে মনে করা হয় যে, এই সভ্যতার মানুষেরা বিশ্বাস করতো, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত কিছু শেষ হয়ে যায় না। হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন প্রত্নস্থানে কিছু সমাধিক্ষেত্র পাওয়া গেছে। সেগুলোতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি সহ অনেক অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন, হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসী দ্রাবিড়ীয় ভাষার কোনো একটি আদি রূপে কথা বলতেন। এদের প্রোটো-দ্রাবিড়ীয় প্রকারের ভাষা বলা হয়।

লিখন পদ্ধতি (হরপ্পা লিপি): হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নস্থলগুলোতে প্রায় ২৫০০ সিলমোহর পাওয়া গেছে। এগুলোতে চিত্রধর্মী লিপি পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধারের কাজ বর্তমানে বেশ জোরে-শোরে এগিয়ে চলেছে। বিশিষ্ট গবেষক বহতা অংশুমালি মুখোপাধ্যায় এই পাঠোদ্ধার বিষয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করে অতি সম্প্রতি সারা পৃথিবীতে হরপ্পা সভ্যতাকে 'নগর সভ্যতা'র পর্যায়ে উন্নীত হতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অবদান রেখেছেন। পৃথিবীর বিখ্যাত 'নেচার' জার্নালে হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে।

Draft Copy

হরপ্পা সভ্যতায় বাণিজ্য ও বিভিন্ন নগরের পরিচয় নির্ধারণকারী বিভিন্ন ধরনের সীলমোহর। এই সিলমোহর ও সিলমোহরে ব্যবহৃত হরফ বা চিত্রলিপিগুলো এখনো প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদদের কাছে রহস্যময় রয়ে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে এগুলোর ব্যবহার সম্পর্ককে।

চিত্র: ১৯২৫ সাধারণ অব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার ২৫০০টি সিলে চিত্রধর্মী লিপি পাওয়া গেছে। ভাষাবিদ ডক্টর বহতা অংশুমালি মুখোপাধ্যায় এই লিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং পৃথিবী বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে (২০১৯)।

Draft Copy

সিন্ধু ও হরপ্পা সভ্যতার কত অজানা বিষয় সম্পর্কে জানলাম তাই না! চলো তাহলে এসব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি জিনিসের কিছু ছবি এঁকে ফেলি।

বিষয়	ছবি
অলংকার	
খেলনা	
সিল	
মৃৎপাত্র	

হরপ্পার পরে ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন মানুষ ও বসতি: সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল

যমুনা এবং শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় হরপ্পা-পরবর্তী ৫ শতাধিক জনবসতি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশে পাঞ্জাব অঞ্চলের ব্রোঞ্জ যুগের সংস্কৃতি। এটি ছিল হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ের একটি আঞ্চলিক রূপ। এছাড়া গঙ্গা অববাহিকায় ব্রোঞ্জ যুগের মৃৎশিল্পের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণভাগে হয়েছিল লোহার প্রচলন। ভারতের পূর্বদিকে বিহার ও পশ্চিম বাংলায় লাল ও কালো রঙের মৃৎপাত্র আর তামার ব্যবহারকারী মানব বসতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

হরপ্পা সভ্যতার অবনতির পরে নগর ও রাষ্ট্র বিকশিত না হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় বা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে নানান গোত্র ও বংশধারা বিকশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে দলে দলে মানুষ ভারত উপমহাদেশে আগমন করছিল নতুন জীবন, নতুন ভাষা আর নতুন প্রযুক্তি নিয়ে। তাদের একটা বড় অংশ যাযাবর ও পশুপালক ছিল। হরপ্পা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থানের মানুষের সঙ্গে এই মধ্য এশীয় মানুষদের সংমিশ্রণ ঘটছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে। এই মধ্য এশিয়ার মানুষদেরই আর্য নামে ডাকা হতো। তোমরা মনে রাখবে আর্য কোনো জাতির নাম নয়, আর্য একটা ভাষার নাম। এই ভাষায় কথা বলা মানুষেরাই ইতিহাসে আর্য ভাষাভাষী বা ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ নামে পরিচিত।

হরপ্পা সভ্যতার অবনতির পরে যে জনগোষ্ঠীগুলো দক্ষিণ ভারতে চলে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সংমিশ্রণে তৈরি হলো যে ভাষা শ্রেণি তার নাম দেওয়া হয়েছে দ্রাবিড়ীয় ভাষা। ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষেরা মূলত এই দ্রাবিড়ীয় ভাষার কাছাকাছি কোনো একটি

Draft Copy

ভাষায় কথা বলতো। তৃণভূমি থেকে আসা পশুপালকরা ভারত উপমহাদেশে আসার পরে অনিবার্যভাবেই স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তাদের মিশ্রণ ঘটে।

অভিবাসন (Migration):

অভিবাসন হলো এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মানুষের স্থানান্তর। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী বা মানুষের গ্রাম থেকে শহরে আগমন, স্থান বদল, কয়েকদিন কিংবা বহু বছর নিজের আদি বা স্থায়ী বাড়ি থেকে অনুপস্থিতি।

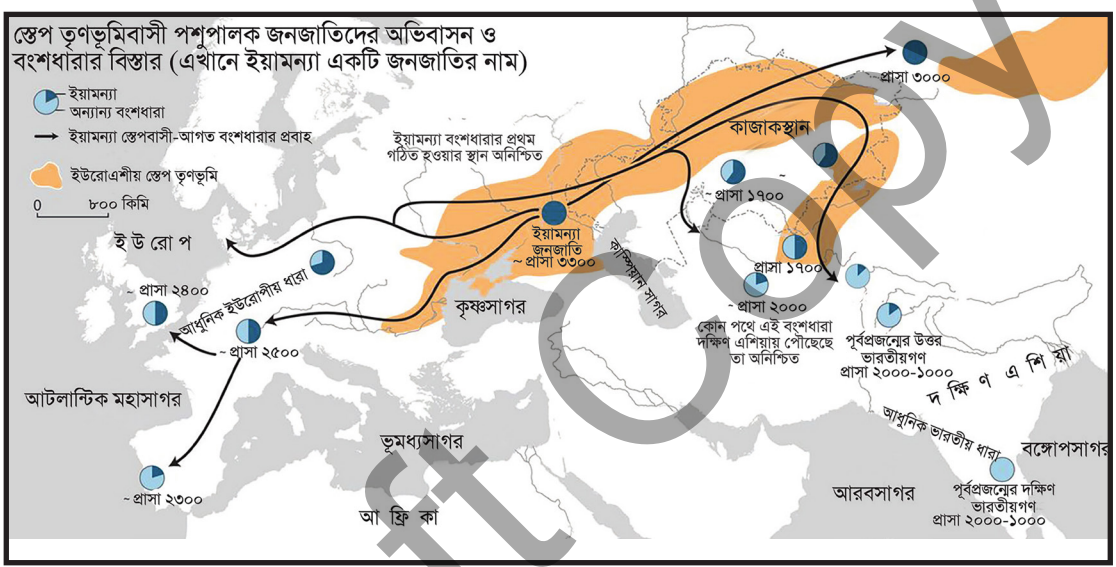

স্তেপ তৃণভূমি থেকে জনগোষ্ঠীর (ইয়ামানা নামের) বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গমন।

তৃণভূমি অঞ্চল থেকে একদল মানুষের ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে আগমনের কথা তোমরা জেনেছো। তৃণভূমি হলো ঘাসে আচ্ছাদিত বিশাল এলাকা, যেখানে ঘাসের বৃদ্ধির জন্যে অনুকূল পরিবেশ থাকে কিন্তু লম্বা গাছপালা, বিশেষ করে গাছ এবং গুল্মগুলোর জন্যে থাকে না। যাহোক, তৃনভূমি থেকে আগত মানুষ মূলত পশুপালক ও যাযাবর সম্প্রদায়ের ছিল। তারা ঘোড়া পোষ মানিয়েছিল। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার জন্য ঘোড়া ও ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করায় তাদের কম সময় লাগতো। তারা কৃষিকাজ যেমন জানতো না, তেমনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতন নগর তৈরি করাও তারা শিখে উঠতে পারে নি। তাদের ভাষাও ভিন্ন ছিল। সকলের ভাষা এক ছিল না। ভাষাতত্ত্ববিদগণ তাদের ভাষা এবং তাদের বিভিন্ন স্থানে অভিবাসনের ফলে নানান স্থানীয় ভাষার সঙ্গে সংমিশ্রণে বিভিন্ন ভাষা তৈরি হয়েছে। এসব ভাষাকে একত্রে ভাষাতাত্ত্বিকগণ একটা শ্রেণিতে রেখেছেন। এদের বলে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা শ্রেণি।

Draft Copy

আলোচ্য সময়কালে ভারতের আদি অধিবাসীরা অনেকগুলো ভাষাগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এসেছে। এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একটি হলো অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী। মূলত চীনে কৃষিকাজ, বিশেষ করে ধানচাষ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সেখান থেকে স্থলপথে একটি গোষ্ঠী ভারত উপমহাদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অভিবাসন করে। এই গোষ্ঠীই অস্ট্রো-এশিয়াটিক বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটায় (যেমন: মুন্ডা ভাষা, খাসিদের ভাষা)। অন্যদিকে, তিব্বত-বার্মা ধারার আরেকটি ভাষাগোষ্ঠীও ভারত উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্ত দিয়ে আগমন করেন মোটামুটি একই সময়ে। সেই ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোও পরে বিভিন্ন ভাষার বিকাশ ঘটিয়েছে অন্য ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে মিশ্রণের মাধ্যমে। এ ছাড়াও আছে কিছু ভাষাগোষ্ঠী যেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে।

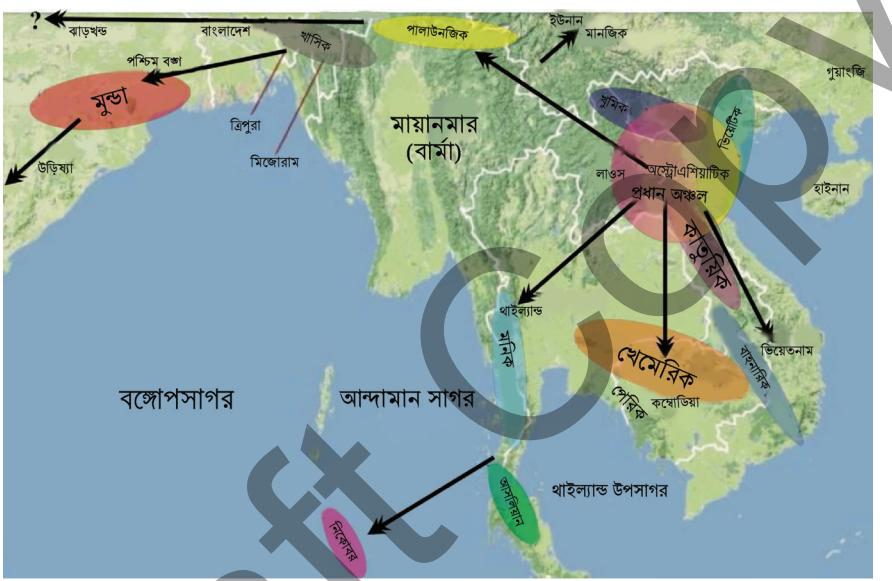

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অস্ট্রোএশিয়াটিক জনগোষ্ঠীগুলোর অভিবাসনের পথ।

তাহলে তোমরা স্পষ্টই জানতে পারলে যে, কোনো ভাষাই বিশুদ্ধ, অপরিবর্তনীয় এবং মৌলিক নয়। বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ থেকে যেমন নতুন নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে, তেমনই বিদ্যমান ভাষায় পরিবর্তনও এসেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে আমরা জানলাম। হরপ্পা সভ্যতার পর পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ থেকে আগত নানান ভাষার ও দেহ গড়ানার মানুষের আগমন সম্পর্কেও জানলাম। এর মধ্য দিয়ে একটি স্থানের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কীভাবে নতুন উপাদান প্রবেশ করে নিশ্চয়ই কিছুটা হলেও আমরা ধারণা করতে পেরেছি। চলো, উপরের পাঠের আলোকে "সমাজ-সংস্কৃতির গঠন ও রূপান্তর" বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখি।

বৈদিক সভ্যতা: মানুষের পরিচয়, সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর

বৈদিক সভ্যতার নামকরণ করা হয় সংস্কৃত গ্রন্থ 'বেদ'-এর নাম থেকে। চারটি বেদ-এর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হচ্ছে ঋগবেদ। এর শ্লোকগুলোর রচনাকাল ধরা হয় আনুমানিক ১৫০০ থেকে ১০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ। বৈদিক সভ্যতাকেও পন্ডিতগণ চারটি বেদ-এর সময়কাল অনুসারে দুইভাগে ভাগ করে থাকে। একটি হচ্ছে, ঋগবেদের

Draft Copy

যুগ। দ্বিতীয়টিকে বলা হয়, পরবর্তী বৈদিক যুগ।

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পর ধীরে ধীরে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের হাতে বৈদিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। আর্য ভাষীদের প্রথম দলটি আনুমানিক ১৫০০ সাধারণ পূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বতের গিরিপথ দিয়ে ভারতের উত্তরাংশে প্রবেশ করেছিল। ধীরে ধীরে তারা ভারতের মধ্য এবং পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকে। ভারতবর্ষের সর্বপূর্বপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা অঞ্চলে আসতে তাদের প্রায় একহাজার বছর সময় লেগে যায়। তারা মূলত গঙ্গা নদীর তীর ধরে অগ্রসর হয়েছিল। আর্যভাষীগণও দক্ষিণ ভারতে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে বিন্ধ্য পর্বতের প্রাকৃতিক বাঁধা।

আর্যভাষী জনগোষ্ঠী যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল সেই সময়কেই বলা হয় ঋগবেদের যুগ। পূর্বেই আমরা জেনেছি, ১৫০০ থেকে ১০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই যুগ চলমান ছিল। ঋগবেদের যুগে মানুষের মধ্যে প্রধানত ৩টি শ্রেণি ছিল। যথা: যোদ্ধাশ্রেণি বা রাজন্য, ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণি এবং সাধারণ জনগোষ্ঠী। অধিকাংশ পন্ডিত এ বিষয়ে একমত যে, আর্যভাষীগণ যখন আসেন তখন তাদের সমাজে জাতিভেদ প্রথা অনুপস্থিত ছিল। বংশানুক্রমিক জাতিভেদ প্রথা তাদের মধ্যে পরবর্তীকালে চালু হয়।

ঋগবেদের সমাজে একান্নবর্তী পরিবারের প্রাধান্য ছিল। পরিবারগুলো ছিলো পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধন ছিল। তবে বেদ-পূর্ব যুগের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ভাষী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রাধান্য ছিল।

যাযাবর আর্য ভাষাভাষী মানুষেরা প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশের পর নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে তারা বদলে নিয়েছিল নিজেদের ধর্মচিন্তা, রাজনীতি, সমাজনীতি ও সংস্কৃতির ধারণা। নতুন সমাজ ব্যবস্থায় অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থা বোঝাতে সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ 'মহাভারত' নামক মহাকাব্যে বর্ণিত একলব্যের পরিণতি। যারা মহাভারত সম্পর্কে অল্পবিস্তর হলেও গল্প শুনেছো, তারা নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছো একলব্যকে। একলব্য সেই জ্ঞানপিপাসু তরুণ যিনি নিজের অস্ত্র বিদ্যাকে পরিপূর্ণ করার বাসনা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন সেই সময়ের বিখ্যাত অস্ত্র-বিশারদ দ্রোণাচার্যের কাছে। আচার্য দ্রোণ তাকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, কেননা একলব্য ছিলেন অনার্য। আর আর্য ভাষাভাষীরা ভাগ হয়ে গিয়েছিল কয়েকটি ধারায়। সময় আর স্বার্থান্বেষীর খপ্পরে পড়ে তাদের মধ্যে দানা বেধেছিল অনেক কুসংস্কার। এতদসত্বেও সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের উত্তরাংশের ভূমিকে তারা নিজের করে নিয়েছিল।

ঋগবেদের পরের যুগকে বলা হয় পরবর্তী বৈদিক যুগ। এই যুগের গ্রন্থগুলো এবং প্রত্নতাত্তিক নির্দশন থেকে মূলবান তথ্য পাওয়া যায় যা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গতিধারা বুঝতে সাহায্য করে। পরবর্তী বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ও শ্রেণিভেদ প্রথা আরো কঠোর হয়। বিভিন্ন বর্ণ-শ্রেণির মধ্যে বৈষম্য বাড়ে। ভারতের পূর্ব ও দক্ষিণাংশে আর্যভাষীদের বিস্তারের সময় সেখানে বসবাসরত অনার্য, অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ভাষীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতেই থাকতো। এজন্য বৈদিক সমাজে রাজন্য বা যোদ্ধাশ্রেণির প্রাধান্য বাড়ে। রাজন্য বা ক্ষত্রিয়রা সামরিক শক্তির জোরে সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠে। পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার রাখতো। বৈশ্যরা এ যুগে কৃষি ও পশুপালন ছাড়াও আরও নানান পেশা বেছে নেয়। জীবনযাত্রায় জটিলতা বৃদ্ধির ফলে বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পূর্বের ৪টি শ্রেণি বা বর্ণের স্থলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র বর্ণের উদ্ভব হয়। বাণিজ্য, শিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি উৎপাদনমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। পরবর্তী বৈদিক যুগে শুদ্রদের অবস্থা সর্বাধিক খারাপ হয়। সমাজ কাঠামোয় শুদ্রদের অবস্থান ছিল সবার নিচে। অথচ সংখ্যায় তারা

Draft Copy

ছিল সবচেয়ে বেশি। এযুগে নারীদের মর্যাদাও অনেক কমে যায়। ধর্মাচরণে নারীদের সুযোগ কমে যায় এবং বাল্যবিবাহের হার অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পায়। সম্পত্তির অধিকার হতেও নারীদের খর্ব করা হয়।

সাধারণ পূর্বাব্দ ৬ষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতি

সাধারণ পূর্বাব্দ ৬ষ্ঠ শতকের ভারতবর্ষে সর্বভারতীয় কোনো রাজ্য ছিলনা। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, ১৬টি রাজ্য বা ষোড়শ মহাজনপদে তখন ভারতের বিভিন্ন অংশ বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে মগধ ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ এবং শক্তিধর রাজ্য। পরবর্তীকালে মৌর্যদের সময় মগধকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষে বিশাল সামাজ্য গড়ে উঠে।

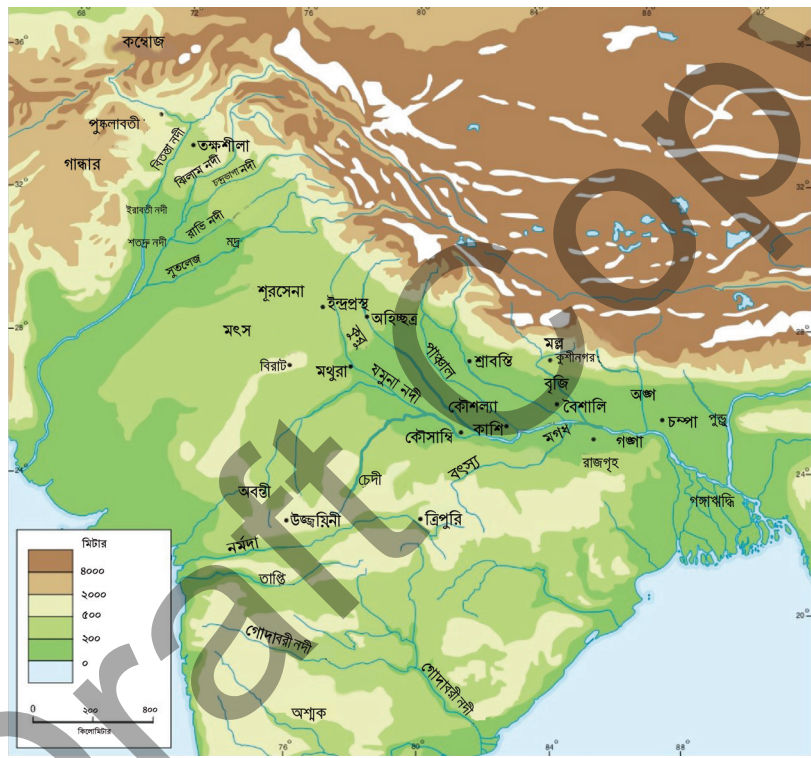

ষোলোটি মহাজনপদ ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল তা এই মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। [উৎস : উপিন্দর সিংয়ের বইয়ের মানচিত্র থেকে রূপান্তরিত]

মগধে ছিল মিশ্র সংস্কৃতি। উত্তর ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি যখন মগধে পৌছায়, তখন এর প্রবলতা অনেকটা কমে গিয়েছিল। তার প্রাথমিক কঠোরতা এবং উগ্রতা হ্রাস পেয়েছিল। অপরদিকে পূর্ব ভারতের অনার্য ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের সংস্কৃতির ভিত ছিল বেশ মজবুত। আর্য এবং অনার্য ভাষাভাষী মানুষের এই উভয় সংস্কৃতির মিলনে এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যা মগধের উত্থানে ভূমিকা রেখেছে।

Draft Copy

মৌর্য সাম্রাজ্য ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজ্যের এবং মগধ নামের জনপদের রাজধানী ও প্রধান নগরকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র। ভারতের বিহার রাজ্যের রাজধানী পাটনায় এই পাটলিপুত্র নগরের অবস্থান ছিল। শিল্পীর চোখে সেই সময়ের পাটলিপুত্র নগরের স্থাপনা, মন্দির ও রাস্তা।

৩য় সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে ৩য় সাধারণ অব্দ পর্যন্ত (সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল)

সাধারণ পূর্বাব্দ ৩য় শতক থেকেই ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। মৌর্য শাসকদের হাত ধরেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম বিরাট এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি সূত্র হতে মৌর্য যুগে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়।

মেগাস্থিনিস তার 'ইন্ডিকা' নামক গ্রন্থে সেই সময়ের ভারতবর্ষের ৭টি জাতির অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা, পরিদর্শক, রাজার উপদেষ্টা, কৃষক, ব্যাধ বা শিকারী, শিল্পী ও কারিগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেগাস্থিনিস তাঁর গ্রন্থে বৃত্তি বা জীবিকার ভিত্তিতে জাতি ভাগ করেছেন। মৌর্যযুগে ভারতে জাতিভেদ প্রথার তীব্রতা খুব সম্ভবত কিছুটা কমেছিল। মেগাস্থিনিসের চোখে এই প্রথার তীব্রতা তেমন ধরা পড়েনি। মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে জানা যায়, সমাজে নারীর অবস্থান খুব উঁচুতে ছিল না। বৌদ্ধ সংঘে নারীরা স্বাধীনতা ভোগ করতো। অভিজাত কুলের নারীরা লেখাপড়া জানতো, গ্রিক লেখকদের মতে, সতিদাহ প্রথা বিদ্যমান ছিল। নারীদের উপর নানান সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।

সংস্কৃত ছিল উচ্চ শ্রেণির শিক্ষার বাহন। ব্রাহ্মণ সন্তানকে অন্ততপক্ষে বার বছর গুরুগৃহে থেকে শাস্ত্র শিখতে হতো। পাঞ্চাল, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, বারাণসী উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সংস্কৃত ছাড়াও প্রাকৃত ভাষা ও ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল। মৌর্য যুগে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। অশোকের স্তম্ভ, প্রাসাদ, স্তূপ, স্থাপত্য, সারনাথ স্তম্ভ প্রভৃতি সে যুগের শিল্পকলার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বর্তমানে ভারতের বৈশালীতে অবস্থিত বৌদ্ধস্তূপ এবং একটি অশোক-স্তম্ভ। বৌদ্ধস্তূপ হলো একধরনের স্থাপত্য। গৌতম বুদ্ধের পরলোকগমনের পরে তার দেহভস্ম বিভিন্ন স্থানে নিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই দেহভস্মের উপরে এমন অর্ধগোলাকার স্থাপনা নির্মাণ করা শুরু হয়। তারপরে পুণ্য অর্জনের জন্য, বিভিন্ন সাধক ও বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বপূর্ণ প্রচারক-শিক্ষক-চিন্তাবিদদের দেহভস্মের উপরে অথবা প্রতীক হিসেবে বিভিন্ন আকারের ও প্রকারের বৌদ্ধস্তূপ তৈরি করা হতো। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বৌদ্ধস্তূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাচার পরিচালনা করার স্থান। মাটি দিয়ে, পাথর দিয়ে, পাথর কেটে ভারত উপমহাদেশ ও উপমহাদেশের বাইরেও এই স্তূপ তৈরি করা ও উপাসনা করার রীতি প্রচলিত হয়। আর সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্তম্ভ বানিয়েছেন। স্তম্ভগুলোতে সম্রাট অশোকের প্রচারিত বিভিন্ন বাণী ও বিধি-বিধান লেখা থাকত। এসব স্তম্ভের উপরের অংশ সিংহ ভাস্কর্য, ধর্মচক্রসহ বিভিন্ন ধরনের অলংকরণ ছিল। এছাড়া, পাথরের উপরে খোদাই করে লিখিত বাণী, বিধি-বিধান, উপদেশও বিভিন্ন স্থানে অশোক স্থাপন করেন। এই লিপিগুলো সেই সময়ের ইতিহাসের দারুণ গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মৌর্যদের পর ভারতবর্ষে শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি রাজবংশের মানুষদের আগমনের ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এ যুগে বৌদ্ধধর্মের বহু রূপান্তর ঘটে। মহাযান এবং হীনযান নামে প্রধান দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। পরে মহাযান আবার একাধিক ধারায় রূপান্তরিত হয়। এ ছাড়া ভক্তিধর্ম এবং লোকধর্মের জনপ্রিয়তা এসময় লক্ষ করা যায়।

মৌর্য পরবর্তী সময়ে ভাষা ও সাহিত্যের জগতে সংস্কৃতের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। মৌর্য শাসনকালে প্রাকৃত ভাষা রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল।

Draft Copy

৩য় থেকে ৬ষ্ঠ সাধারণ অব্দ: সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল

গুপ্ত শাসনকালে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানামুখী পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার গুপ্তদের সময়কে 'ধ্রপদী যুগ' বলে অভিহিত করেন। এ যুগে সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য এক অনন্য পর্যায়ে উন্নীত হয়। মহাকাব্য ও নাটক রচিত হয় এ সময়। সমাজের উচ্চশ্রেণীর চিত্তবিনোদনের জন্য সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকার ছিলেন মহাকবি কালিদাস।

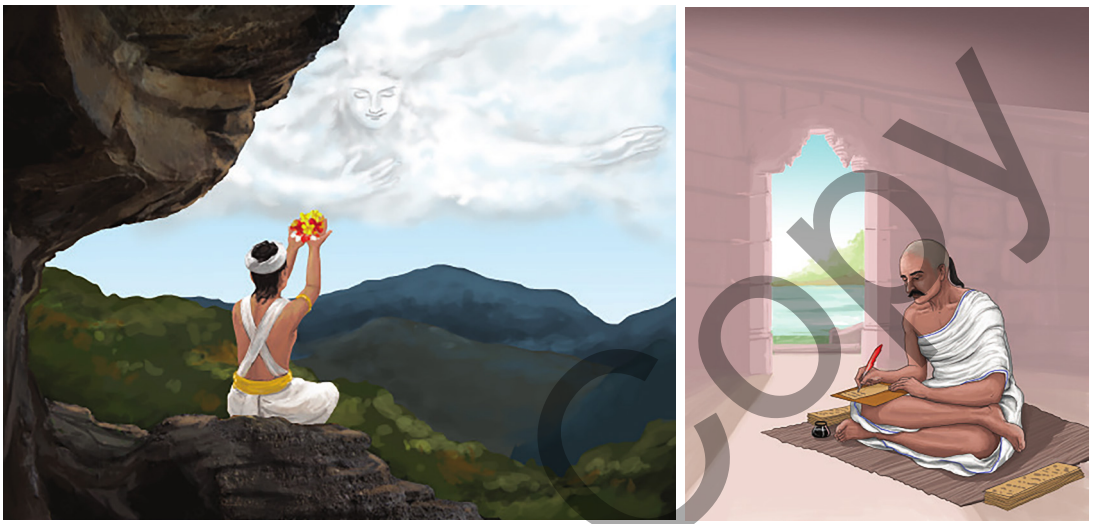

চিত্র: মহাকবি কালিদাস কাব্য রচনা করছেন। মেঘদূত থেকে দৃশ্য কল্পনা করে আঁকা ছবি।

গুপ্ত শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর আরাধনা এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের চর্চা বিদ্যমান ছিল। চৈনিক পর্যটক ফা-সিয়ান প্রাচীন ভারতবর্ষের গান্ধার, মথুরা প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরকে দেখেছিলেন বলে জানা যায়।

গুপ্ত শাসনকালে শিল্পকলার ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় মন্দির স্থাপত্যের বিশেষ শৈলী সুচিত হয়। এছাড়াও ভাস্কর্য শিল্প, চিত্রকলা, ধাতুশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখ্যযোগ্য বিকাশ সাধিত হয়। এ সবকিছু মিলিয়েই গুপ্তদের সময়ের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে 'ধ্রুপদী যুগ' বলা হয়।

Draft Copy

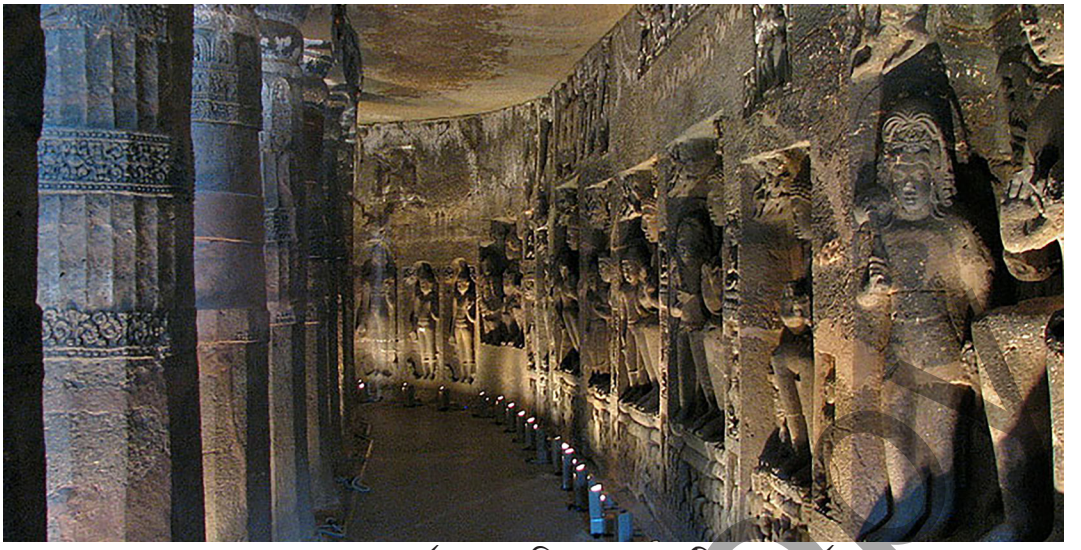

গুপ্ত আমলের গুহার ভাস্কর্য ও দেয়ালচিত্রের মধ্যে একটি গুহার ভাস্কর্য। পাথর কেটে গুহার মধ্যে এসব ভাস্কর্য খোদাই করা হয়েছে। সেই সময়ের শিল্পকর্ম ও প্রযুক্তির অসাধারণ উদাহরণ এগুলো।

নালন্দা মহাবিহার (বর্তমান ভারতের বিহারে অবস্থিত) একটি বৌদ্ধ কেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয় গুপ্ত যুগে।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

অজন্তার গুহাগুলোর ছবি। পাহাড়ের মধ্যে কেটে এই গুহাগুলো শিল্পী ও কারিগরেরা তৈরি করেছিলেন।

৬ষ্ঠ থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের পূর্বাংশ: আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল

প্রাচীন ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি পৃথক আঞ্চলিক সত্ত্বা রয়েছে। তোমরা সকলেই জানো যে, সর্বপূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আঞ্চলিক সত্ত্বাটির নাম 'বাংলা'। এই বাংলা অঞ্চলে আদি-মধ্যযুগে প্রায় চার শতক ধরে শাসন করেছে পাল বংশ। মোটামুটিভাবে ৮০০ থেকে ১৩০০ সাল পর্যন্ত সময়কে বাংলার আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে 'আদি মধ্যযুগ' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই যুগের পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমরা পরের শ্রেণিতে বিস্তারিত জানতে পারবে। ভারত উপমহাদেশে এই সময়কালে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি বিকশিত হচ্ছিল। বিভিন্ন জায়গায়ই ছোট ছোট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিচয়, ধর্মাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। এসব উপ-অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব ভারত তথা বাংলা অঞ্চলে আদিতে ছিল ছিল বঙ্গ, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি নামে কতগুলি ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক ইউনিট। বর্তমান বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাংলার এই ইউনিট বা জনপদগুলোর মধ্যেই প্রথম মানুষের সুনির্দিষ্ট পরিচয়, ধর্মাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। এই বাংলা অঞ্চলে আদি-মধ্যযুগে প্রায় চার শতক ধরে শাসন করেছে পাল বংশ। পালরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তৎকালীন সমাজে হিন্দুরা ছিলেন সংখ্যায় অধিক। আর এই হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে থাকতেন অভিজাত ব্রাহ্মণ। তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে নিজেদের শাসন সমুন্নত রাখতে বৌদ্ধ মতাবলম্বী পালরা ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূমি দান করতেন এবং রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিতেন। ভূমিদান সংক্রান্ত তাম্রশাসনগুলো এই বক্তব্যের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

Draft C

এ সময়ের সাহিত্য, ভাস্কর্য, পাহাড়পুর ও ময়নামতির মৃৎফলক থেকে দৈনন্দিন জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। মৌরালা মাছের তরকারি, নতুন সুগন্ধী চালের ভাত, নলিতা শাকের ঝোল ছিল তৎকালীন অভিজাত সমাজে প্রচলিত উৎকৃষ্ট খাদ্য। এছাড়া পাশা-দাবা খেলে, নাচ-গানে মানুষ অবকাশ যাপন করতো। রাজা, সামন্ত ও অভিজাত শ্রেণি ছিল শিকারে আসক্ত। সাধারণ মানুষেরা খাটো ধুতি এবং গায়ে চাদর পরতো। নারীরা শাড়ি।

পালদের পর ভারতের পূর্বাংশের নগর সমাজে বর্ণভিত্তিক কাঠামো চোখে পড়ে সেন শাসনের অধীনে। বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতি সহনশীল দেখা গেলেও সেনরা সমাজে গোঁড়া ধর্মমত স্থাপন করার প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা চালান। ভারতের পূর্বাঞ্চলের সর্বত্র এই চেষ্টা সফল হয় নি। সেনদের সময়ে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও বিকাশ নতুন এক মাত্রা পায়। প্রত্যেক রাজা বিশেষ করে লক্ষণ সেন তাদের রাজ দরবারে সংস্কৃত পন্ডিতদের ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারে সেন রাজারা নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের বেশ কয়েকটি পৃথক আঞ্চলিক সত্তা রয়েছে। তোমরা সকলেই জানো যে, সর্বপূর্বপ্রান্তে অবস্থিত আঞ্চলিক সত্তাটির নাম 'বাঙলা'। এই বাঙলা অঞ্চলে আদি-মধ্যযুগে প্রায় চার শতক ধরে শাসন করেছে পাল বংশ। প্রাচীনকালের শেষপর্বে এবং মধ্যযুগের সূচনার পূর্বে ৫০০/৬০০ বছরের একটি কালপর্বকে ইতিহাসে 'আদি মধ্যযুগ' হিসেবে গণ্য করা হয়। এই যুগের পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমরা পরের শ্রেণিতে বিস্তারিত জানতে পারবে।

ভারত উপমহাদেশে তখন বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি বিকশিত হচ্ছিল। রাজত্বের ভিত্তিতে এসব অঞ্চলকে বোঝার চেষ্টা অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হতে পারে। কারণ, সাধারণ অব্দ ৭ম-৮ম শতকের দিকেই বিভিন্ন জায়গায়ই ছোট ছোট অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিচয়, ধর্মাচার, আচার-আচরণ, সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে শুরু করে। এসব উপ-অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব ভারত তথা বাঙলা অঞ্চলে ছিল: বঙ্গ, পুন্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশ আর ভারতের পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অংশে এগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। উপ-অঞ্চলগুলোর কোনো কোনোটিতে একই শাসক থাকলেও মনে রেখো, শাসকের বা রাজার পরিবর্তন মানুষের জীবনযাপন, সমাজ ও পরিচয়ের উপরে একই রকম প্রভাব ফেলে না।

১৩ থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষঃ সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল

এই সময়ে ভারতীয় সমাজে নানান ধর্মমত, নানান ভাষা ও সংস্কৃতি এবং এগুলোর আঞ্চলিক রূপ বিদ্যমান ছিল। রাজনীতি ও সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করতেন তাদের মধ্যে নানান মত ও ধারার হিন্দু ও মুসলমান ছিলেন। তাঁদের নিজেদের মধ্যে ছিল নানান পার্থক্য। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানের হিন্দু এবং মুসলমানেরা ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধারণ করতেন। সুতরাং উভয় ধর্মই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে একাধিক ধারা এবং উপধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম এসময় ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে উপনীত হয়। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতের বাইরেও ভারতীয় সমাজে এমন অসংখ্য মানুষ ছিলেন যারা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের অনুসারী নন। তারা নানান স্থানীয়-লোকজ রীতি-নীতি প্রথা-পদ্ধতি পালনের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

এ সময় পেশা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তিতে মুসলিম জনগণ বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। তারা হলেন: সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাত শ্রেণি, উলেমা শ্রেণি এবং সর্বনিম্নে ছিলেন কারিগর, দোকানদার, দর্জি, কৃষক প্রভৃতি। শেষোক্ত শ্রেণির অধিকাংশই ছিলেন ধর্মান্তরিত মুসলমান।

Draft Copy

তুর্কী-আফগান শাসনকালে ভারতীয় সমাজের বৃহত্তম অংশ ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ আর লোকজ ধর্মাবলম্বী। তুর্কি আক্রমণের পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই ছিলেন শাসক সম্প্রদায়। ভূ-সম্পত্তির মালিক। তুর্কি আক্রমনের পরেও কৃষি জমির বৃহত্তর ভাগ ছিল তাদের অধীনে। ইলবারি তুর্কি শাসনে হিন্দুরা তেমন কোনো উচ্চ রাজপদ পেতেন না। কৃষি, বাণিজ্য ছিল তাদের পেশা।

অনুসন্ধানী কাজ: ১

চলো, আমরা আমাদের কাছাকাছি যেকোনো একটি কারিগর শ্রেণি যেমন – কামার, কুমার, স্থপতি, কর্মকার, মাঝি, চর্মকার, তাঁতি, চাষি এঁদের কাছে যাই। তাঁদের করা কাজ সম্পর্কে জানি এবং তাঁদের কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ছবি এঁকে বা লিখে একটা প্রতিবেদন তৈরি করি।

এখন যে কথাগুলো পড়তে যাচ্ছ, তা হয়তো পড়তে তোমাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু ভালো নিয়েই কাজ করে না, বরং মন্দকে জানার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়াও ইতিহাসের কাজ। তাই ইতিহাসের এই মন্দটুকুও তোমাদের জানতে হবে। ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত সুলতানি আমলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তোমরা হয়তো জানতে চাইতে পারো দাসপ্রথা কী? দাসপ্রথা হলো অমানবিক একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের কেনা-বেচা হতো। এই ব্যবস্থায় ধনীরা ব্যক্তিকে কিনে নিতো এবং ক্রীত ব্যক্তি তার সম্পত্তি হিসেবে যেকোনো কাজ করতে বাধ্য থাকতো। সুলতানি আমলেও এই দাসপ্রথার মাধ্যমে মানুষের কেনা-বেচা হতো। দাসগণ অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতো। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। সুলতানি আমল ও মোগল আমল শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যভাগে আইন করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

এবার চলো ভারতের বহুত্ববাদী এবং বৈচিত্র্যময় সমাজে মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং অন্যান্য কিছু বিষয় অনুসন্ধান করে দেখা যাক। এখানকার মানুষের খাদ্যাভাসে ছিল বৈচিত্র্য। একদল মানুষ ছিলেন নিরামিষভোজী, আবার অনেক মানুষ মাছ-মাংস খেতে ভালোবাসতেন। নগরে বসবাসকারী মানুষেরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিলাসী জীবন-যাপন করতেন। দরিদ্র লোকেরা গ্রামে মাটির ঘরে বসবাস করতেন। সমাজে যাদের সামর্থ ছিল তাদের সবাই তুলা, রেশম, পশমের পোশাক পরতেন। তারা সোনা, রূপার অলংকারও ব্যবহার করতেন।

আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে শিকার, কুস্তি, বিভিন্ন পশুর লড়াই, পোলো বা চৌঘান ছিল সকলের প্রিয়। এছাড়া হোলি, দেওয়ালী, ঈদ আর ফসল কাটার সময় ও পরের উৎসবে মানুষ আনন্দ করতো।

শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। গড়ে উঠেছিল ধর্মভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা। এক ধরণের পাঠশালায় সংস্কৃত সাহিত্য, স্মৃতিশাস্ত্র, বেদ, রামায়ণ, অংকশাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হতো। পক্ষান্তরে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রভৃতিতে শিক্ষা প্রদান করা হতো আরেক ধরণের। শাসকগণ শিক্ষার বিকাশকে তাদের ধর্মীয় আবশ্যিক কর্তব্য বলে মনে করতেন। শাসকদের পাশাপাশি অভিজাত অমাত্য, পীর-সুফি এবং অবস্থাসম্পন্ন লোকজন শিক্ষা-দীক্ষায় পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

Draft Copy

সুলতানি স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত ফিরোজ শাহ কোটলা

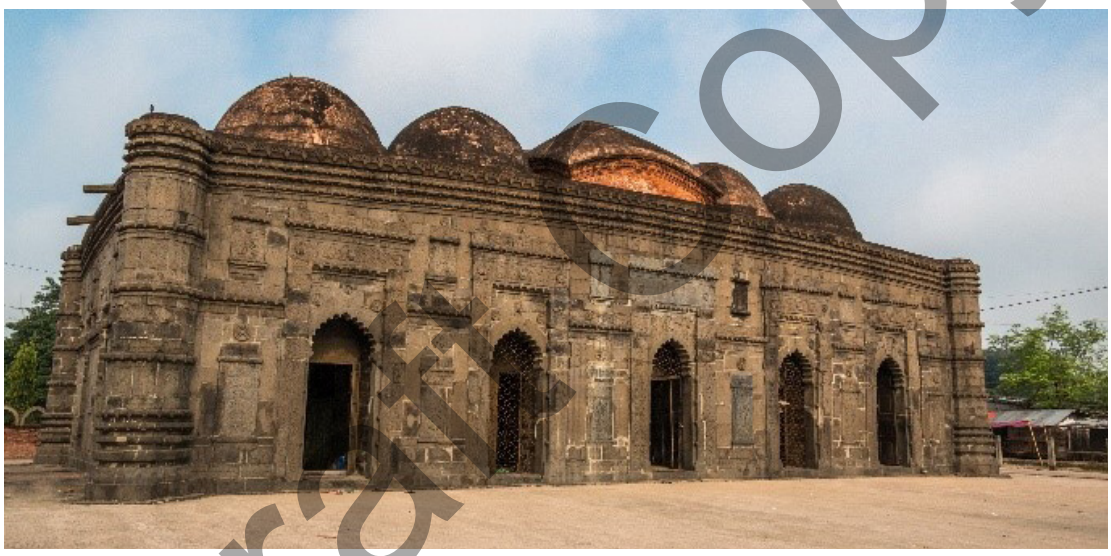

সুলতানি স্থাপত্য : গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ যা বর্তমানে চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।

ভারতবর্ষে এসময়ে নবাগত তুর্কি-আফগানদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা বহুমুখী সংস্কৃতি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির সাথে ভারতের বহুমুখী ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের সমন্বয় ঘটে। আলোচ্য কালপর্বে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্য এবং শিল্পকলায় প্রভূত পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হয়। বিশাল ভারতবর্ষের লোকসংস্কৃতি নির্ভর স্থাপত্যরীতি এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত ব্যবসায়ী, যোদ্ধা এবং অভিবাসীদের অভিজ্ঞতার স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নবতর এবং স্বতন্ত্র এক স্থাপত্যরীতি গড়ে উঠে। স্থাপত্য ধারায় নতুন নতুন ধারণা এবং প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটে। যেমন: প্রকৃত খিলান, গম্বুজ, মিনার, সমাধি স্থাপত্য, মেহরাব, আরবীয় নকশালঙ্কার প্রভৃতি। নবতর রীতির স্থাপত্যগুলো ছিল পূর্বের স্থাপত্যের তুলনায় পৃথক, বৃহৎ, পরিকল্পিত এবং সুগঠিত। এসময় সিরিয়া, বাইজান্টাইন, মিশর ও ইরানের স্থাপত্যরীতির সাথে ভারত উপমহাদেশের স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নতুন একটি ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। এই রীতিকে মডেল হিসেবে ধরে দিল্লির কুতুব মিনার, ফিরোজ শাহ কোটলা, তুঘলকাবাদ দুর্গ, গিয়াসুদ্দিন তুঘলকের সমাধি, ইলতুতমিশের সমাধি, পান্ডুয়ার আদিনা

Draft Copy

মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ ইত্যাদি স্থাপনা আজও সুলতানদের সময়ের সংমিশ্রিত স্থাপত্য হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

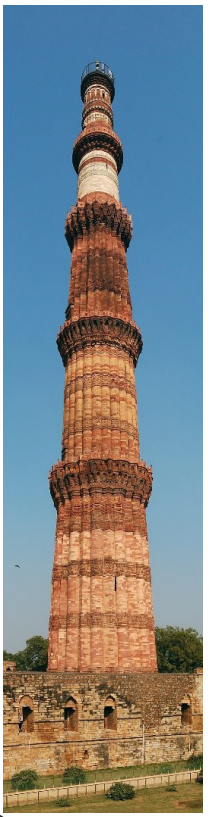

সুলতানি আমলের স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত ইট দিয়ে নির্মিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মিনার 'কুতুব মিনার'।

সুলতানি স্থাপত্য : তুঘলকাবাদ দুর্গ

সুলতানি স্থাপত্য : বাঘা শাহী মসজিদ, রাজশাহী

অনুশীলনী :২

চলো, ১৩ থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল সম্পর্কে অনুসন্ধানমূলক একটি প্রতিবেদন রচনা করি। প্রতিবেদনটিতে প্রয়োজন মতো ছবি আঁকি এবং নিজের কাছে যে তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় তা বক্সের মধ্যে পৃথক করে লিখি। প্রতিবেদনটি শিক্ষক সহ ক্লাসের সকলকে দেখাই এবং নিজের কাছে যত্ন করে সংরক্ষণ করি।

Draft Copy

১৬ থেকে ১৯ শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষঃ সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরাম বদল

ইতিহাসের এই পর্বে মুগল এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষ পরিচালিত হয়। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান থেকে আগত মুগল শাসকদের সময়ে ভারতের সমাজ নানান সম্প্রদায় এবং নানান শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণির জীবনযাত্রা ছিল বিলাসবহুল এবং আড়ম্বরপূর্ণ। সাধারণ পেশাজীবী মানুষ আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপার্জিত টাকায় অভিজাত শ্রেণি আরাম-আয়েশ করতেন। সম্পদ আর ক্ষমতা নিজেদের কুক্ষিগত করতেন। সাধারণ মানুষের ভালো-মন্দ কিংবা টিকে থাকার দিকে তাদের কোনো নজর ছিল না বললেই চলে। কৃষক, জেলে, কামার, কুমার, কারিগর, মজুর, দোকানদার সহ সাধারণ মানুষের জীবন ছিল নানান প্রতিকূলতা জয় করে নিজেদের যোগ্যতায় টিকে থাকার জীবন। এদের অনেকেই হয়তো দিনে মাত্র একবার খাবার জোগাড় করতে পারতো। পোশাক, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির অবস্থা ছিল একই রকম। শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা একেবারেই পিছিয়ে ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে সাধারণ পরিবারের নারীদের কোনো সুযোগ ছিল না।

১৬ থেকে ১৯ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের পূর্বাংশ অর্থাৎ বাংলা অঞ্চলে নানান দেব-দেবতার উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিল শিখরযুক্ত মন্দির, পিরামিডাকৃতির মন্দির, জোড় বাংলা মন্দির, চালা মন্দির, রত্ন মন্দির, বাংলার কুড়ে ঘর রীতির মন্দির ইত্যাদি। এছাড়া হাজার বছরের কালপরম্পরায় মন্দির ও মন্দিরে পোড়া মাটির অলঙ্করণ, বিশেষ করে কান্তজীর মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে প্রতিফলিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন উল্লেখযোগ্য। গির্জা স্থাপত্য, দূর্গ স্থাপত্য এবং চিত্রকলা ভারতবর্ষ তথা বাঙলা অঞ্চলে মানুষের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় বহন করে।

১৮ শতকের মাঝামাঝিতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সময় হতে ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাসে আরো অনেকগুলো পরিবর্তন সূচিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের মধ্যদিয়ে কোম্পানির বাংলায় কর্তৃত্ব স্থাপন এবং পরবর্তীকালে সমগ্র ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য স্থাপন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সমাজনীতিতে এমন সব পরিবর্তন বয়ে আনে যা ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতির রাজনৈতিক প্রভাব আর প্রতিক্রিয়াগুলো তোমরা ৯ম শ্রেণিতে অনুসন্ধান করবে।

এ সময়ে কোম্পানি সরকার তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ কায়েমের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার বিকাশ ঘটায়। শিক্ষিত সমাজে নবতর চিন্তা-ভাবনা গড়ে উঠতে শুরু করে। মিশনারিগুলো খ্রিষ্টান ধর্ম বিকাশের জন্য তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। তারা নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ও অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তার ঘটায় এবং ভারত থেকে কীভাবে আরো সম্পদ ও সুবিধা ভোগ দখল করতে পারে তার জন্য স্থানীয় অনুগত শ্রেণি গড়ে তোলার কাজে হাত দেয়। সমাজ-সংস্কৃতিতে এসবের প্রভাব প্রতিক্রিয়া পড়তে শুরু করে।

১৩ থেকে শুরু করে ১৮ শতক পর্যন্ত হিন্দুদের একাংশের সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোরভাবে বিদ্যমান ছিল। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে বর্ণভেদ প্রথা কী? হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ৪ ধরনের বর্ণ প্রচলিত ছিল। এগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সবার উপরে। তারা পূজা-অর্চণা করতেন। ক্ষত্রীয়রা ছিলেন যোদ্ধা। বৈশ্যগণ কৃষিকাজ ও ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আর সমাজের সবচেয়ে নিচের অংশে অবস্থান করতেন শুদ্ররা। তারা কামার, কুমার, মুটে, দিনমজুর, মেথর ইত্যাদি শোয় নিয়োজিত ছিলেন। হিন্দু সমাজের বাকিদের কাছে শূদ্ররা ছিল অত্যন্ত নীচ। তারা সবার থেকে আলাদা

Draft Copy

থাকতেন। তাদের সাথে কেউ মিশতো না। তৎকালীন হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা চালু ছিল।

অবশ্য তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদের কথা জেনেছ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের কথাও তোমরা জানো। তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যেও নানান বিষয়ে নানান সময়ে নানান সংস্কার আন্দোলন ও সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাভাবনা বিকাশের প্রভাবেই মূলত ভারতের বহুত্ববাদী সমাজে নানান মত ও পথের সংস্কারমূলক আন্দোলন ও সংগ্রামগুলো পরিচালিত হয়েছে। রাজা রামমোহন রায়, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী শরীয়তউল্লাহ, দুদু মিয়া, তিতুমীর প্রমুখ ভারতের সমাজে নানান সংস্কারমূলক আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির রূপান্তরে তাদের প্রতিটি কাজ বিপুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সকল বিষয়ে তোমরা আরো বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে ৯ম এবং ১০ম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে।

অনুশীলনী : ২

আমরা তো দেখলাম দক্ষিণ এশিয়া বা প্রাচীন ভারতবর্ষের সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাসের কিছু খন্ড চিত্র। এই ইতিহাসে সমাজ ও সংস্কৃতির নানান বৈচিত্র্য আর পার্থক্যের অনেক কিছু নিশ্চয়ই তোমরা অনুসন্ধান করে খুঁজে পেয়েছো। এই অধ্যায়ের পাঠ অনুসন্ধান করে এমন কতোগুলো বৈচিত্র্য আর পার্থক্য চিহ্নিত করো।

Draft Copy

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধু: মানবতা ও মানুষের মুক্তির প্রতি অঙ্গীকার

বাংলা অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস কত হাজার বছরের পুরনো? নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের? আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগেও যে বাংলা অঞ্চলে মানুষের বিচরণ ছিল তা আমরা ইতিহাসের অন্যান্য অধ্যায়গুলো পাঠ করে ইতোমধ্যেই জানতে পেরেছি। আদিকালে বাংলা অঞ্চলে নানান স্থানের নানান রকমের মানুষ একের পর এক বসতি স্থাপন করেছে। বাংলার বিশেষ ভূ-প্রকৃতি তাদেরকে দিয়েছে নানান সুবিধা-অসুবিধা আর টিকে থাকার পথে নানান রকমের প্রতিবন্ধকতা। বাংলায় মানুষের টিকে থাকার ইতিহাস তাই একদল মানুষের নিজস্ব প্রাণশক্তির ইতিহাস। দ্বন্দ্ব-সংঘাত আর সমন্বয়ের বৈচিত্র্যে সাজানো ইতিহাস। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার পাশাপাশি বাংলা অঞ্চলের মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় আরও একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত নানান রাজশক্তির আগমন এবং নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের সুদীর্ঘ কাল পরিক্রমায় দূরের-ভূখন্ড থেকে আগত শাসক, যোদ্ধা এবং সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারী গোষ্ঠী বাংলার মানুষকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে। ক্ষমতা দখল করেছে। শোষণ ও নির্যাতন করেছে। সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন সময়ে এই শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ এবং বিদ্রোহ করেছে। মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে। কখনও আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এবং পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর হাত থেকে ১৯৭১ সালে আসে মুক্তি, আসে স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী একজন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বাঙলা অঞ্চলের ইতিহাসে তাঁর মতো আর কোনো নেতাকে আমরা পাইনি যিনি বাংলার মাটি-পানি-কাদা আর ঝড় বৃষ্টির পরিবেশ থেকে উঠে এসে সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই ভূ-খন্ডের এক অতি সাধারণ পরিবার থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন। আমৃত্যু তিনি সাধারণ মানুষের জন্যই কাজ করে গেছেন।

সম্পদ ও ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ মানুষের প্রথম প্রতিবাদের ইতিহাস রচিত হয়েছিল একাদশ শতকে। পাল বংশের রাজা দ্বিতীয় মহীপালের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন দিব্য। এই দিব্য ছিলেন কৈবর্ত বা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধি। একইসঙ্গে তিনি ক্ষমতাবান একজন সামন্ত রাজা হিসেবেও নিজের অবস্থান তৈরি করেছিলেন। দিব্য, ভিম কিংবা রুদক পাল রাজাদের শাসনে অল্প সময়ের জন্য আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু সর্বশেষ শক্তিশালী পাল রাজা রামপালের কাছে পরাজিতও হয়েছিলেন। মুগল শাসনকালে সুবাদারদের শাসনাধীন বাংলায় বহু কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। সুবাদারদের কর্মচারিদের অত্যাচারে তখন কৃষক ও প্রান্তিক চাষিদের খুবই দুরবস্থা। বিভিন্ন কৃষক লবনচাষি ও দরিদ্র দিনমজুরেরা বিদ্রোহ করেছিল। এমন বিদ্রোহের একজন নেতা ছিলেন শমসের গাজী। অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদ মাঝে মাঝেই বাঙলা অঞ্চলে দেখা দিয়েছে। বাংলা অঞ্চলের সাধারণ মানুষের এইরূপ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং শাসক শ্রেণির অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে লড়াই তীব্র রূপ ধারণ করে ব্রিটিশ শাসনামলে। ব্রিটিশ শাসকরা বাংলা থেকে বিপুল পরিমাণে সম্পদ লুট করে নেয়ার জন্যে এমনকিছু নীতি গ্রহণ করেছিল যার অনিবার্য পরিণতিতে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, কারিগরসহ সকল সাধারণ পেশাজীবী মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল। এর ফলে ব্রিটিশ শাসক ও তাদের অনুগত জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে মানুষ সশস্ত্র প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িত হতে থাকে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, টঙ্ক আন্দোলন সহ নানান প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন এইসময় সংঘটিত হয়।

Draft Copy

অনুসন্ধানী কাজ: ১

বাংলা অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এই অভ্যাস বাংলার ভৌগোলিক বাস্তবতার সাথেও সম্পৃক্ত। জল-জঙ্গল-কাদা, ঝড়-তুফান, বন্যা, হিংস্র পশু ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের সাথে মানুষের বসবাস ছিল এখানে। বাংলার ভূপ্রকৃতি একদিকে মানুষকে অফুরান খাদ্যের যোগান দিয়েছে, অন্যদিকে নানান প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে বেঁচে থাকার কৌশল শিখিয়েছে।"

উপরের এই লেখা পাঠ করে চলো, এর পক্ষে বা বিপক্ষে মুক্তমনে ভাবি এবং নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপন করি:

Draft Copy

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার নামে এই সময় ভারত ভাগ করে তৈরি করা হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে পৃথক দুটি রাষ্ট্র। একই কারণ দেখিয়ে বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের একটি অংশকেও যুক্ত করা হয় দুই হাজার দুইশত কিলোমিটার দূরবর্তী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলার দুই অংশের মধ্যেই নানান ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মানুষের বসতি ছিল। একইসঙ্গে ছিল একই ধর্মের নানান তরিকার মানুষের বসতি। এই বৈচিত্র্য আর বহুত্বের বাস্তবতার মধ্যেই দেশভাগ করে হিন্দু আর মুসলমানের নামে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করা হয়। বাংলা অঞ্চলের পূর্ব অংশের (পূর্ব বাংলার) মানুষ পাকিস্তান শাসন কাঠামোর অধীনে নতুন এক শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলা অঞ্চলের পূর্বাংশের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সকল সুবিধা নিজেদের দখলে নেয়। বাংলার পূর্বাংশের মানুষের সঙ্গে প্রভূর মতো আচরণে লিপ্ত হয়। এর ফলে পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার

মানুষের মনে চরম বিক্ষোভ তৈরি হয়। ১৯৪৮ সালের পর থেকেই শুরু হয় ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের মুক্ত করার লড়াই। আর বাংলার মানুষের এই লড়াই ও সংগ্রামে যিনি অগ্রভাগে থেকে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন তিনি হলেন তাদের আপনজন শেখ মুজিব, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ অত্যাচারী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এইজন্যেই ১৬ ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। এই বিজয় ক্ষমতালোভী উচ্চাভিলাষী শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিজয়। খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষক, কারিগর সহ বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষের বিজয়। এই বিজয়ের পথ সহজ ছিল না। এর পেছনে রয়েছে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের এক দীর্ঘ ইতিহাস। বাংলার জল-কাদা-পলিমাটি থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মানবিকতা, সাহস আর আত্মত্যাগের ইতিহাস।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাসা থেকে জনতার উদ্দেশে হাত নেড়ে ভালোবাসা জানাচ্ছেন। পেছনে তাঁর কন্যা, বর্তমান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা। ছবির সময়কাল: ২৩ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিব জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ শাসিত 'ব্রিটিশ ভারত' উপনিবেশের পূর্ব-প্রান্তে বাংলা নামক একটি প্রদেশের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) পূর্ব অংশে তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুংগিপাড়ায়। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, বর্তমানে গোপালগঞ্জ পৃথক একটি জেলা হিসেবে বিদ্যমান। দিনটা ছিল ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। বঙ্গবন্ধুর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ব্রিটিশ ভারতের বিশেষ এক রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসকদের বিতাড়িত করে মুক্তি লাভের জন্যে ভারতের চারিদিকে তখন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। মাত্র ষোল বছর বয়সেই শেখ মুজিবের ভেতর এই চেতনা জাগ্রত হয় যে, স্বাধীনতা আনতে হবে। এই দেশে ইংরেজদের থাকার কোন অধিকার নেই। বঙ্গবন্ধু তখন নিয়মিত স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী নেতাদের কাছ থেকে বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শুনতেন। স্বদেশী

Draft Copy

আন্দোলন হলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যা ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ৯ম আর ১০ম শ্রেণিতে এ বিষয়ে তোমরা বিস্তারিত পরিসরে জানতে পারবে।

ভাষা, ধর্ম, সম্প্রদায় কিংবা রাজনৈতিক পরিচয়ের উর্ধ্বে মানুষের প্রতি ছিল বঙ্গবন্ধুর দরদ। ১৯৪৭ সালের আগে বিভিন্ন দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা এবং মহামারীর সময় শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ সহ সকলের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঙ্গার সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষ পরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে ভাষা-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের পাশে দাড়িয়েছেন। দাঙ্গায় উগ্রবাদী হিন্দুদের থেকে সাধারণ মুসলমানদের এবং উগ্রবাদী মুসলমানদের হাত থেকে সাধারণ হিন্দুদেরকে রক্ষা করেছেন। ১৯৪৭ সালে তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে শেখ মুজিব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়টের বিরুদ্ধে কোলকাতায় মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদকে সমর্থন করেন।

কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ সভায় তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান (পেছনে দাঁড়ানো) এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (১৯৪৭)।

তোমরা নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে, ভাষা আন্দোলন দুই দফায় সংঘটিত হয়েছে। প্রথমবার ১৯৪৮ এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫২ সালে। ১৯৪৮ সালেই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তানের ক্ষমতালোভী তথাকথিত অভিজাত শাসকেরা বাংলার পূর্ব অংশের মানুষের উপর নতুন করে শোষণের এক জাল বিস্তারের নীল নকশা আঁকতে শুরু করেছেন। শেখ মুজিব বুঝতে পারেন, পাকিস্তান নামের নতুন এই কাঠামো কেবলই শোষণ-বঞ্চনা ও বৈষম্যের এক রাজনৈতিক খোলস বদল মাত্র। তিনি পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে নতুন করে আবারও বিক্ষোভ-সংগ্রামে লিপ্ত হন।

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পরপরই পূর্ব বাংলার মানুষের উপর প্রথম আঘাত আসে ভাষার প্রশ্নে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় উর্দু ভাষাভাষী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার উদ্যোগ নেন। পূর্ব বাংলার সচেতন রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এবং সভা-সমাবেশ শুরু করেন। শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এই আন্দোলন তীব্র রূপ লাভ করে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ। "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে এইদিন ঢাকা শহর মুখর হয়ে উঠে। সারাদেশের প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল এবং ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব বাংলার সাধারণ শিক্ষার্থী, সচেতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ মানুষের পদচারণায় আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছায়। পাকিস্তানি শাসকেরা এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করে দিতে পুলিশী নির্যাতনের পথ বেছে নেন। মিছিল ও ধর্মঘটে অবস্থান নেওয়া শিক্ষার্থী-জনতার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। শেখ মুজিব, অলি আহাদ, শামসুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা সহ অনেককেই সমাবেশ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়।

১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবির পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয় এবং কারাগারে বন্দী করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পল্টন ময়দানের এক জনসমাবেশে "উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা" বলে আবারও ঘোষণা দেন। এর ফলে ভাষার দাবিতে পূর্ব বাংলার মানুষের মধ্যে চলমান বিক্ষোভ আন্দোলন আবারও তীব্র রূপ ধারণ করে। জেলে বসেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষার দাবিতে চলমান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করতেন। ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু অনশন শুরু করেন। মৃত্যু অবধি না ভাঙার শপথ নিয়ে শুরু করা এই অনশন ১১ দিন ধরে অব্যাহত থাকলে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৭ তারিখে জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের আহবান করে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল নিয়ে বের হলে পুলিশ তাতে নির্বিচারে গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, শফিউর সহ আরো অনেকে। জেল থেকে পাঠানো এক বিবৃতিতে বঙবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা শহীদদের প্রতি শোক জানান এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

Draft Copy

ভাষা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত ভোরের র‍্যালিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং তাজউদ্দীন আহমেদ। ছবির সময়কাল: ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা "অসমাপ্ত আত্মজীবনী", "কারাগারের রোজনামচা", এবং "আমার দেখা নয়াচীন"- এই গ্রন্থগুলো পাঠ করলে বিক্ষোভ, সংগ্রাম, মিছিল ও প্রতিবাদে মুখর উত্তাল এই দিনগুলির চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আত্মিক সম্পর্ক, পাকিস্তানের শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়ন থেকে বাংলার মেহনতী কৃষক, শ্রমিকসহ প্রতিটা মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান এবং সেই লক্ষ্যে সমস্ত দেশব্যাপী ঘুরে ঘুরে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বঙ্গবন্ধু শুনেছেন। শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলায় তাঁকে বারবার জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়েছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সময়কালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে অসংখ্যবার গ্রেফতার করা হয়েছে। মিথ্যে মামলায় বছরের পর বছর কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তাঁকে দমানো যায়নি। কেননা, বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসক ও শোষকদের সবরকম অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে ততোদিনে প্রতিবাদ করতে শিখে গেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে তারা সংগঠিত হতে শুরু করেছে। ক্রমে ক্রমে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন বাংলার মুক্তিকামী মানুষের পরম আস্থা এবং নির্ভরতার প্রতীক।

Draft Copy

কারামুক্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে সাথে নিয়ে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী বক্তব্য রাখছেন শেখ মুজিবুর রহমান (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২) ।

১৯৫৩ সালে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজাম ইসলাম প্রভৃতি সমমনা কিছু দল ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি ছিল ২১ দফা কর্মসূচির উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে। শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসন থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৫ মে নতুন প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুক্তফ্রন্টের সাফল্য কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার সুনজরে দেখেনি। মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যেই যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেয়। শেখ মিজিবুর রহমানকে আবারও গ্রেফতার করা হয় এবং সে বছর ডিসেম্বরের ২৩ তারিখ পর্যন্ত তাকে জেলে আটকে রাখা হয়।

সেই কিশোর বয়স থেকেই আমরা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে মানবতার গুণাবলি প্রকাশ পেতে দেখেছি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তি চাইতেন তিনি। পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করে দলের নাম রাখা হয় মুসলিম লীগ। ১৯৫৬ সালে খান আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু এই দায়িত্বেও বেশিদিন থাকেন নি। বাঙালির মুক্তির সংগ্রামকে আরও বেশি সুসংহত ও জোরদার করার লক্ষ্যে মন্ত্রীসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে সংসদীয় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান আইয়ুব খান গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়। এই সময়

Draft Copy

শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এইসব উচ্চাভিলাষী শাসকদের পথের কাঁটা। শোষণমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য তিনি কাজ করছিলেন। তাঁকে দমন করার জন্যে পাকিস্তান সরকার একের পর এক মিথ্যে মামলা দিয়ে হয়রানি করতে থাকে। টানা ১৪ মাস জেলে বন্দী রেখে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়, আবার সেই জেল গেট থেকেই গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই পাকিস্তানের জান্তা সরকার এইভাবে নানান মিথ্যে মামলায় শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে জেলে আটকে রাখে। মুক্ত হবার পর শেখ মুজিব আবারও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। বাংলার আপামর মানুষকে নিয়ে মুক্তির লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের লাহোরে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি নামে একটি প্রস্তাবনা পেশ করেন। প্রস্তাবিত এই ৬ দফা ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। মানুষের জন্য মুক্তির বার্তা। ৬ দফার পক্ষে সমগ্র দেশজুড়ে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব বাংলার নদী আর কাদামাটির পথে ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলতে শুরু করেন। গণসংযোগ করেন। মানুষের এই ব্যাপক সমর্থন পাকিস্তানি শাসকদের অস্তিত্বের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। ১৯৬৬ সালেই সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ঢাকায় গণ সংযোগ চলাকালে বঙ্গবন্ধুকে বেশ কয়েকবার গ্রেফতার করা হয়। নারায়ণগঞ্জে পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধুকে আবার গ্রেফতার করা হলে বাংলার সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সাথে আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। এই ধর্মঘটের মধ্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালায়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। এইসব হত্যা এবং দমননীতি দিয়েও বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে আটকে রাখা যায়নি।

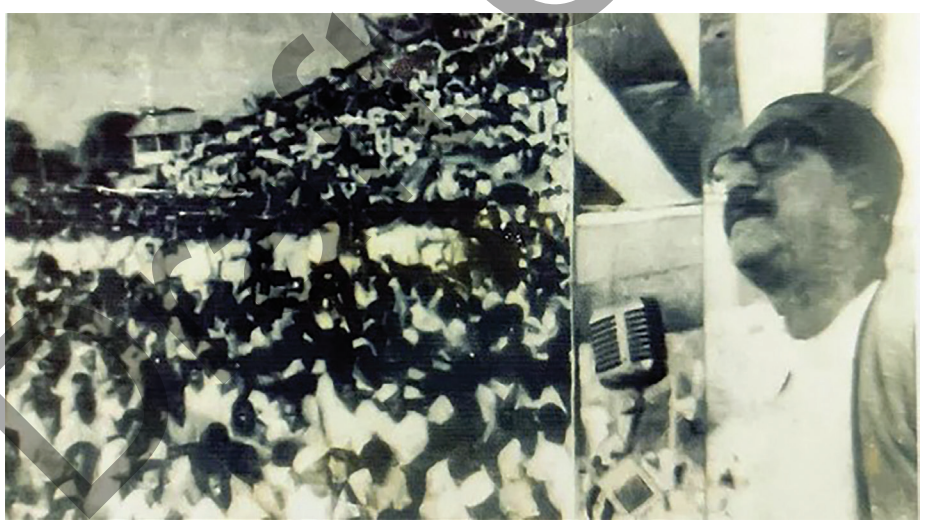

Draft Copy

১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গাবন্ধু চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে ৬ দফা কর্মসূচির সমর্থনে বক্তৃতা করছেন

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার বঙ্গাবন্ধুকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ জন বাঙালি সেনা ও সিএসপি অফিসারের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ এনে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। বঙ্গাবন্ধু এই অভিযোগে আবারও গ্রেফতার হন। মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গাবন্ধুর মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী শিক্ষার্থী আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, কামার-কুমার সহ আপামর জনতা

যোগ দেয়। দেশজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে উঠে। জনগণের এই চাপের মুখে পাকিস্তানি শাসকেরা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বঙ্গবন্ধু সহ অন্যান্য সকল আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষ্যে ১৯৬৯ সালে ২৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা সভাতেই কয়েক লক্ষ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

চিত্র: ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় লাখো মানুষের উপস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করা হয়।

১৯৬৯ সালেই ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'। তিনি বলেন-

> এক সময় এদেশের বুক হতে, মানচিত্রের পৃষ্ঠা হতে 'বাংলা' কথাটির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। .... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোন কিছুর নামের সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ...জনগণের পক্ষ থেকে আমি ঘোষণা করছি, আজ থেকে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' এর পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ'।

এভাবেই 'বাংলাদেশ' আমাদের হলো। সাধারণ মানুষের মুক্তির চিন্তায় নিবেদিতপ্রাণ একজন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ নামে একটি দেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস তৈরি হলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। পাকিস্তানের উচ্চাভিলাষী-ক্ষমতালোভী শাসকগোষ্ঠী বাংলার মানুষের এই রায় দেখে বিচলিত হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্যে তারা নানান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বাংলার মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের এই ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার প্রতিবাদে দেশজুড়ে হরতাল, সমাবেশ এবং বিক্ষোভ মিছিল শুরু করে। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন, পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে এতো সহজে বাংলার মানুষের মুক্তি মিলবে না।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের (বর্তমান নাম সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের মুক্তির দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। শোষণ মুক্তি এবং অধিকার আদায়ের

Draft Copy

লক্ষ্যে তিনি প্রকারান্তরে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে পাকিস্তানি শাসকদের বিতাড়িত করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের ঘোষণা দেন। রেসকোর্স ময়দানে সমবেত লাখো মানুষের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।" বাংলার মানুষকে মুক্ত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।"

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'- রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিকামী লাখো মানুষের মহাসমুদ্রে এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিলেন স্বাধীনতার ডাক (৭ মার্চ, ১৯৭১)। ১৯ মিনিটের এই ভাষণকে ইউনেস্কো বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দিয়েছে।

পাকিস্তানের স্বৈর-শাসক ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একদিকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ, অন্যদিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ। বাংলার মানুষ ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ প্রত্যাখান করে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অফিস, আদালত, ব্যাংক, বীমা, স্কুল-কলেজ, গাড়ি, শিল্প কারখানা চালাতে শুরু করে। এর ফলে ইয়াহিয়া খানের শাসনব্যবস্থা ধ্বসে যায়। পাকিস্তান সরকার ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বাংলার নিরীহ মানুষের উপর মরণাস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসের নির্মমতম ও বর্বর গণহত্যা চালায়। তারা আক্রমণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা রাইফেল সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টা এ আক্রমণ করে।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহর ১২টা ২০ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ওয়্যারলেস, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

Draft Copy

বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপঃ

"এটাই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ, তোমরা যেখানেই আছ এবং যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শেষ পর্যন্ত দখলদার সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর শেষ সৈনিকটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে।"
-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী (প্রকাশ সাল ২০১২, পৃষ্ঠা-২৯৯)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের যুদ্ধে আহত একজন মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে কথা বলছেন।
স্থান: ঢাকা মেডিকেল কলেজ। ছবির সময়কাল: ১৯৭২

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণা শুনে দেশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর সেনানিবাসের বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে নিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। রাত ১টা ৩০মিনিটে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তিনদিন পর বন্দী অবস্থায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানের লয়ালপুর জেলখানায়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের আঁধারে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙ্গালি জনগণের উপর যে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুরু করলেও মুক্তির চেতনা থেকে তাদের সরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষ সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। গণপরিষদ কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি এবং

Draft Copy

তাজউদ্দীন আহমেদ প্রাধনমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এপ্রিলের ১৭ তারিখ এই সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করে।

দীর্ঘ নয়মাস ধরে একদিকে পাকিস্তানি হায়নাদের অত্যাচার, নির্যাতন, দমন-পীড়ন, অন্যদিকে বাংলার মানুষের মুক্তির সংগ্রাম চলতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যরা নয় মাসে প্রায় ত্রিশ লাখ নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে, হাজার হাজার মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে, বাংলার অসংখ্য ঘর-বাড়ি আর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। বাংলার মুক্তিকামী জনতাকে এতো কিছু করেও তারা দমিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার প্রায় প্রতিটা গ্রাম আর ঘর থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক, জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং পাকিস্তানের শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করে মুক্তি আর বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দখলদার পাকিস্তানি সেনাদের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

অনুশীলনী : ২

প্রতিবেদন লিখি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে বাংলার মেহনতী মানুষ, সাধারণ কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-জনতার অধিকার আদায়ের দাবি মিলেমিশে একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। আর সেই লক্ষ্যই পূরণ হয় ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে। উপরের পাঠের আলোকে চলো এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লিখি। প্রতিবেদনে নিচের বাক্যটির সত্যতা অনুসন্ধান করি-

“বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে নানান ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্যে দিয়ে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন তার মূল কথা হচ্ছে মানবতা ও মানুষের মুক্তি।”

যুদ্ধের সময় এবং পরাজয়ের পরেও পাকিস্তান সরকার মিথ্যে মামলায় সাজা দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদদের চাপের কারণে তা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে তারা মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন। ১২ জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষের নানান প্রত্যাশা আর মতভিন্নতার মধ্যেই দেশ গড়ার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

তুমি কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কাকে বলে এখন চিন্তা করে বলতে পারবে? তোমার বন্ধুর সাথে, পরিবারের সদস্যদের সাথে, শিক্ষকের সাথে এটা নিয়ে কথা বলো। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, মুক্তিযুদ্ধ আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিয়ে অনুসন্ধানের মাধ্যমে যেটুকু তথ্য

Draft Copy

হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছো তাঁর আলোকে চলো মুক্তমনে বিষয়টা নিয়ে ভাবি। ৯ম আর ১০ম শ্রেণিতে তোমাদের জন্য আরো বিস্তারিত পরিসরে এই ইতিহাস অপেক্ষা করছে। তবে এ পর্যন্ত আমরা যতোটুকু শিখলাম সেখানে বাঙলা অঞ্চলে হাজার বছরের ইতিহাসে একদল মানুষের টিকে থাকা এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামী অভিজ্ঞতাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বহু দূরের ভূ-খণ্ড থেকে বিভিন্ন সময়ে নাম-যশ-খ্যাতি বিস্তার এবং ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের মতলবে সুবিধাবাদী কিছু অভিজাত বারবার নানান উপায়ে সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সেই মানুষের মুক্তি এবং নিজের মতো করে বাঁচা ও জীবন গঠনের স্বাধীনতাই হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

আমার ভাষা, সমাজ, সংস্কৃতি আর জীবন-যাপনের স্বাধীনতা, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে-মিশে আনন্দে বেঁচে থাকার অধিকার, নিজের দেশ নিজে গড়ে তোলার স্বাধীনতা আর সর্বপ্রকার অর্থে মুক্তির নিশ্চয়তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই চেতনায় আমরা বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। বঙ্গবন্ধু নিজে এই চেতনায় বাংলাদেশ গড়ে তোলার উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন। স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা মাঠে-খামারে কৃষকের সাথে কাজ করতে শুরু করেছিল। কলে-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিল। গ্রামের পর গ্রাম নিরক্ষরতা দূর করতে দিন-রাত শিক্ষার্থীরা কাজ করেছে। এইভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামে, শহরে, পাড়ায়, মহল্লায়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য অধ্যাপক আনিসুর রহমান বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে মানুষের কল্যাণে নিজ হাতে স্বদেশ গড়ে তোলার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। এরকম অসংখ্য উদ্যোগের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর "যে আগুন জ্বলেছিল" (মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ) গ্রন্থে।

যাহোক, বাংলায় মানুষের উপর হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শাসক এবং সবশেষে পাকিস্তানি শাসকদের নির্মম অত্যাচার, নির্যাতন আর শোষণের কথা তোমাদের সকলের এখন জানা। বাংলার সাধারণ মানুষ কীভাবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে একটি দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতালিপ্সু শাসকদের বিতাড়িত করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে তারও কিছু কিছু তোমরা অনুসন্ধান করে, অনুধাবন করেছো। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ঠিক একইভাবে অত্যাচারী ও ক্ষমতালোভী রাজা, যোদ্ধা ও শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলিভিয়া, কলম্বিয়া, তিউনিসিয়া, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকার নাম বলতে পারি। আবার অনেক দেশ রয়েছে যেখানে এখনও মানুষ নিজের ভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে নানান জায়গায় যুগে যুগে নানান রাজশক্তির উদয় হয়েছে। অর্থ ও ক্ষমতালোভী যোদ্ধা এবং রাজাগণ নিজেদের স্বার্থের লোভে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। তবে ইতিহাস পাঠ থেকে তোমাদের এই উপলব্ধি হবে যে, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে, মানুষকে শোষণ করে তৈরি করা ক্ষমতার প্রাসাদ এক সময় সাধারণ মানুষের আন্দোলন সংগ্রামের ফলেই ভেঙে যেতে বাধ্য।

আর একটা তথ্য তোমাদেরকে জানাই। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজেরি অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'পৃথিবী আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে শোষক শ্রেণি আরেক ভাগে শোষিত। আমি শোষিতের দলে।'

Draft Copy

ভিয়েতনাম যুদ্ধ

ভিয়েতনাম হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। প্রশান্ত মহাসাগরের সুনীল জলধারার তীর ঘেঁষে অবস্থিত সবুজ-শ্যামল এই দেশটি। বাংলাদেশের মতোই ভিয়েতনামের মানুষদের রয়েছে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। দীর্ঘ কয়েক দশকের সংগ্রাম আর নানান ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে ক্ষমতালোভী শাসকদের বিতারিত করে স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষের দিকে ভিয়েনাম ছিল ফ্রান্সের দখলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকে ফ্রান্সের পাশাপাশি ভিয়েতনামে জাপানের আধিপত্যও শুরু হয়। ফ্রান্স এবং জাপান- এই দুইটি দেশে ভিয়েতনামের উপর নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠা করে। এই দুইটি দেশ ভিয়েতনামকে ভাগাভাগি করে শাসন শুরু করে।

ঔপনিবেশিক এই শাসকদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্যে হো চি মিন নামক ভিয়েতনামের একজন বিপ্লবী নেতা একটি স্বাধীনতা সংঘ গঠন করেন। এই সংঘের নাম দেওয়া হয় 'ভিয়েত মিন'। এই সংগঠনের যোগদান করে ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের জাপানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। ১৯৪৩ সালের দিকে এই যুদ্ধ শুরু করে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান দুর্বল হতে শুরু করে। ১৯৪৫ সালে হো চি মিন ভিয়েতনামের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মুক্তিকামী মানুষেরা ভিয়েতনামের বিভিন্ন অংশ বিদেশী শাসকদের দখল থেকে মুক্ত করে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসতে শুরু করেন। কিন্তু এই মুক্তির পথে আবারও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ফরাসি শক্তি। ফ্রান্সের সৈন্যরা ভিয়েতনামের দক্ষিণ ভাগ দখল করে নিজেদের মনোনীত শাসককে ক্ষমতায় বসায়। ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে ফরাসিদের আধিপত্য আবারও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ১৯৫৪ সালে ভিয়েত মিন সংঘের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে চূড়ান্ত আঘাত এবং ফরাসি শক্তিকে পরাজিত করে। কিন্তু এইখানেই এই যুদ্ধের অবসান ঘটেনি। ১৯৫৪ সালে এক চুক্তির মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামকে দুইভাগ করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ক্ষমতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাচর্চা শুরু হয়। উত্তর ভিয়েতনামের বিপ্লবী মানুষের প্রতি রাশিয়া এবং চীনের সহানুভূতি ছিল। মূলত এই কারণেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে মরিয়া হয়ে উঠে। রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ছিল বেশকিছু আদর্শগত দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের জের ধরেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটু পুতুল সরকার প্রতিষ্ঠা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের প্রভাব জোরদার করে। সমগ্র ভিয়েতনাম যাতে একত্রিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামে অস্ত্র এবং সৈন্য প্রেরণ করে।

একদিকে ভিয়েতনামের নামের মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার লড়াই, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা চর্চার লড়াই। এই লড়াই ১৯৬৩ সালের দিকে শুরু হয় এবং এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তা চলতে থাকে। মার্কিন সৈন্যরা অস্ত্র এবং সমরবিদ্যায় উন্নত ছিল। তারা ভিয়েতনামের উত্তর অংশে হামলা করে চিরতরে বিনাশ করে দিতে চেয়েছিল। মার্কিন সেনাদের আক্রমণে ভিয়েতনামের হাজার হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করে। বোমার আঘাতে দেশের অধিকাংশ জায়গা ধ্বংস্তুপে পরিণত হয়। কিন্তু এতো কিছুর পরেও ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষেরা লড়াই থেকে সরে যায়নি। হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও তারা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। অত্যাচারী শাসকদের থেকে মুক্তি লাভের অদম্য বাসনা আর দেশপ্রেম ছিল ভিয়েতনামের যোদ্ধাদের প্রধান শক্তি। আর এই কারণেই যুদ্ধের রসদ, অর্থ এবং সমরবিদ্যায় এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যোদ্ধারা হার মানতে বাধ্য হয়। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর ভিয়েতনামের মানুষেরা বিদেশী শাসকদের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভ করে। উত্তর ও দক্ষিণ অংশ একত্রিত করে স্বাধীন-সার্বভৌম ভিয়েতনাম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

Draft Copy

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার শুরু থেকেই দুইটি বিশেষ ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একদল মানুষ নানাবিধ প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে নিজেদের টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে গেছে। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষ মিলে-মিশে সুন্দর একটা জীবন পরিচালনা করেছে। অন্য একদল মানুষ বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবহর নিয়ে সেইসব সাধারণ মানুষের উপর দখলদারিত্ব করেছে। এসবের ফলে মানুষের জীবন হয়েছে বিপর্যস্ত। মানবতা হয়েছে ভুলুণ্ঠিত। ক্ষমতালোভী শাসকের অত্যাচার আর শোষণে জর্জরিত হয়েছে জনজীবন। বাঙলা অঞ্চল আর ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাসেও একই ঘটনা ঘটেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত আর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস পাঠ ও অনুসন্ধান করে আমরা নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত করবো এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যেখানেই শাসক ও শোষিত শ্রেণির উপস্থিতি দেখতে পাবো, বঙ্গবন্ধুর মতো আমরা নিজেরাও শোষিতের পক্ষে একাত্মতা ঘোষণা করবো। আমরা প্রত্যাশা করবো, একদিন মানবতার জয় হবে। সকল ভেদাভেদ দূরে ঠেলে দিয়ে মানুষের জয় হবে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আমাদেরকে সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছে।

অনুসন্ধানী কাজ: ৩

বাংলাদেশের মানুষের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা ধারণ করলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা বোধ করা যায়। উপরের পাঠের আলোকে চল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ভিয়েতনামের মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে কীভাবে একাত্মতা বোধ করা যায় তা নিজের ভাষায় তুলে ধরি-

Draft Copy

সামাজিকীকরণের নানা প্রসঙ্গ

সামাজিকীকরণ, সমাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমাজ পরিবর্তন

চলো আমরা মাইকেল এরিকসনের সাথে পরিচিত হই। সে সুইডেনে বাবা মার সাথে থাকে। তার বয়স ১৪ বছর। তার একটি ভাই ও একটি বোন আছে। সে একটি জুনিয়র হাই স্কুলে পড়াশুনা করছে। এখন চলো আমরা তার সারা দিনের রুটিনটা একটু দেখে নিই।

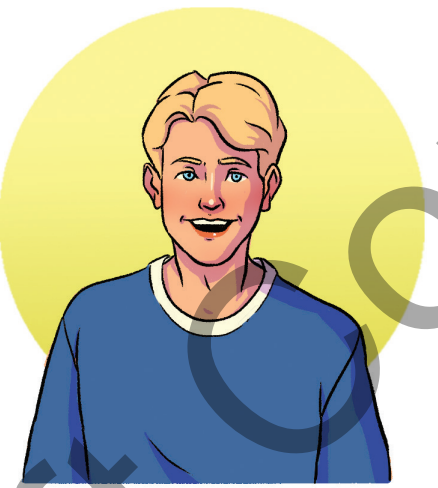

চিত্রঃ মাইকেল এরিকসন

এরিকসন সকাল ৬.৩০ মিনিটে ঘুম থেকে উঠে বিছানা গুছিয়ে নেয়। তারপর সে মা বাবা ও ভাই বোনদের সাথে সকালের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। সে তার নিজের নাস্তাটা নিজেই তৈরি করে। নাস্তা শেষে সে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। ব্যাগ গুছিয়ে স্কুলের ইউনিফর্ম পরে সে স্কুলের পথে রওনা হয়। সাধারণত সে নিজের সাইকেলই স্কুলে যাতায়াত করে। মাইকেলের স্কুলে কিছু নিয়ম আছে যা সবাইকে মেনে চলতে হয়। যেমন সময়মতো সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে স্কুলে উপস্থিত হওয়া, সহপাঠীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা ইত্যাদি। স্কুলের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে মাইকেল ভাষা শিক্ষা বিষয়টিকে বেশি পছন্দ করে। ভাষা শিক্ষার শিক্ষিকার সাথে দেখা হলেই সে স্প্যানিশ ভাষায় 'ওলা, বয়নোজ দিয়াজ মেরি' অর্থাৎ 'শুভ সকাল মেরি' বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে।

তার ক্লাসে ৩০ জন সহপাঠী রয়েছে। মাইকেল ক্লাসের শুরুতে সহপাঠীদের সাথে কথা বলে খবর নেয়। শিক্ষক প্রবেশ করলে সবাই সিটে বসে যায়। ক্লাসে কিছু জানতে চাইলে বসে হাত তুললেই হয়। সিটে বসে প্রশ্নটি করলেই হয়। মাইকেলের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হচ্ছে টভে ও পিটার। টভের সাথে বন্ধুত্ব তার সংগীত ক্লাসে। টভে খুব ভালো পিয়ানো বাজায়। তার পিয়ানোর সুরের সাথে মাইকেল গান গাইতে খুব পছন্দ করে। তার মতে টভে সুর সম্পর্কে খুব ভালো জানে। অন্যদিকে পিটার হচ্ছে তার ফুটবল খেলার সঙ্গী। সে ফুটবলে ফরওয়ার্ড পজিশনে খেলে। পিটার তার স্কুলের দলের গোল কিপারের দায়িত্ব পালন করে। ফুটবলের অনেক নিয়ম-কানুন এবং কৌশল সম্পর্কে পিটার তাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। সেইসাথে মাইকেলও পিটারকে বিভিন্নভাবে

Draft Copy

খেলায় সহযোগিতা করে। মাঝে মাঝে তারা একসাথে খেলার মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখে।

মাইকেলের স্কুল ছুটি হয় চারটায়। এরপর স্কুল থেকে ফিরে সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় এবং টিভি দেখে। টিভিতে সে দেশ বিদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। কখনো কখনো টিভিতে সে খেলাও দেখে। এরপর ছয়টায় পরিবারের সবার সাথে রাতের খাবার খায়। রাতের খাবার তৈরি করার সময় পরিবারের সবাই কাজ ভাগ করে নেয়। মাইকেল ও তার বোন সাধারণত খাবার শেষে রাতের প্লেটগুলো ধোয়ার দায়িত্ব পালন করেন। বাবা ও বড় ভাই রাতের খাবার তৈরি করেন। খাবার খাওয়ার সময় তারা সারাদিনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করে। রাতের খাবার শেষে মাইকেল ১-২ ঘণ্টার মধ্যে স্কুলের বাড়ির কাজগুলো শেষ করে। রাত ৯.৩০-১০.০০ টার মধ্যে সে ঘুমাতে যায়।

অনুশীলনী কাজ : ১

চলো আমরা উপরের পাঠ থেকে মাইকেল তার পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সহপাঠী, গণমাধ্যম থেকে কী কী শেখে তার তালিকা করি।

মাইকেল পরিবার থেকে যা যা শেখে	মাইকেল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে যা যা শেখে
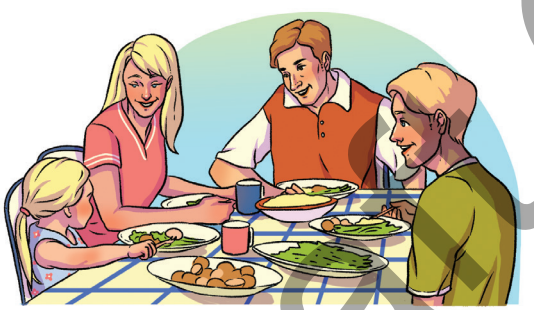	
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•

Draft Copy

মাইকেল সহপাঠী থেকে যা যা শেখে	মাইকেল গণমাধ্যম থেকে যা যা শেখে
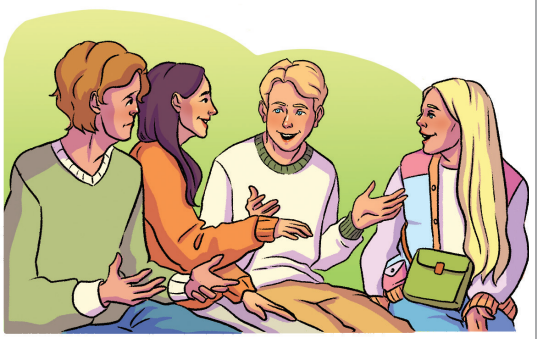	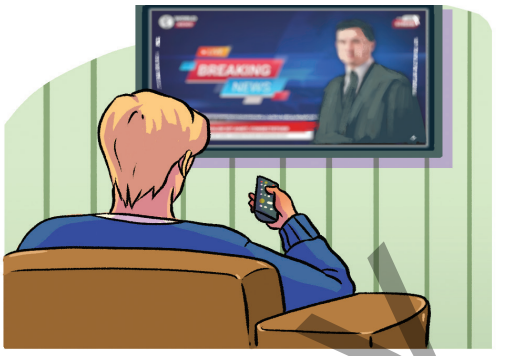
• • • • •	• • • • •

আমরা হয়তো বুঝতে পারছি, আমরা বিভিন্ন বাহন/মাধ্যম থেকে শিখতে পারি। মাইকেলের মতো আমরাও পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সহপাঠী ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচরণ, দক্ষতা ইত্যাদি শিখি। এটাকে আমরা সামাজিকীকরণ বলতে পারি।

অনুশীলনী কাজ: ২

চলো এখন আমরা আমাদের পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সহপাঠী ও গণমাধ্যম থেকে কী কী শিখি তার তালিকা করি।

আমরা পরিবার থেকে যা যা শিখি	আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যা যা শিখি

Draft Copy

আমরা সহপাঠীদের কাছ থেকে যা যা শিখি	আমরা গণমাধ্যম থেকে যা যা শিখি

অনুশীলনী কাজ: ৩

আমরা হয়তো এখন মাইকেলের সামাজিকীকরণ ও আমাদের সামাজিকীকরণের মধ্যে কিছু মিল ও অমিল খুঁজে পেয়েছি। নিচের চিত্রটির মতো করে একটি ভেন ডায়াগ্রাম এঁকে আমরা মিল অমিলগুলো লিখব।

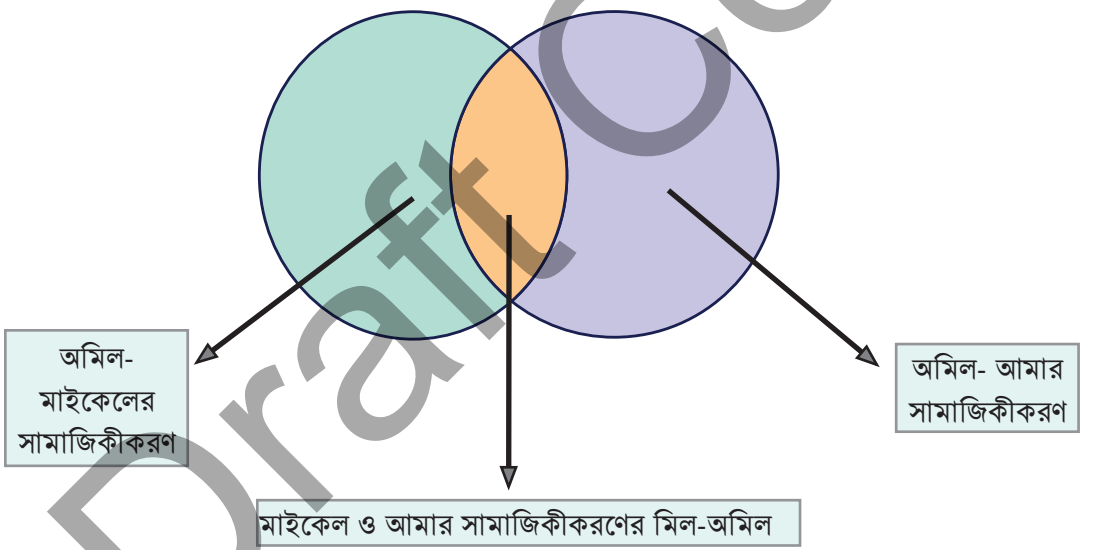

আমরা হয়তো বুঝতে পারছি বিভিন্ন দেশের প্রচলিত রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে সামাজিক কাঠামোগুলো যেমন পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, খেলার সাথী ও গণমাধ্যমের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় ভিন্নতা রয়েছে।

আচ্ছা আমরা একটু কল্পনা করে দেখিতো আমরা যদি কোনো পরিবারে লালিত পালিত না হয়ে কোনো বন-জঙ্গলে বন্য প্রাণীদের সান্নিধ্যে বেড়ে উঠতাম তাহলে কি হতো? কী খুব অবাক লাগছে? চলো আমরা ইংরেজ লেখক রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর বিখ্যাত 'দ্য জাংগল বুক' গল্পটার সাংক্ষেপ পড়ে নিই।

Draft Copy

চিত্র: বনে হারিয়ে যাওয়া মুগলি

গল্পের মূল চরিত্র হল মুগলি। প্রায় জন্মের পরপরই হারিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় এক জঙ্গলে নবজাতক অবস্থায়। সে জানত না তার পিতামাতা কারা, তারা দেখতে কেমন। পিতা-মাতার সংস্পর্শ ছাড়া মুগলি বেড়ে ওঠে জঙ্গলে। তাকে বড় করে তুলেছিল কে জান? একদল নেকড়ে। সে নেকড়েদের মতো করেই জঙ্গলের জীবনে মানিয়ে নিয়েছিল। মুগলি একমাত্র মানুষ হিসাবে সেখানে বসবাস করত। বনে তো মানুষের জন্য অনেক বিপদ-বাধা ছিল। শেরশাহ নামক মানুষ খেকো এক বাঘের কবল থেকে মুগলিকে রক্ষা করার জন্য বাঘীরা নামের চিতাবাঘ কিছু পশু বন্ধুর সাথে মিলে তাকে কাছেই এক গ্রামে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে মুগলি ছোটবেলা থেকে বেড়ে উঠেছিল জঙ্গলে। নেকড়ের দল এবং অন্যান্য পশুপাখিদের সে তার পরিবার-পরিজন হিসেবে জেনে এসেছে। নেকড়ে দলের মাধ্যমে তার সামাজিকীকরণ হওয়ায় এর আচার-ব্যবহার সবকিছুতেই তার প্রভাব ছিল, যা মানুষের আচরণ ও সমাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুগলি বাঘীরার সিদ্ধান্তে তাই জঙ্গল ছেড়ে যেতে চায়নি। যাহোক অন্য মানুষের সংস্পর্শে গিয়ে তার মনোভাব পরিবর্তন হয়। এক্ষেত্রে তার সমবয়সি এক সঙ্গী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসেই মুগলি সামাজিক ব্যবহার, আচার-আচরণ, আবেগ, অনুভূতির যথাযথ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে শুরু করে। সমাজের একজন হওয়ার জন্য মুগলিকে মানুষের জীবনাচরণ শিখে নিতে হয়েছিল। একে বলা হয় পুণঃসামাজিকীকরণ।

এটি যদিও নিছক গল্প, কিন্তু মানুষের জীবনে সামাজিকীকরণের গুরুত্ব বোঝার জন্য একটি চমৎকার উদাহরণ। শুধু গল্পে নয়, বাস্তব জীবনেও সামাজিকীকরণ না হলে কী ঘটে তা জানা যায় বিভিন্ন সত্য ঘটনার আলোকে। চলো এবার আমরা এরকম দু'একটা সত্য ঘটনা জানব। ১৯২০ সালে ভারতের গোদামুরি গ্রামের নিকটবর্তী

Draft Copy

জঙ্গালে এক ধর্মপ্রচারক দম্পতি স্থানীয় লোকজনের কিছু কথাবার্তার ভিত্তিতে অনুসরণ করে জঙ্গালে গিয়ে এক গুহায় কিছু নেকড়ের সাথে থাকা দুটি মানব শিশুকে উদ্ধার করেন। এদের নাম দেন অমলা ও কমলা। তারা জন্মের পর থেকেই নেকড়দের সাথে বড় হওয়ায় মুগলির মতো তাদেরও প্রাথমিক সামাজিকীকরণ হয়নি। তারা নেকড়েদের মতোই নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে চিৎকার করতো, চারপায়ে চলাচল করত এবং অন্যান্য আচার-আচরণেও নেকড়েদের প্রভাব ছিল দৃশ্যমান। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরানো হলেও তারা তা খুলে ফেলতে চাইতো; উদোম শরীরে থাকতে চাইতো। যখন তাদের উদ্ধার করা হয় তখন অমলার বয়স ছিলো দুই বছর, আর কমলার বয়স ছিল আট বছর । কিন্তু তাদের আচার-আচরণ দেখে মনে হত যেন তারা মাত্র ছয় মাসের মানব শিশু। তাদেরকে মানুষের আচার-আচরণ শিখিয়ে তাদের সমাজের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। তবে জঙ্গাল থেকে উদ্ধার করার কয়েক মাসের মাঝে অমলা মারা যায়; আর কমলার মৃত্যু হয় ১৭ বছর বয়সে ১৯২৯ সালে। মৃত্যুর আগে কমলা কিছুটা হলেও মানব আচরণ শিখেছিল। সে দুই হাতে খেতে পারত, কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারত। অমলা কমলার ঘটনায় প্রমাণ হয় আসলে বংশগত বৈশিষ্ট্য নয়, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি-, ও মূল্যবোধ শেখে।

চিত্র: মানুষের সংস্পর্শে এসে কমলা কিছুটা মানুষের মত খেতে অভ্যস্ত হয়

এবার চলো আমরা এরকম আরেকটি সত্য ঘটনা সম্পর্কে জেনে নেই। ঘটনাটির মূল চরিত্র জিনি উইলি নামের যক্তরাষ্ট্রের এক বালিকা। জিনি শৈশবে তীব্র অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়। ফলে তার প্রাথমিক সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয়নি বললেই চলে। সে বেড়ে ওঠে এক বদ্ধ ঘরে, আটক অবস্থায়। কখনো হয়তোবা বিশ্ব এ শিশুটি সম্পর্কে জানতেই পারতো না। তবে ১৯৭০ সালে তাকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যখন তার

Draft Copy

বয়স উদ্ধার করা হয়েছিল ১৩ বছর। জিনি সেই ছোট্ট ঘরে বন্দী থাকাকালীন সময় মা আর ভাইয়ের সাথেও যোগাযোগ করতে পারত না। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে কেউ তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারত না। অথচ সামাজিকীকরণের জন্য শিশুর শৈশব গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। কিন্তু জিনির ক্ষেত্রে দেখা যায় সে তার শৈশবে সামাজিকীকরণের বাহ্যিক প্রণোদনাগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। যার ফলে জিনি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার সাথেই সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। এক পর্যায়ে জিনি ও জিনির মা সেই বন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় । উদ্ধার হওয়ার পর বিভিন্ন গবেষক জিনিকে নিয়ে সামাজিক গবেষণা করে তার আচরণের বিভিন্ন স্তর ও আচরণগত অগ্রগতি রেকর্ড করে রাখতেন। প্রথম দিকে তার আচরণে অনেকগুলি অস্বাভাবিকতা তারা লক্ষ করেন। দেখা গেছে সে হাত উঁচু করে খরগোশের ভঙ্গিতে হাঁট, সঠিকভাবে দাঁড়াতে পারত না। সে কোন কিছুতে মনোযোগ দিতেও ব্যর্থ হত। খাবার চিবাতেও পার না। বিচ্ছিন্নভাবে বড় হওয়ায় সে কোনো ভাষাগত দক্ষতাও অর্জন করেনি। ভয়ানক অপুষ্টিতে ভুগছিল সে। মনোবিজ্ঞানী, ভাষাবিদসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা জিনির ওপর বেশ ভালোভাবেই মনোযোগ দিয়ে তার যত্ন নেন। জিনির ভাষা শেখা করা হয়ে ওঠেনি জেনে তারা তাকে ভাষা রপ্ত করার ব্যবস্থা করে দেয়। এক সময় জিনি অনেকটা অগ্রগতি লাভ করে। কিন্তু স্বাভাবিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি জিনি। সারাজীবন বিভিন্ন হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাকে রাখা হয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতির জন্য একজন স্বাভাবিক শিশুর সাথে জিনির এসব পার্থক্যগুলো হয়েছিল এবং তার জীবনের পরিনীত দূর্ভাগ্যজনক হয়।

জিনি উইলি

Draft Copy

অনুশীলনী কাজ: ৪

অমলা কমলা ও জিনি উইলির আচরণের সাথে আমাদের আচরণের কোনো পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি? কেনো তাদের আচরণের সাথে সাধারণ মানুষের আচরণের পার্থক্য রয়েছে তা খুঁজে বের করে আমাদের মতামত লিখে জমা দিই।

চলো আমরা নিচের পাঠটি পড়ি এবং সামাজিকীকরণ ও সামাজিকীকরণের বাহন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিস্তারিত জানি।

সামাজিকীকরণ

মানুষ মাত্রই সামাজিক জীব তা আমরা ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি । কিন্তু কেন তা বলা হয় তা আমাদের জানা দরকার। একজন মানবশিশু জন্মমাত্রই সামাজিক প্রাণিতে পরিণত হয় না। তাকে বেড়ে উঠার সাথে সাথে সমাজের নিয়ম-নীতি ও মূল্যবোধগুলো শিখে সমাজের একজন হয়ে উঠতে হয়। যেহেতু একজন ব্যক্তি একা একা তার চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তাই তাকে দলবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করতে হয়। সেজন্য একজন মানুষকে তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং সে অনুযায়ী আচার-আচরণ করতে হয়।

সামাজিকীকরণ হল একটি জীবনব্যাপি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজের আকাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও দক্ষতাসমূহ আত্মস্থ কাকে সফলভাবে সমাজের একজন হতে শিখে। প্রতিটি সমাজেরই বেশ কিছু নিজস্ব বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি থাকে যা ওই সমাজের সকল সদস্যদের মেনে চলতে হয়। সামাজিকীকরণ আমাদেরকে এসমস্ত সামাজিক গুণাগুণ শেখায় এবং অন্যের কাছ থেকে আমরা কী ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করব তাও শেখায়। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় আমরা সমাজের একজন সদস্য হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলি। সমাজ ও মানুষ একে অপরকে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে গ্রহণ করে নেয়। সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া একজন মানুষের ছোটবেলা থেকে শুরু করে সারাজীবন চলমান থাকে।

জীবনের একেক স্তরে সামাজিকীকরণ একেক রকম হয়। একজন শিশু যেমন করে শেখে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক সেভাবে শেখে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমগুলো বয়সভেদে ভিন্ন হয়। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও বিদ্যালয় সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধু দল বা প্রতিষ্ঠান নয় চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সামাজিক যোগাযোগ ও মাধ্যম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Draft Copy

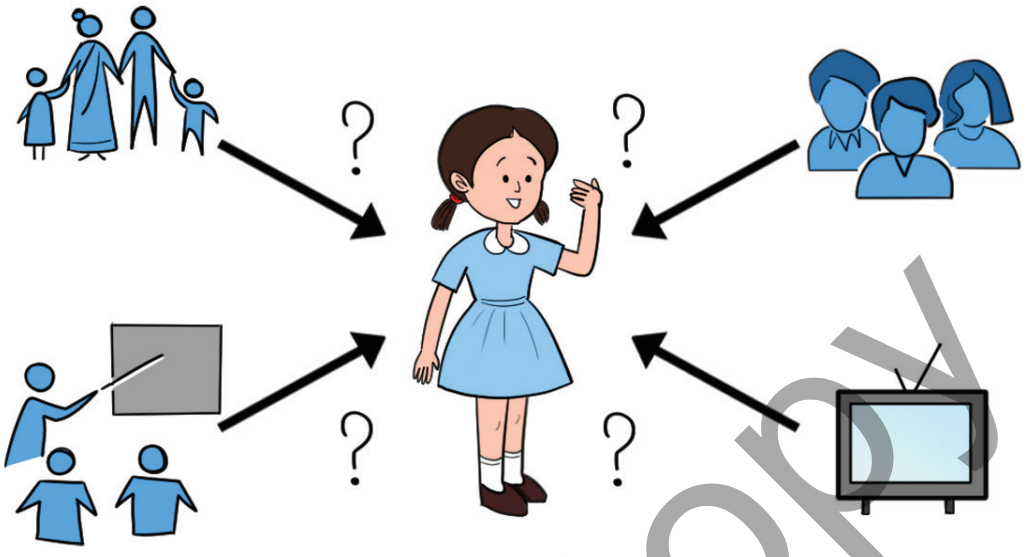

চিত্র: একজন ব্যক্তির সামাজিকীকরণের মাধ্যমসমূহ

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে স্থানান্তর হয়। সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় একটি নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে; অর্থাৎ দেশ বা সমাজ ভেদে একজন ব্যক্তির নিকট প্রত্যাশিত আচার-আচরণ ভিন্ন হয়। বাংলাদেশে বসবাসরত মানুষের সাথে অন্য দেশের মানুষের আচরণের পার্থক্যের মূল কারণ হল সামাজিকীকরণের ভিন্নতা। একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কারণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে আমাদের আশেপাশের পরিবেশ ও মানুষের সাথে মিথস্ক্রিয়ার ফলে। ব্যক্তিত্ব হল একজন মানুষের মনোভাব, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারের ধরণ। একজন মানুষের সাথে অন্য মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা তৈরি হয় তাদের মিথস্ক্রিয়ার ধরনের পার্থক্যের জন্য।

সামাজিকীকরণকে দুটি ধাপে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হল, প্রাথমিক সামাজিকীকরণ আর দ্বিতীয়টি হল, মাধ্যমিক সামাজিকীকরণ। ব্যক্তির প্রাথমিক সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় জন্মের পর থেকে তার শৈশবে, পরিবারই হল এর প্রধান মাধ্যম। এ পর্যায়ে একটি শিশু সংস্কৃতির আত্মীকরণ করে ও তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে। শৈশব থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত মাধ্যমিক সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। এ পর্যায়ে পরিবার, বিদ্যালয়, গণমাধ্যমসহ নানান প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ

আমরা তো এতক্ষণ সামাজিকীকরণ সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছি। এখন চলো আমরা বুঝার চেষ্টা করি সামাজিকীকরণ কীভাবে সম্পন্ন হয়।

সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা দলের মাধ্যমে, আমরা এগুলোকে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা বাহন বলি। এবার চলো আমরা সমাজিকীকরণের বাহনসমূহের সাথে পরিচিত হই এবং বোঝার চেষ্টা করি মানুষকে সামাজিক প্রাণিতে রূপান্তরে সেগুলোর অবদান।

Draft Copy

পরিবার: শিশু জন্মের পরপরই তার পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের মাধ্যমে তার চারপাশকে বোঝার চেষ্টা করে। তখন সে মূলত প্রাথমিক আচরণ করতে শেখে। মুখে কিছু কিছু আওয়াজ করে যা তার প্রাথমিক ভাষা। তার মাঝে আবেগ, অনুভূতি ও মানবিকতার বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। শিশুমাত্রই অনুকরণপ্রিয় হয়ে থাকে। তাই পরিবার-পরিজন শিশুর আশেপাশে কী আচার-আচরণ করে তা গুরুত্বপূর্ণ। আবার শিশুর আচরণ বা কর্মকান্ড দেখে মা-বাবা ও অন্যরা কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তার দ্বারাও শিশুর আচরণ প্রভাবিত হয়। আর এর মাধ্যমেই তার মাঝে মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্যান্য সামাজিক ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। পরিবারের ভূমিকাই এক্ষেত্রে মুখ্য। পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল একটি শিশুকে সমাজে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব বিকাশে সহায়তা দেওয়া। বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগ পর্যন্ত শিশু পরিবারের লালন-পালনেই বড় হয়ে ওঠে। সামাজিকীকরণ এর প্রথম ধাপে পরিবারের শিক্ষা তাই একজন মানুষের পরবর্তী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ও আচরণকে অনেকাংশেই প্রভাবিত করে।

পরিবার দ্বারা শিশুর সামাজিকীকরণ কেমন হবে তা নির্ভর করে পরিবারের সদস্যদের মূল্যবোধ এবং সামাজিক অবস্থানের উপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর সাথে ও অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যগত তারতম্য দেখা যায়। আর এ কারণে দেখা যায় সামাজিকীকরণের তারতম্য। সামাজিক অবস্থানের তারতম্যের কারণেও উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার ভিন্নতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিন্নতার ফলাফল হিসেবে শিশুদের মধ্যে সামাজিকীকরণে সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের দ্বিতীয় প্রধান বাহন রূপে কাজ করে। পরিবারের মাঝে সীমিত থাকা শিশুর ছোট্ট সামাজিক জগতকে সম্প্রসারিত করে তোলে একটি বিদ্যালয়। এখানে একজন শিশুর সাথে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা শিশু ছাড়াও অন্যান্য মানুষের পরিচয় ঘটে। শিশু হলেও তারা কিন্তু অনুধাবন করতে শেখে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের পার্থক্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শ্রেণিকক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থান থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেতভাবে জাতীয় সংগীত গায়, একসাথে ওঠাবসা ও খেলাধুলা করে। এতে করে তাদের মাঝে শৃঙ্খলা, দেশপ্রেম, নিয়মানুবর্তিতা, সহমর্মিতাসহ নানা গুণাবলি বিকশিত হয়। পরিবারের পর বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিশুর মাঝে লিঙ্গভিত্তিক ধারণাও গড়ে ওঠে। ছেলেদের মধ্যে বাইরে খেলাধুলার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়, অন্যদিকে মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ খেলাধুলার প্রতি বেশি মনোযোগী হতে দেখা যায়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষিকারা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের সঞ্চারণ করেন না। পরিবেশ বা অবস্থা থেকেও শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নানা বিষয় আত্মস্থ করে থাকে। যেমন - বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকল শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান করা হলে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটায়। খেলাধুলার ফলে তাদের দেড়ানো, লাফানো ইত্যাদি সক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও নিয়মানুবর্তিতার মতো প্রয়োজনীয় গুণাগুণ অর্জিত হয়। সেইসাথে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও নেতৃত্বের গুণাবলিও বিকশিত হয়। বিদ্যালয়ের দীর্ঘ, সুনির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শিশুকে যুক্তি প্রয়োগে উৎসাহিত করে, আবার এর ফলে তার মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠলে শিশু ক্রমে একজন সম্ভাবনাময় মানবসম্পদে উন্নীত হয়।

Draft Copy

সমবয়সী সঙ্গী: পরিবারের পরপরই মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, ঠাট্টা-মশকরার সঙ্গী হয়ে ওঠে একই বয়সের খেলার সাথী, সহপাঠী বা সমবয়সী বন্ধু। নিজেদের মাঝে প্রাণখুলে, বাঁধাহীনভাবে মনের কথা বলা যায় একে অপরের সাথে। সমবয়সী সঙ্গী বলতে আমরা এমন একটি সামাজিক দলকে বুঝে থাকি যারা প্রায় একই বয়সের এবং সামাজিক অবস্থান ও আগ্রহের জায়গায় তাদের মধ্যে মিল থাকে। প্রাকৃতিকভাবেই শিশু এসময় শেখে কীভাবে তার সমবয়সী গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। নিজের ধ্যান-ধারণা বা অনুভূতিকে লালন করে এ সময়টা শিশুরা নিজেদের মধ্যে নিজেকে সমাজের একজন করে গড়ে তুলে। সকলে একই বয়সের হওয়ায় ও নিয়মিত মিথস্ক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা বা সংহতি পরিলক্ষিত হয়।

এ ধরনের সামাজিকীকরণ প্রত্যাশিত। কারণ এ প্রক্রিয়ায় শিশু তার আকাঙ্ক্ষিত কোন দল বা গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য একই মূল্যবোধ ও বাচনভঙ্গি চর্চা করে যাতে সে ওই দলের সাথে মানিয়ে নিতে পারে। যেমন একজন তরুণ হয়ত এমন একটি দলের সদস্য হতে চায় যেখানে সবাই ফুটবল খেলতে বা দেখতে পছন্দ করে এবং সে বিষয়ে তার ধারণা বেশ স্পষ্ট। সুযোগ পেলে সেই তরুণ ফুটবল সম্পর্কে তার জানার পরিধি আরও বাড়াবে এবং ঐ দলের পছন্দের ফুটবল দলকে সমর্থন করতে হবে। এর পিছনে কারণ হলো সে প্রত্যাশা করে তাকে ওই দল বা ব্যক্তিবর্গ নিজেদের দলে গ্রহণ করবে। সমবয়সী সঙ্গীদের প্রভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। সমবয়সী সঙ্গী বলতেই তরুণরা এক সুবিধাজনক দলের মাঝে অধীনস্থ থাকার মাধ্যমে নিরাপদ অনুভব করে। পরিবার তার নবীন সদস্যদের সমবয়সী সঙ্গী নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকে তার কারণ বোঝা যায় বাংলাভাষায় প্রচলিত এই প্রবাদটি লক্ষ করলে- 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে'। এর মাধ্যমে অভিভাবকরা মূলত কিশোর-কিশোরীদের বন্ধু নির্বাচনের দিকে মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। কারণ এসময় নিজেদের যে জগত তারা গড়ে তোলে তার ওপর তার সঙ্গীদের প্রভাব হয় প্রখর । অনেকসময় দেখা যায় তারা নিজেদেরকে পরিবার থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখে ও নিজেদের প্রাপ্তবয়স্ক ভাবতে শুরু করে। প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে তারা তখন অনেক বিষয়ে আলোচনায় নিরুৎসাহিত বোধ করে। তাদের সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য তৈরি হয়। যেটাকে প্রজন্মগত পার্থক্য (Generation Gap) বলা হয়ে থাকে।

গণমাধ্যম: গোটা বিশ্বের সকল মানুষ প্রতিদিন তার কিছুটা সময় ব্যয় করে গণমাধ্যম ব্যবহার করে। আগেকার জনপ্রিয় গণমাধ্যম ছিল পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন। বর্তমানের জনপ্রিয় গণমাধ্যম হল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলি। যেমন- ইউটিউব, টুইটার বা ফেসবুক। এসব গণমাধ্যম বর্তমানে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নতুন গণমাধ্যমকে জনপ্রিয় করেছে। এ নতুন গণমাধ্যম আমাদের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ গঠন ও আচরণে সর্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। আমাদেরকে বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। এসব প্রভাব সবসময় ইতিবাচক নয়, আমরা বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষ্য করি।

কর্মক্ষেত্র: আমরা জেনেছি যে, সামাজিকীকরণ আজীবন অব্যাহত থাকে। মনে হতে পারে শিক্ষাগ্রহণ শেষ হয়ে গেলে বুঝি জীবনে সামাজিকীকরণ বা শিক্ষণীয় আর কিছুর প্রয়োজন নেই। সফল সামাজিকীকরণের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে নিজের মেধা আর দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উতরে যাওয়া যাবে এমনটা ভাবাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কর্মস্থলে যোগদানের পরপরই বেশকিছু বিষয় মোকাবেলা করতে হয়। যেমন- প্রথমত, নতুন চাকরি শুরু

Draft Copy

করার সময় শুধু নিয়োগকর্তা কী ধরনের কাজের প্রত্যাশা করেন তা জানলেই হবে না; সেই সঙ্গে সহকর্মীদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে মানিয়ে নেয়াও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নতুন রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে একজন ব্যক্তির মাঝে সামাজিকীকরণ ঘটে থাকে। কাজের পরিবেশে বা সহকর্মীদের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ব্যক্তি তার পারিপার্শ্বিক আবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এভাবেই একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়।

প্রকৃতি ও প্রতিপালন বিতর্ক (Nature/Nurture Debate): আমাদের আচার-আচরণ কি বংশগতভাবে (প্রকৃতি) পূর্বনির্ধারিত, নাকি সামাজিক পরিবেশের (প্রতিপালন) মাধ্যমে আমাদের আচার-ব্যবহার নির্ধারিত হয় তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলে আসছে। আসলে প্রকৃতি ও প্রতিপালন ধারণা দুটির সম্পর্ক জটিল। মানব আচরণের উপর জৈবিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব বিদ্যমান। আমাদের চোখ, চুলের রং, আমরা দেখতে কেমন হব তা জন্মসূত্রে অর্জন করে থাকি। আমাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন– বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্ব, আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি ও লিঙ্গ পরিচয়ও জৈবিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও একজন মানুষের সম্ভাবনা নির্ভর করে তাকে কীভাবে বড় করা হচ্ছে তার ওপর। মানুষ তার আচার-ব্যবহার, মেজাজ যাকে আমরা আদব-কায়দা বলে থাকি তা জৈবিকভাবে নয় বরং সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শেখে।

চিত্র: একজন শিশু বংশগত ও প্রতিপালনের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা অর্জন করে

একজন মানবশিশু যদি সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে না যায় তাহলে তার ফল কী হতে পারে সেটা অবশ্য তোমরা আগেই জেনেছ। তোমরা জান যে, যথার্থ সামাজিকীকরণে ব্যতীত ব্যক্তি শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ ও অনুকরণের মাধ্যমে সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি আয়ত্ব করে সামাজিক প্রাণি হিসেবে সমাজে খাপখাইয়ে নিতে পারে না।

Draft Copy

অনুশীলনী কাজ : ৫

চলো আমরা এখন সবাই মিলে একটি সংগঠন তৈরি করি এবং এর নামও ঠিক করি। তার আগে আমরা জেনে নিই আমাদের এই সংগঠনের কাজ কি? সংগঠনটির কাজ হচ্ছে এলাকার সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এটি হতে পারে পরিবেশ দুষণরোধ, ধুমপানমুক্ত এলাকা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, যৌতুকপ্রথা বন্ধ ইত্যাদি। সংগঠনের নাম দেওয়া হয়ে গেলে আমরা একটি সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ নির্ধারণ করি। এরপর, আমরা সবাই মিলে সংগঠনের সদস্যদের জন্য অবশ্য পালনীয় কিছু নিয়ম ঠিক করে নিই।

সংগঠনের নাম	সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ	সদস্যদের অবশ্য পালনীয় নিয়ম

আচ্ছা সংগঠনের সদস্যরা যদি নির্ধারিত নিয়ম না মেনে চলে তাহলে কি হবে? তারা কি সংগঠনে থাকবে না কী সংগঠন তাদের বাদ দিয়ে দেবে? নাকি সদস্যরা সংগঠনে সবার সাথে থাকার জন্য এই নিয়মগুলো মেনে চলবে? এটা কি তাহলে এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ?

একইভাবে, আমরা কি ভেবে দেখেছি, আমরা কেনো পরিবার বা স্কুলের নিয়মকানুন, রীতিনীতি মেনে চলি? কখনো কি ভেবেছি এইসব রীতিনীতি না মেনে চললে কি হবে? অনেক প্রশ্ন এখন হয়তো আমাদের মনে উঁকি দিচ্ছে। চলো তাহলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আমরা কিছু জেনে নিই।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা হল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ । এটি সমাজের সদস্যরা কিছু প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে বাধ্য করে। সমাজ নিয়ন্ত্রণ মানুষকে একই ধরনের আচরণ করতে উৎসাহ দেয়। যার ফলে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং আমাদের মধ্যে একাত্মতাবোধ তৈরি হয়।

আমরা নিজেরা যেমন- সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ মেনে চলি, তেমনি আশা করি যে অন্যরাও তা করবে। কোন রকম ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই আমরা প্রতিদিনকার জীবনে অসংখ্য সামাজিক নিয়ম, বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মেনে চলি বা মানতে বাধ্য হই কারণ ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ আশা করে যে, আমরা তা মেনে চলব। আর আমরা যদি তা মেনে চলি তাহলে সমাজ আমাদেরকে 'ভালো মানুষ' হিসেবে জানবে এবং এতে আমরা নানানভাবে উপকৃতও হব। আর যদি কেউ সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ না করে তাহলে মানুষ তার নিন্দা করবে এবং সেজন্য সে শাস্তিও পেতে পারে। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার, আর 'মন্দ' কাজের জন্য শাস্তির মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

Draft Copy

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সমাজের সব মানুষ একই রকম নয়। বেশির ভাগ মানুষই সমাজের বিধিনিষেধ, মূল্যবোধ ও আইন মেনে তাদের কর্মকান্ড করে থাকে। কিন্তু কিছু মানুষ শুধু নিজের স্বার্থেই কাজ করে, অন্যের উপকার বা ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখে না। অনেক সময় মানুষ তার চাহিদা মেটাতে গিয়ে সমাজ অস্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করে বা আইন ভঙ্গ করে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র চায় না কেউ বিচ্যুত হোক বা অপরাধমূলক আচরণ করুক।

বিচ্যুত আচরণ: যে আচরণগুলো সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতিকে (norms) অমান্য করে তাই বিচ্যুত আচরণ।

অপরাধ: কোন একটি দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করাই হল অপরাধ।

সমাজ নিয়ন্ত্রণ হল এমন কতগুলো কৌশল যার মাধ্যমে মানুষকে বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখা হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রয়েছে। পরিবার, বিদ্যালয়, পুলিশ, আইন, বিচারব্যবস্থা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোর কোন কোনটি সামাজিকীকরণেরও মাধ্যম, আবার এরা সমাজ নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখে। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর ভিন্নতাকে বিবেচনা করে সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়-

অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ:

সমাজের রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ না মানলে পরিবার, সমবয়সি বন্ধু বা সহপাঠীরা যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায় তাকে আমরা অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলি। কেউ যদি প্রচলিত নিয়ম-কানুন ও আচার আচরণ না করে তখন পরিচিত ও অপরিচিত মানুষেরা হাসি-তামাসা, ঠাট্টা বা মস্করার মাধ্যমে তার বিরোধিতা করে। তাই আমরা কেউই চাই না আমাদের আচরণের মাধ্যমে অন্যদেরকে সমালোচনার সুযোগ দিতে। বিচ্যুত আচরণ প্রতিরোধে এ ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর বলে মনে করা হয়। এধরনের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কেশল গ্রামীণ সমাজে বেশি কার্যকর। তার কারণ হল গ্রামীণ সমাজের সামাজিক সম্পর্ক শহরের তুলনায় বেশ ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। তাই কেউ যদি বিচ্যুত আচরণ করে পরিবারের সদস্যরা এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা তার সমালোচনা করে। যার ফলে ব্যক্তি তার ভুল বুঝতে পারে এবং কাঙ্ক্ষিত আচরণ করে। গ্রামে আধুনিক প্রতিষ্ঠানের (পুলিশ, আদালত) চেয়ে প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন- সালিশ, গ্রাম পঞ্চায়েত সমাজ নিয়ন্ত্রণে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

Draft Copy

আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ

আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে প্রাতিষ্ঠানিক এজেন্ট যেমন পুলিশ কর্মকর্তা, বিচারক, স্কুলের প্রশাসক বা চাকরিদাতারা। যখন অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ কাজ করে না তখন আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজ নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসে। সব দেশে বা সমাজেই দেখা গেছে কিছু মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান ও আইন-কানুন মানে না। এ ধরনের আচরণকে অপরাধ বলা হয়। কেউ অপরাধ করলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সমাজ নানান রকম শাস্তি দিয়ে থাকে। শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন- আর্থিক জরিমানা, কারাদন্ড বা চাকরিচ্যুতি। এ সমস্ত শাস্তির ব্যবস্থা একদিকে যেমন অপরাধীদের ভবিষ্যতে বিভিন্ন অপরাধ থেকে নিবৃত রেখে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে, আবার সুনাগরিকসহ সকল নাগরিকদের জন্যও অপরাধ থেকে বিরত থাকার বার্তা দেয়। আনুষ্ঠানিক সমাজ নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের জন্য কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। তাই অনানুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

সমাজ নিয়ন্ত্রনে পরিবারের ভূমিকা

পরিবার যেমন সামাজিকীকরণের বাহন, তেমনি সামাজিক নিয়ন্ত্রণেরও অন্যতম মাধ্যম। পরিবার একদিকে যেমন সন্তান-সন্ততিকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে, আবার অন্যদিকে পরিবারই প্রাথমিকভাবে শৃঙ্খলাবোধ, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি বিবেচনা করে আচরণের সঠিক নির্দেশনা দেয়। অর্থাৎ পারিবারিকভাবে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি যেন সমাজ বা আইন বিরোধী কোন কর্মকান্ডে লিপ্ত না হই।

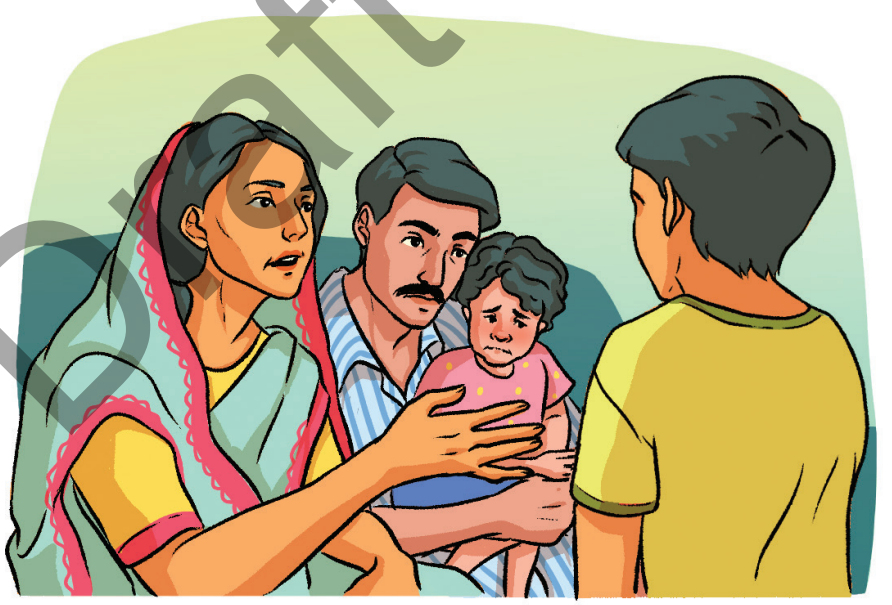

চিত্র: পরিবার বিভিন্ন সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে

Draft Copy

সমাজে একজন ব্যক্তি পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত হয়। সমাজ সমর্থন করে না এমন কাজ বা আচরণ করলে ব্যক্তির সাথে সাথে তার পরিবারও তিরস্কৃত হয়। এতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্মান ও মান-মর্যাদা নষ্ট হয়। তাই পারিবার তার মর্যাদা রক্ষার্থে সদস্যদের বিচ্যুত আচরণ করা থেকে বিরত রাখতে বদ্ধ পরিকর। সুতরাং আমরা বলতে পারি মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণে পরিবারের ভূমিকা মূখ্য।

সমাজ নিয়ন্ত্রনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

বিদ্যালয় যেমন সামাজিকীকরণের জন্য আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজ নিয়ন্ত্রণেও তার ভূমিকা অনন্য। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা নয়, শিক্ষার্থীর আচরণ নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ ভূমিকা পালন অর্থাৎ সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সুনাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি বিদ্যালয় পরিচালিত হয় কতগুলো লিখিত নিয়মাবলির দ্বারা। সেসমস্ত নিয়মগুলো বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিচালনার সাথে যুক্ত তাদের সবাইকে মেনে চলতে হয়। শিক্ষার্থীদের যেসকল নিয়ম মানতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হল- নিয়মিত স্কুলে আসা, নির্দিষ্ট পোষাক পরিধান করা, শিক্ষকদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা ও সহপাঠীদের সাথে ভালো আচরণ করা। যদি এসব নিয়ম কেউ না মানে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হয়।

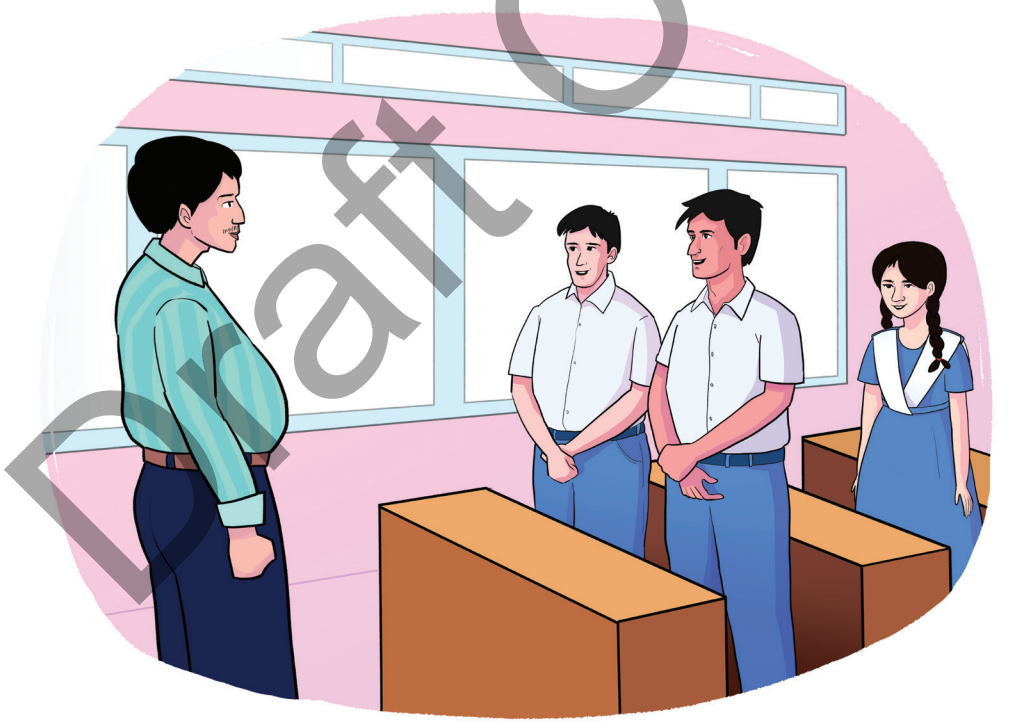

চিত্র: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে

Draft Copy

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেখা নিয়ন্ত্রিত আচরণগুলো আমাদের সমাজ জীবনেও আচরণকে প্রভাবিত করে। অন্যের উপকার করা, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ কর, সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠা, নিয়মিত পড়াশুনা করা, সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা ইত্যাদি মূল্যবোধ ও আচরণ আমরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিখে থাকি। শুধু তাই নয়, বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা আমাদের সারা জীবনই নিয়ন্ত্রিত আচরণ করার প্রেরণা দেয়। তার মানে বিদ্যালয় আমাদের বিচ্যুত আচরণ করা থেকে বিরত রাখে।

সমাজ নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ভূমিকা

বিশৃংখল ও দ্বন্দ্ব সংঘাতময় সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সমাজের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চূড়ান্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত। মানব সভ্যতার প্রথম যুগের সহজ-সরল সমাজগুলো অনানুষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। ফলে মানুষের আচার-আচরণগত বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। নানা মন-মানসিকতা ও চিন্তার মানুষের সহঅবস্থানের কারণে অনেক সময় পূর্বের মতো সমাজ নিয়ন্ত্রণের অনানুষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো কাজ করছিল না। এমন পরিস্থিতিতে সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম আনুষ্ঠানিক মাধ্যম যেমন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গুরুত্ব বেড়েছে।

আমাদের দেশে সমাজ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম বাহন আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতি যা জাতীয় সংসদে প্রণীত হয় এবং তা সরকারের অন্যতম অঙ্গ বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। সকল আইনকানুন বা নিয়ম-নীতিগুলো যেমনিভাবে সমাজের মানুষের যাবতীয় অধিকার রক্ষা করে তেমনি সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করে।

রাস্তায় আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কাজ করে ট্রাফিক পুলিশ

Draft Copy

সমাজ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি দেশকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। যেমন- বাংলাদেশকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন/পেরসভা এবং ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইউনিটে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মূলত সমাজে বিচ্যুত, অনাকাঙ্ক্ষিত ও সমাজবিরোধী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজ জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা।

সরকারের বিভাগসমূহ:

সরকার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে-

আইন বিভাগ : আইন তৈরি ও সংশোধন করা।

শাসন বিভাগ : রাষ্ট্রের মধ্যে আইনকে প্রয়োগ করা।

বিচার বিভাগ : কেউ আইন ভঙ্গ করলে তার বিচার করা।

তবে শাসন বিভাগকে সরকারের বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সেসব কথাও তোমরা অন্য অধ্যায়ে জানতে পারবে।

একটি রাষ্ট্র পুলিশ, আদালত এবং কারাগারের মাধ্যমে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। পুলিশ সমাজে আইন বা নিয়ম-কানুন ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তার অপরাধের বিবরণ তৈরি করে। সেই বিবরণের আলোকে আদালত বিচারকার্য সম্পাদন করে। ব্যক্তি সমাজবিরোধী কর্মকান্ডে জড়িত প্রমাণিত হলে আদালত শাস্তি ভোগের জন্য তাকে কারাগারে প্রেরণ করে। বয়স বিবেচনায় শাস্তির মাত্রা কম-বেশি হয়। কিশোর অপরাধীদের কারাদন্ডের বদলে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। অনেক সময় আদালত ব্যক্তির অপরাধ কর্মকান্ড বিবেচনায় কারাদন্ডের পাশাপাশি অর্থদন্ড প্রদান করে থাকে। অনেক সময় বয়স বিবেচনায় বিচ্যুত আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে অনেককেই সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। সুতরাং সামাজের শৃঙ্খলা রক্ষায় তথা নিয়ন্ত্রণে আইন-কানুন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজ নিয়ন্ত্রণে গণমাধ্যমের ভূমিকা

আধুনিক কালে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম বেশ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম সমাজের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অনিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলে। বর্তমান সময়ের উল্লেখযোগ্য কিছু গণমাধ্যম হলো- বেতার, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি। বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত বক্তৃতা, আলোচনা অনুষ্ঠান, বিতর্ক, নাটক, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট, গল্প ও প্রবন্ধে সমাজের বাস্তবতা ও আকাক্ষা তুলে ধরা হয়। এ সকল গণমাধ্যম বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধের কারণ, পরিণাম এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরে। এভাবে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজ-বিরোধী কর্মকান্ড ও বিচ্যুত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

Draft Copy

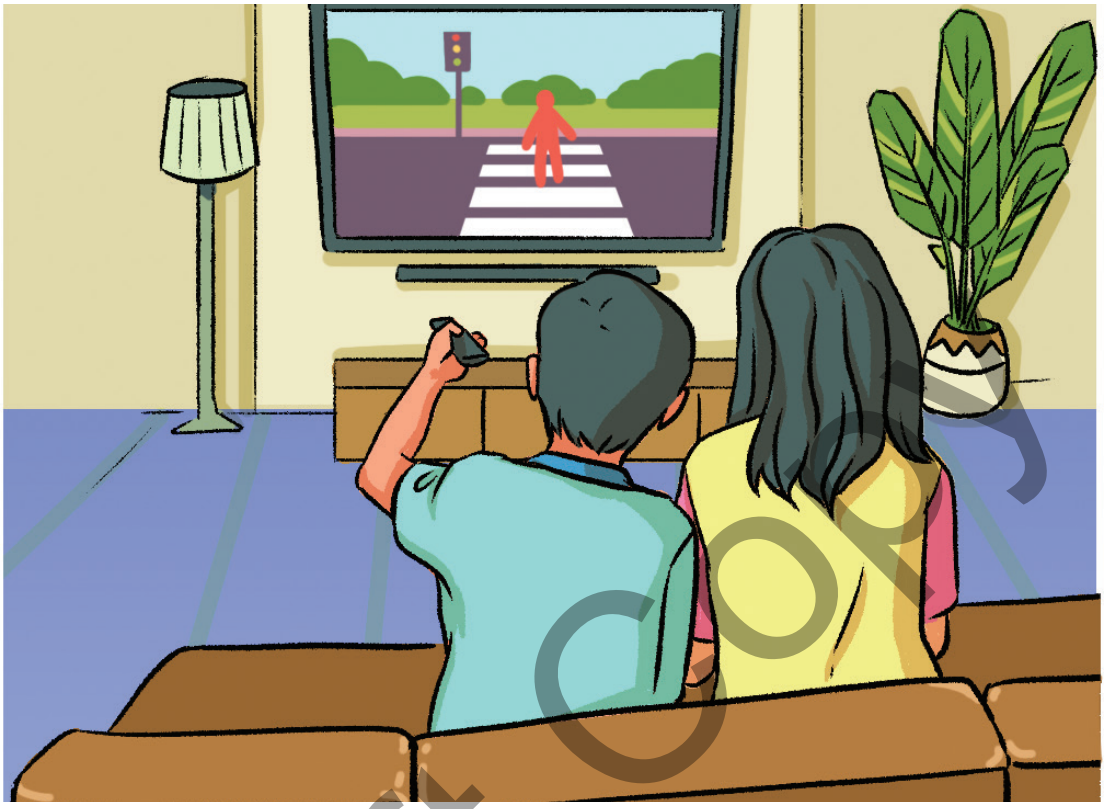

গণমাধ্যম আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে

বর্তমান সমাজে ইন্টারনেট ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ইউটিউব, ফেইসবুক, টুইটারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নতুন গণমাধ্যমের দ্বারা বিচ্যুত আচরণ ও অপরাধ কর্মকান্ড যেমন বেড়েছে, আবার এসব আচরণ নিয়ন্ত্রণেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব গণমাধ্যম ব্যবহারকারীদের দায়িত্বশীল আচরণ করার জন্য সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করেছে।

আমরা হয়তো বুঝতে পারছি সামাজিক কাঠামোগুলো একদিকে যেমন আমাদের সমাজের রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচরণ ইত্যাদি শেখায় অন্যদিকে সমাজ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এগুলো পালনে আমাদের বাধ্য করে।

অনুশীলনী কাজ: ৬

এখন আমরা সংগঠনের সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কি কি কাজ করা হবে তার তালিকা করব। কে কোন দায়িত্ব পালন করবে তারও তালিকা তৈরি করব। আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা করব।

Draft Copy

সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার পরিকল্পনা	
কি কি কাজ করা হবে	
দায়িত্ব কি হবে	
কে কোন দায়িত্ব পালন করবে	

সামাজিক পরিবর্তন

মানুষ নিজেদের বহুমুখী চাহিদা পূরণের জন্য সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে অভ্যস্ত। মানুষকে তার দৈনন্দিন চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য তারা তৈরি করে বিভিন্ন প্রকার সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, দল এবং সমিতি। নিজেদের স্বার্থ ও প্রত্যাশা পূরণের জন্য এ সমস্ত কিছুর সমষ্টিকে আমরা সমাজ বলতে পারি।

সমাজ স্থিতিশীল কোনোকিছু নয়, বরং সর্বদা পরিবর্তনশীল। 'সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা' (Communal society) ক্রমান্বয়ে পরিবর্তনের মাধ্যমেই আজকের আধুনিক 'সংঘ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'(Associational society) তৈরি হয়েছে। 'সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'য় সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংহতি ছিল অত্যন্ত নিবিড় ও আন্তরিকতাপূর্ণ। সে সমাজে এক ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তি পার্থক্য ছিল খুবই কম, সকলেই ছিল প্রায় একই রকম আচার-আচরণ ও চিন্তা চেতনা এবং মূল্যবোধের অধিকারী। এখানে ব্যক্তির ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার তুলনায় সম্প্রদায়ের মঙ্গল ও ইচ্ছাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এই সম্প্রদায়গুলি পরিবারের মত কাজ করে। আমরা একটি যন্ত্রের সাথে এই সমাজ ব্যবস্থাকে তুলনা করতে পারি। অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ নিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ যন্ত্র তৈরি হয় যেখানে প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজগুলোর মাধ্যমে পুরো যন্ত্রটিকে সচল রাখে। যন্ত্রের অংশগুলো একে অপরের সাথে এমন ভাবে জড়িত ও নির্ভরশীল যে কোন একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলে পুরো যন্ত্রটি অচল হয়ে যেতে পারে। আমরা যে সম্প্রদায় ভিত্তিক সমাজের কথা বলছি সেখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ বা সম্পর্কটা এই যন্ত্রের মতোই। এখানে কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের মধ্যে সংকট তৈরি হলে পুরো সমাজের মধ্যে তা ছড়িয়ে যায় এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সেটি সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

Draft Copy

'সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'র বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক 'সংঘভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা'। এটি সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজের বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এই সমাজব্যবস্থা তৈরি হওয়ার পেছনে মূলত জনসংখ্যা এবং সেইসাথে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধির মত বিষয়গুলো কাজ করেছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় সদস্যদের মধ্যে চিন্তায়, আচরণে, মূল্যবোধে তেমন মিল নেই। এই ধরনের সমাজের সদস্যরা যতটা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ততটা সমাজের মঙ্গালের দিকে নয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক সমাজের মতো সদস্য পদ লাভ স্বাভাবিক বা বাধ্যতামূলক কোনোটিই নয়; বরং নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ এই সমাজের সদস্য হয়ে থাকে। একটি জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিরাজমান, এই সমাজের সংহতি ও সম্পর্কগুলো তেমন রূপ ধারণ করেছে। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাবো যে যদিও জীবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোর প্রত্যেকটির কার্যকারিতা নির্ধারিত রয়েছে এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া কর্মের ফলে পুরো জীব দেহ টিকে থাকে তথাপি একেকটি অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমের বিভাজন তৈরি হওয়ায় একেক ধরনের ব্যক্তি একেক পেশায় নিয়োজিত থাকে। ফলে সমাজে ভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণের জন্য সমাজের যেকোনো সংগঠনের সদস্য হতে পারে।

উপরোক্ত দুটো সমাজের পার্থক্য জেনে আমরা বুঝতে পারি, সমাজের রীতি-নীতি, আদর্শ-মুল্যবোধ, চাহিদা ও সদস্যদের মিথস্ক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে একটি সমাজ রূপান্তরিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের অর্থ হলো - সময়ের সাথে সংস্কৃতি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপান্তর। অর্থাৎ সমাজের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়া এবং মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা হয়।

সামাজিক পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোরও (প্রযুক্তি, মূল্যবোধ ইত্যাদি) পরিবর্তন সাধিত হয় যার ফলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন সব সময় ইতিবাচক নাও হতে পারে, সংস্কৃতির উপাদান সমূহের নেতিবাচক পরিবর্তনের কারণে সমাজের সমস্যা বা অবক্ষয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আবার সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবনের ফলে একদিকে যেমন মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার কমেছে, আবার মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। জনসংখ্যার তারতম্যের উপর সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে। নতুন ধারণাও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। যেমন বলা যায়, মার্টিন লুথার ও জন কেলভিন খ্রিস্টান ধর্মের নতুন একটি রূপ উপস্থাপন করেন। যেটিকে আমরা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত বলে জানি। এই ধর্মমতের মাধ্যমে তারা প্রচার করেন, কাজের মাধ্যমে ইহজাগতিক শান্তি ও পরলৌকিক মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ মতবাদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মালম্বীরা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে কাজ করতে লাগল। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার মনে করেন, ইউরোপে পুঁজিবাদী সমাজ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন ধারণা সমাজের পরিবর্তন ঘটায়। একইভাবে তৎকালীন আরবে সমাজের ইসলাম ধর্মের প্রভাবে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এ ধর্ম উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিস্তীর্ন অঞ্চলের সমাজ জীবনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সমাজে জীবনে বিভিন্ন ধর্ম যেমন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেছে তেমনি আবার পরস্পরকে প্রভাবিত করার দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

Draft Copy

বাংলাদেশের সমাজ পরিবর্তন

সামাজিক পরিবর্তন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এটি কখনো বন্ধ হয়ে যায় না। পরিবর্তন কোথাও দ্রুত আবার কোথাও ধীরগতিতে হতে পারে। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা থেকে আজকের আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর এই প্রক্রিয়ার প্রমাণ। প্রথম সমাজ ব্যবস্থা হিসেবে আমরা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজের কথা জানি। তখন মানুষের প্রধান কাজ ছিল খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন যাপন করা। ক্রমান্বয়ে খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ থেকে পশুপালন সমাজ, কৃষিভিত্তিক সমাজ ও শিল্পসমাজ হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। বলা যায় এভাবে সামনের দিনগুলোতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তিত হয়ে সমাজ নতুন রূপ ধারণ করবে।

বাংলাদেশেও সমাজকাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিবারে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করি। এক সময় আমাদের দেশে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু যেথ পরিবার আস্তে আস্তে একক পরিবারে রুপান্তরিত হচ্ছে। সেই সাথে পরিবারের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর মতামতও গুরুত্ব পাচ্ছে। আগে পরিবারের অর্থনৈতিক দিক দেখাশোনা করত পুরুষরা, এখন পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা নানান পেশায় জড়িত হচ্ছে। আমাদের গার্মেন্টস শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী, তারা প্রাপ্ত উপার্জন দিয়ে পরিবারের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। এ ছাড়াও অফিস আদালত থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। সামজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার কাঠামোর এই পরিবর্তন মূলত সমাজ পরিবর্তনের অংশ।

সমাজ কাঠামোর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, আমাদের দেশে যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর অর্থনীতি রূপান্তরিত হয়ে শিল্পনির্ভর হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯০ সালে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) বা জিডিপিতে কৃষির অবদান ৩৩ শতাংশ থেকে কমে প্রায় ১৩ শতাংশ হয়েছে অন্যদিকে জিডিপিতে শিল্পের অংশ ২১ শতাংশ থেকে বেড়ে প্রায় ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন দল বা প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়েছে, অন্যদিকে শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেইসাথে এখানে নতুন নতুন দল ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়ে চলেছে। তাছাড়া দিনে দিনে বিদেশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ এর প্রভাব পড়েছে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও অন্যান্য কর্মকান্ডে।

আজকাল বিশ্বায়ন শব্দটি খুব শোনা যায়। এতে বোঝানো হয় মানুষ এখন অর্থনৈতিক, রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিশ্বব্যাপী যুক্ত ও নির্ভরশীল। সবরকম গণমাধ্যম, মোবাইল, কম্পিউটার বিশ্বায়নের সহায়ক। পাসপোর্ট-ভিসার বাধা থাকলেও মানুষের বৈশ্বিক যোগাযোগ বেড়েই চলেছে। বিশ্বায়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুততর হচ্ছে। সেইসাথে আমাদের চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আজকের দিনের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হল নিজ দেশের নাগরিক হওয়ার পাশাপাশি তাদের বিশ্বনাগরিক হওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে।

Draft Copy

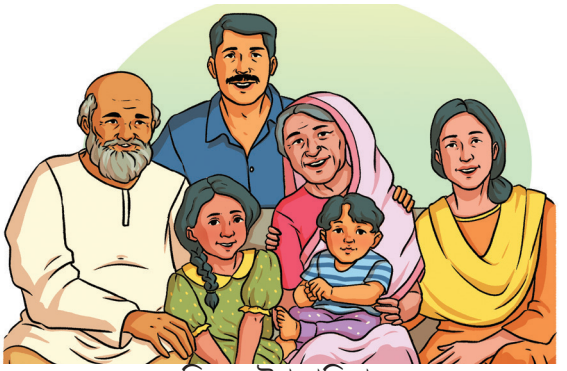

চিত্র: যৌথ পরিবার

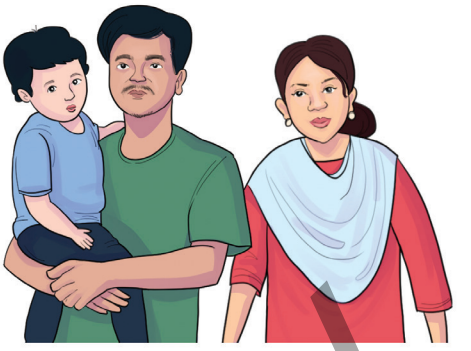

চিত্র: একক পরিবার

অনুশীলনী কাজ ৭:

চলো আমরা সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে রীতিনীতির কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা দলে আলোচনা করে লিখি। এক্ষেত্রে আমরা যৌথ পরিবার ও একক পরিবারের রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আচরণ, নিয়মকানুনে কি কি পরিবর্তন এসেছে তা সনাক্ত করব।

যৌথ পরিবার	একক পরিবার

Draft Copy

সমাজ পরিবর্তনের উপায়

সমাজ নানানভাবে পরিবর্তন হয়। তার মধ্যে উল্লখযোগ্য দুটি ধারণার একটি হল বিবর্তনবাদী ধারণা, অন্যটি হল দ্বান্দ্বিক ধারণা।

জীবজগতের পরিবর্তনের সাথে সমাজ পরিবর্তনের যোগসূত্র আছে বলে মনে করেন কিছু সমাজবিজ্ঞানী। বিবর্তনের মাধ্যমে তারা সমাজ পরিবর্তন হয় বলে মনে করেন। জীবজগৎ যেমন সরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশের মাধ্যমে জটিল রূপ ধারণ করে তেমনি সমাজ ব্যবস্থাও সরল অবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়, তার পরবর্তী পর্যায় হল কৃষি ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা। শিকার ও সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ তুলনামূলকভাবে কৃষি সমাজের চেয়ে সরল ছিল। যেমন শিকার ও সংগ্রহমূলক সমাজে পৃথক শাসকগোষ্ঠী বা রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু কৃষি ভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল অধিকতর জটিল ও বৃহৎ আয়তনের। আবার শিল্পসমাজ ছিল কৃষি সমাজের চেয়ে আরো বেশি জটিল যেখানে বিচিত্র ধরনের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। সমাজের এই কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের ফলে।

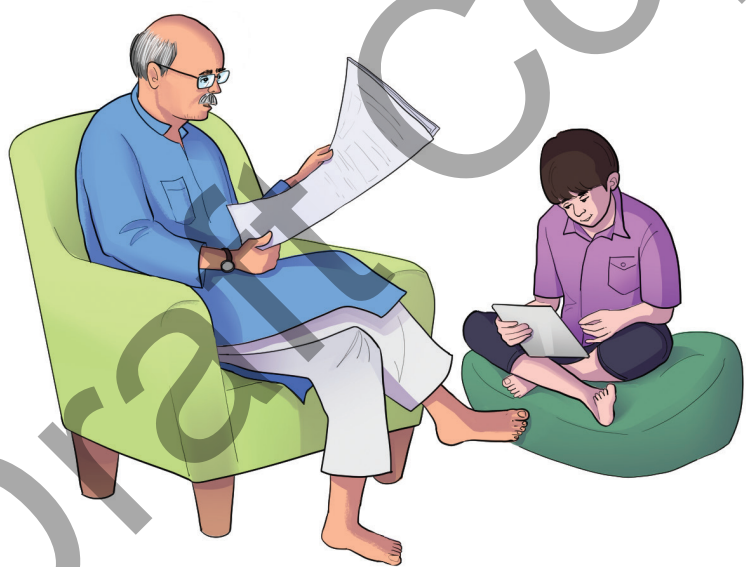

চিত্র: গণমাধ্যম ভূমিকা রাখে সামাজিক পরিবর্তনে

সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কারণ হল দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আন্দোলন-সংগ্রাম। এ মতবাদের অনুসারীরা মনে করেন, সমাজের মানুষ নানান শ্রেণীতে বিভক্ত এবং এ শ্রেণীগুলির মাঝে দ্বন্দ্বের কারণে সমাজের পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতর দ্বন্দ্বের কারণ হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য। দ্বন্দ্বের ফলে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ রূপে ভেঙে পড়ে এবং নতুন সমাজ ব্যবস্থা বিকাশের পথ খুলে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী' এই স্লোগান তুলে তৎকালীন ফ্রান্সের এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষক, শ্রমিক, মজুর শ্রেণীর মানুষেরা বিদ্রোহ গড়ে তোলে। এর ফলে দীর্ঘদিনের

Draft Copy

রাজতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার পথ তৈরি হয়। ফরাসি বিপ্লবের কথা পড়লে তোমরা দেখবে এ বিপ্লব বেশিদিন টেকসই হয়নি। নেপোলিয়নের মাধ্যমে রাজতন্ত্রও ফিরে এসেছিল। কিন্তু বিদ্রোহের মূল বার্তার পরাজয় ঘটেনি। তা দ্রুতই সমাজে সক্রিয়ভাবে ফিরে আসে। এ বিপ্লব কেবল ফ্রান্সে নয়, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষদের প্রেরণা দিয়েছে, প্রভাবিত করেছে। তবে বিদ্রোহ ও সহিংসতাই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র পথ নয়। ইতিহাসে আমরা অহিংস সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের উদাহরণ দেখতে পাই। সেসব আন্দোলনে আমরা ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও যুক্তরাষ্ট্রের মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ারের মত কিছু নেতার অসামান্য অবদান দেখতে পাই।

আমরা অনেকেই হয়তো মীনা কার্টুন দেখেছি। মীনা তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে অনেক সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করেছে। নিজের এলাকার মানুষের অনেক রীতি-নীতি ও অভ্যাস পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে। আমরা মীনার একটি ঘটনার সারসংক্ষেপ সম্পর্কে জেনে নিই।

মীনার পরিচিত বড়বোন তারাবু'র বিয়ে ঠিক করেছে তার বাবা মা। ছেলে শহর থেকে আসা দোকানদারের ভাইয়ের ছেলে। দোকানদার, তার ভাই ও ভাইয়ের ছেলে মিলে ঠিক করলো বিয়েতে যৌতুক নিবে। গ্রামের মানুষ তখনো যৌতুক বন্ধের আইন সম্পর্কে জানে না। তাই তারা পরিকল্পনা করে বিয়ের আগে চাইবে সাইকেল বিয়ের পরে চাইবে মোটর সাইকেল। তাদের এই পরিকল্পনার কথা জেনে যায় মীনার পোষা পাখি মিঠু। মিঠুর কাছ থেকে এটা জেনে মীনা ও রাজু তারাবু ও তার বাবা মার কাছে এই তথ্য দেয়। তারা সবাই মিলে গ্রামের মাতব্বরের কাছে এই বিষয়ে জানতে চায়। মাতব্বর জানায় যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। তাই গ্রামের সবাই মিলে ঠিক করে যৌতুক চায় এমন কোনো ছেলের সাথে তাদের বিয়ের যোগ্য কোনো মেয়েকে বিয়ে দিবে না। যৌতুক না পেয়ে শহর থেকে আসা এই ছেলে বিয়ে না করেই শহরে ফিরে যায়।

চিত্র: মিনা কার্টুন (যৌতুক)

Draft Copy

আমরা একটু চিন্তা করলেই হয়তো বুঝতে পারব সমাজে প্রচলিতযৌতুক প্রথা বন্ধে মীনা গ্রামবাসীর সহায়তায় কীভাবে সফলভাবে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলেছিল। যদিও এটি একটি গল্প। আমরা এমন কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে জেনে নিই যারা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথা পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে।

সামাজিক আন্দোলন

সামাজিক আন্দোলন হল একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের বিদ্যমান সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়। সামাজিক আন্দোলনের উৎপত্তি হয় সমাজে বিদ্যমান কোন অসঙ্গতি বা বৈষম্যের প্রতি অসন্তুষ্টির ফলে। সুতরাং বলা যায় বিদ্যমান সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন, অসঙ্গতি ও অসন্তোষ দূরীকরণ এবং শৃঙ্খলা আনয়নে মানুষের সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাই সামাজিক আন্দোলন।

সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ব্রিটিশ ভারতে রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সতিদাহ প্রথা রোধ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়েছিল। পরবর্তী নারী শিক্ষা বিস্তার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদির পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর নানা প্রান্তে গণতন্ত্র, সুশাসন, মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সামজিক আন্দোলন চলমান রয়েছে।

এ পর্যায়ে আমরা কিছু সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে জানব, যেগুলো বিভিন্ন সময় বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, এবং সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

মার্টিন লুথার কিং এর বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত মানবাধিকার নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার সারা জীবন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও কৃষ্ণাঙ্গদের সমঅধিকার আদায়ে লড়াই করে গেছেন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯৫৫ সালে কিং ব্যাপটিস্ট চার্চের যাজক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর তিনি সরাসরি কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। সে বছরই মন্টগোমারিতে শুরু হয় ঐতিহাসিক বাস ধর্মঘট, যার সূত্রপাত হয় বাসের আসন বরাদ্দকে কেন্দ্র করে। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যেই বাসের সামনের দিকে বসার অধিকার ছিল না কৃষ্ণাঙ্গদের। শ্বেতাঙ্গ যাত্রী উঠলে কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছেড়ে দিতে হতো। কিন্তু এই নিয়ম মানতে অস্বীকার করলেন কৃষ্ণাঙ্গ নারী রোজা পার্কস। যা ছিল তৎকালীন আইনের লঙ্ঘন। রোজাকে থানায় নিয়ে দশ ডলার জরিমানা করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে লুথার কিং ও অন্য কৃষ্ণাঙ্গ ধর্মযাজকেরা বাস সার্ভিস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। টানা ৩৮১ দিন নানা প্রতিকূলতার পরেও কৃষ্ণাঙ্গদের সরকারি বাস বয়কট চলতে থাকলে সুপ্রিম কোর্ট বাসের আসন বন্টনের এই বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করেন। অবশেষে বাসে সবার বসার সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ আন্দোলন ছড়িয়ে পরে গোটা আমেরিকায়। তাঁর এই অহিংস আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসেন বহু কৃষ্ণাঙ্গ নেতা। গোটা আমেরিকা জুড়েই বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জেগে উঠতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় কিং ১৯৬৩ সালে সরকারের নেওয়া বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ঘোষণা করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষ্ণাঙ্গদেরকে শ্বেতাঙ্গদের সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা দিতে হবে এবং শিশুশ্রম বন্ধ করতে হবে।

Draft Copy

চিত্র: মার্টিন লুথার কিং

এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে আলাবামার পুলিশ সমবেত জনতার ওপর দমনমূলক নিপীড়ন চালায়। মার্টিন লুথার কিংসহ আরও অনেকেই সে সময় গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনা বিশ্বজুড়ে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর তিনি স্থির করেন, দেশ জুড়ে শুরু করবেন ফ্রিডম মার্চ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শুরু হয় ওয়াশিংটন অভিমুখে পদযাত্রা। ১৯৬৩ সালে ২৭ আগস্ট ওয়াশিংটনের লিঙ্কন মেমোরিয়ালে সমবেত হয় প্রায় আড়াই লাখের বেশি মানুষ। তাদের সামনে ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন কিং, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে' (আই হ্যাভ আ ড্রিম)। ভাষণে তিনি বলেন, কীভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তিনি তুলে ধরেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তাঁর আশাবাদ। যেখানে সব আমেরিকান হবে সমান। এটাই হবে সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা।

তাঁর স্বপ্নের কিছু দিক এভাবে তিনি উল্লেখ করেন- "বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের বলছি, বর্তমানের প্রতিকূলতা ও বাধা সত্ত্বেও আমি আজও স্বপ্ন দেখি। আমার এই স্বপ্ন আমেরিকান স্বপ্নের গভীরে শিকড়বদ্ধ। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এ জাতি জাগবে এবং তারা বাঁচিয়ে রাখবে এই বিশ্বাস যে আমরা সকল আমেরিকান স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এই সত্যকে গ্রহণ করেছি যে সব মানুষ সমান। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন জর্জিয়ার লাল পাহাড়ে সাবেক দাস আর সাবেক দাস মালিকের সন্তানেরা ভ্রাতৃত্বের এক টেবিলে বসতে সক্ষম হবে। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন মরুময় মিসিসিপি রাজ্য অবিচার আর নিপীড়নের ব্যবস্থা বন্ধ করে মিসিসিপি হয়ে উঠবে মুক্তি আর সুবিচারের মরুদ্যান। আমি স্বপ্ন দেখি, আমার চার সন্তান একদিন এমন এক জাতের মধ্যে বাস করবে যেখানে তাদের চামড়ার রঙ দিয়ে নয়, তাদের চরিত্রের গুণ দিয়ে তারা মূল্যায়িত হবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি। আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন আলাবামা রাজ্যে, যেখানে গভর্নরের ঠোঁট থেকে কেবলই বাধা-নিষেধ আর গঞ্জনার বাণী ঝরে, সেখানকার পরিস্থিতি এমনভাবে বদলে যাবে যে কালো-ধলো যাই হোক বালিকারা বালিকাদের সঙ্গে ভাইবোনের মতো হাত ধরাধরি করবে। আমি আজ এই স্বপ্ন দেখি।" তাঁর এই বিখ্যাত ভাষণের প্রভাবেই কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৬৪ সালে আমেরিকায় নাগরিক অধিকার আইন ও ১৯৬৫ সালে ভোটাধিকার আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই বছর টাইমস পত্রিকা কিংকে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে 'ম্যান অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার দেয়। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য কিং ১৯৬৪ সালে মাত্র ৩৫ বছর বয়সেই শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

মার্টিন লুথার কিং সম্পর্কে দুটি কথা জানা প্রয়োজন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ধারণা তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ মাহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে। দ্বিতীয় কথাটি দু:খের, ১৯৬৮ সালে কিং আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।

Draft Copy

গ্রেটা থুনবার্গের জলবায়ুর জন্য আন্দোলন

২০১৮ সালের ২০ আগস্ট, গ্রেটা থুনবার্গ নামের ১৫ বছরের এক স্কুলছাত্রী তার দেশ সুইডেনের পার্লামেন্টের সামনের রাস্তায় হাতে একটা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বসে পড়ে, তাতে লেখা 'জলবায়ুর জন্য স্কুল ধর্মঘট'। জলবায়ু সংকটের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেয়ার প্রতিবাদে এই কিশোরী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়ে টানা তিন সপ্তাহ সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে বসে থাকে। সে তার এই প্রতিবাদের কথা ইনস্টাগ্রাম ও টুইটারের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে জনমত তৈরি করতে থাকে। কিশোরী গ্রেটার এই আন্দোলন পরে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত বেগে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে জার্মানি, বেলজিয়াম, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও বাংলাদেশসহ ১০৫টি দেশের শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। যা পরবর্তীতে "Fridays For Future" আন্দোলন নামে পরিচিতি পায়।

গ্রেটা থুনবার্গ

জলবায়ু রক্ষায় গ্রেটার এই আন্দোলনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯ সালে টাইম ম্যাগাজিন হয় তাকে নিয়ে প্রচ্ছদ, করে শিরোনাম ছিল "নেক্সট জেনারেশন লিডার" বা পরবর্তী প্রজন্মের নেতা। বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম তরুণ প্রজন্মের উপর গ্রেটার এই প্রভাবকে নাম দিয়েছে 'গ্রেটা থুনবার্গ ইফেক্ট'। বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বক্তৃতা দিয়েছে গ্রেটা।

এর মধ্যে রয়েছে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন এবং জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ২৪ তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে গ্রেটা দীপ্তকণ্ঠে বলেন, "শুধু মাত্র ধনীদের আরাম আয়েশে দিন কাটানোর সুযোগ করে দিতে

Draft Copy

আমাদের জলবায়ুর ক্ষতি করা হচ্ছে। অনেকে মিলে অল্প কয়েকজনের বিলাসিতার খেসারত দিচ্ছে। আমি এখানে এসেছি সবাইকে জানিয়ে দিতে যে, সব কিছু বদলানো প্রয়োজন এবং আজ থেকে এই বদলানোর প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। বিশ্ববাসী জেগে উঠেছে। আর আপনাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক পরিবর্তন আসবেই।" গ্রেটার এই আন্দোলনের ফলও কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জার্মান সরকার গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে ৫৪ বিলিয়ন ডলার অনুদান বরাদ্দের প্রতিজ্ঞা করেছে। অন্যান্য দেশও কার্বন নি:সরণ কমানোর জন্য নানান উদ্যোগ নিয়েছে।

উপরের পাঠ থেকে আমরা বুঝতে পারছি সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন হলে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন হয়। তাই প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, নিয়মকানুন ও সামাজিক কাঠামো একে অপরকে প্রভাবিত করে।

অনুশীলনী কাজ: ৮

এখন আমরা আমাদের সংগঠনের সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মার্টিন লুথার কিং ও গ্রেটা থুনবার্গের মতো করে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি। আমরা সবাই মিলে প্লে-কার্ড বা পোস্টার পেপারে সচেতনতামূলক কিছু লিখে আমার এলাকার মানুষের কাছে কিছু বার্তা পৌঁছাব।

সংগঠনের মাধ্যমে আমাদের পূর্ব পরিকল্পিত সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করি। বাস্তবায়ন শেষে আমরা সবাই আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে জমা দিব।

Draft Copy

প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির ভূমিকা

অনুসন্ধানী কাজ: ১

আমরা এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে আমাদের এলাকার পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইব। কয়েটি নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হল। দলগতভাবে আমরা প্রশ্ন নির্ধারণ করে জিজ্ঞেস করব।

নমুনা প্রশ্ন:

১. এলাকার পারিবারিক কাঠামো আগে কেমন ছিল?

২. এলাকার পারিবারিক কাঠামো এখন কেমন?

৩. যদি কোনো পরিবর্তন হয়ে থাকে, পরিবর্তনের কারণগুলো কি কি?

৪.

.....

.....

.....

.....

এলাকার বয়স্কদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে নিচের চার্টটি পূরণ করি।

এলাকার কি কি পরিবর্তন হয়েছে	কেনো এই পরিবর্তন হয়েছে
পরিবার	
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	

Draft Copy

তোমরা অনেকেই হয়ত দেখেছ সকাল বেলা মহিলারা দলে দলে কোথাও যাচ্ছেন। তাদের প্রায় সবার হাতেই একটি পুঁটলি, তাতে দুপুরের খাবার আছে। এঁরা হলেন গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মী। যারা নিজের চোখে দেখনি তারাও নিশ্চয় পত্র-পত্রিকায়, টেলিভিশনে তাঁদের দেখেছ। কেউ কেউ কারখানার ভিতরে তাঁদের ব্যস্ততা দেখেছ সেলাই মেশিনে, কাটিংয়ে, ইস্ত্রি বা অন্য কাজে।

তোমরা কি জান দেশে কত নারী গার্মেন্টস কর্মী আছেন? বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, এঁদের সংখ্যা মোটামুটি পঞ্চাশ লক্ষ বা অর্ধকোটির মত হবে। এঁরা প্রায় সকলেই গ্রামের মহিলা - কেউ ছিলেন ঘরের বউ, কেউ বাড়ির মেয়ে, কেউবা বিধবা, কেউবা স্বামী পরিত্যক্ত হয়ে কষ্টে থাকতেন। অনেকেই ছিলেন গৃহকর্মী, কেউ চাষবাস ও অন্য কাজ করতেন। গ্রামীণ সমাজের নানা সংস্কারে তাদের জীবন কাটত গতানুগতিক পথে। এখন এঁরা শহরে বাস করেন। এঁদের পরিশ্রমে বাংলাদেশে এই নতুন শিল্প গড়ে উঠেছে স্বাধীনতার কিছু পরে। তোমরা কি জান, আজ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সবচেয়ে বড় খাত হল তৈরি পোশাক! এর পরিমাণ বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার বা চার হাজার কোটি টাকা। পৃথিবীর উন্নত বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক এখন জনপ্রিয় পণ্য।

এককালে আমাদের প্রধান রপ্তানি পণ্য কী ছিল জান? পাট- এর অপর নাম ছিল সোনালি আঁশ। দেখতেও সোনালি আবার মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতো বলে এতো ছিল সোনার মত দামি। কৃত্রিম আঁশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে এর কদর কমেছে। তবে বর্তমানে পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে মানুষকে আবার কৃত্রিম আঁশ ছেড়ে পাটের মত প্রাকৃতিক আঁশের ব্যবহারে ফিরতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

আচ্ছা কেউ কি বলতে পার আজকাল বাংলাদেশের নারীরা আরও কি কি ধরনের কাজ করছেন? একটু ভাবলেই কিন্তু বলতে পারবে। নারীরা স্বল্প অল্প ঋণ নিয়ে ছোটখাট ব্যবসা চালাচ্ছেন এবং উপার্জন করছেন। কেউ বা হাঁস-মুরগি পালছেন, কেউ ছাগল পালেন, কেউবা ফুলের চাষ করেন, কেউ মৌমাছি লালন করে মধু তৈরি করেন, কেউ খৈ-মুড়ি ভেজে বাজারে বিক্রি করেন। এমনি আরও নানান কাজে তাঁরা টাকা খাটিয়ে উপার্জন করছেন। প্রথমে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এভাবে ঋণ দিয়েছে। একে বলা হয় ক্ষুদ্র ঋণ। বেশির ভাগ ঋণ নারীদেরই দেওয়া হয়। বর্তমানে সরকারি ব্যাংক ও সংস্থা থেকেও নারীরা এরকম ঋণ পাচ্ছেন। এঁরা হলেন ছোট উদ্যোক্তা। এভাবে পুঁজি খাটিয়ে অর্থাৎ কোনো ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করে তাঁরা ঋণ পরিশোধ করেন এবং নিজেদের সংসারেরও উন্নতি ঘটান। সংসারে নারীর উপার্জন যুক্ত হওয়ায় সন্তানদের পুষ্টি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। একইভাবে পরিবারের বয়স্কজনদের জন্যেও পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা সহজ হচ্ছে। আর এভাবে পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীরা অংশ নিচ্ছেন, পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব ও মর্যাদাও বাড়ছে।

তবে মনে রেখো অনেকে ঋণ নিয়ে ঘর সংস্কার কিংবা ছেলে বা মেয়ের বিয়েতে সবটা টাকা একবারে খরচ করে বিপদে পড়ে যান। ঋণ তো শোধ করতেই হবে। অথচ ঋণের টাকা ব্যবসায়ে না খাটানোয় তার তো কোনো উপার্জন হচ্ছে না। ফলে এভাবে চিন্তাভাবনা না করে ঋণের টাকা খরচ করে অনেকে আরও দরিদ্র হয়ে পড়েন। তাই আগের ঋণের টাকাটা ব্যবসায়ে খাটাতে হবে। তা থেকে উপার্জন হলে তখন বুদ্ধি করে খরচ করতে ও টাকা জমাতে হবে। সেভাবেই সংসারের খরচ মিটিয়ে এক সময় টাকা জমানো যাবে। তা যেমন ব্যবসায়ে খাটানো যাবে তেমনি সংসারের বড় খরচ মেটাতেও লাগানো যাবে। মোটের ওপর ঋণ নিয়ে আমাদের দেশে অধিকাংশ নারীই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সফল হচ্ছেন।

Draft Copy

আমাদের নিম্নবিত্ত ঘরের মেয়েরা দেশে নির্মাণ শিল্পেও কাজ করছেন। অনেকে এমনকি বিদেশেও কাজ করতে যাচ্ছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছেন - যেমন ট্রেন চালাচ্ছেন, চুল ছাঁটছেন, রূপসজ্জার কাজ করছেন, টুপি বানাচ্ছেন, কম্বল বা কাঁথা সেলাই করছেন ইত্যাদি। কেবল সমাজের নিম্নবর্গের মেয়েরাই নয় সর্বস্তরের নারীরাই আজ কর্মজগতে অংশ নিচ্ছেন।

অনুশীলনী কাজ: ১

চলো বিভিন্ন উচ্চপদে নারীদের অংশগ্রহণের তথ্য জেনে একটা তালিকা তৈরি করে নেই। (শিক্ষার্থীরা বই, ব্যক্তি বা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে)। তারপর নিচের ছকের মত তালিকা তৈরি করবে :

পদ	কত জন আছেন
বিচারপতি	
সচিব	
উপাচার্য	
জেলা প্রশাসক	
পুলিশ সুপার	
রাষ্ট্রদূত	
পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা	
আন্তর্জাতিক সংস্থার পদস্থ কর্মকর্তা	
গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পদ	
উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী	

এভাবে তালিকা আরও দীর্ঘ হবে।

তোমরা কি খেয়াল করেছ পুলিশে, সেনা বাহিনীতে, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীতেও মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এমনকি জাতিসঙ্ঘের শান্তি রক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবেও অনেক মেয়ে বিশ্বের বিভিন্ন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে কাজ করছেন। তাঁরাও দেশের জন্যে গৌরব বয়ে আনছেন।

বলা যায় আজ পুরুষের পাশাপাশি নারীরা কর্মজগতে প্রবেশ করতে শুরু করেছেন। পরিবারে উপার্জনশীল নারীর কেবল মর্যাদা বাড়ে না তাঁদের ভূমিকার গুরুত্বও বাড়ে। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিচ্ছেন। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় একে নারীর ক্ষমতায়ন বলা হয়।

Draft Copy

অনুশীলনী কাজ: ২

আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে ক্ষমতায়নের ফলে নারীর ভূমিকায় কি কি পরিবর্তন আসতে পারে নিচের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী তার একটি তালিকা করি -

দল ক - ক্ষমতায়িত নারীর পারিবারিক ভূমিকায় পরিবর্তন।

দল খ - ব্যক্তিগত ভূমিকায় পরিবর্তন (যেমন কেনাকাটা, সাজসজ্জা, চলাচল ইত্যাদি)

দল গ - দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন (যেমন কারখানার মিশ্র সহকর্মীর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক, মেয়েদের শিক্ষা, সামাজিক প্রথা পালন ইত্যাদি)

দল ঘ - বৃহত্তর পরিসরে মতামত গঠন (যেমন রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, নারী সংগঠন, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইস্যুতে নিজের অবস্থান নির্ধারণ ইত্যাদি)

এরকম আরও বিষয় আলোচনার মাধ্যমে তৈরি করে নিতে পার।

এসব বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক হতে পারে। সব বিষয়ে সবাই এক মত না হলেও পারিবারিক সামাজিক কাঠামোর বিশাল পরিবর্তন নিশ্চয় সবার নজরে পড়বে।

পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের একটি কবিতা ছোটবেলায় সবাই পড়েছ। প্রথম দুটি পংক্তি বললেই মনে পড়ে যাবে

“রাখাল ছেলে! রাখাল ছেলে! বারেক ফিরে চাও, বাঁকা গাঁয়ের পথটি বেয়ে কোথায় চলে যাও?”

এ কবিতার প্রসঙ্গ আসার আগেই একটি প্রশ্ন করি। ইদানীং গ্রামের জীবনে আরও অনেক ধরনের পরিবর্তন কি লক্ষ্য করছ তোমরা? করছ না? একটু খেয়াল করে ক্ষেতে বা লোকালয়ে তাকালে দেখবে অনেক পরিবর্তন। গরু দিয়ে লাঙলের চাষ কমে এসেছে। বেশির ভাগ ক্ষেতে চাষের কাজে ব্যবহার করা হয় টিলার ও ট্রাক্টর। এতে দ্রুত চাষ হয়। তাতে চূড়ান্ত বিচারে খরচ কম পড়ে। মানুষ এবং পশুর প্রচন্ড- পরিশ্রমও আর প্রয়োজন হয় না। কাজের ধরন পাল্টেছে। ধান কাটা ও মাড়াইয়ের কাজেও ধীরে ধীরে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। কাস্তে নিয়ে রোদে-জলে পুড়ে আর ধান কাটতে হবে না। এ যন্ত্রের নাম কম্বাইন্ড- হারভেস্টার। এভাবে কৃষি কাজে অনেক যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন বেড়েছে তেমনি বাড়ছে সেচ, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। ক্ষেত মজুরদের কাজ কমে যাওয়ায় - তারা ধীরে ধীরে রিক্সা চালানো, নির্মাণ কাজ, ফেরিওয়ালার কাজ ইত্যাদি নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। আগের তুলনায় জমিতে যেমন ফসলের পরিমাণ বাড়ছে, বছরে এক ফসলের বদলে তিন ফসল হচ্ছে তেমনি উৎপাদিত পণ্যেরও বৈচিত্র্য বেড়েছে। আজ বাংলাদেশ শাকসব্জী, বিভিন্ন ফল, মাছ, ডিম ইত্যাদি চাষ ও উৎপাদনে বিশ্বের অগ্রণী দেশের মধ্যে একটি। এসবের সরবরাহ ও বিপণন ঘিরেও অনেক কাজ তৈরি হচ্ছে। বলা যায় গ্রামের মানুষ আর আগের মত কেবল কৃষিকাজ বা ধানচাষই করে না, তাদর চাষ যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি কাজেরও ধরণ বিচিত্র রকম হয়েছে।

ঐ যে বলেছিলাম জসীম উদ্দীনের কবিতার কথা। সেই রাখাল বালকরা এখন হারিয়ে যাচ্ছে। খামারে যেভাবে গরু লালন করা হয় তাতে আর মাঠে মাঠে চারণের কাজ নেই। বাঁশি বাজিয়ে গরু চরিয়ে কেউ আর জীবন

Draft Copy

কাটাচ্ছে না। তোমাদের মত কিশোররা এখন লেখাপড়া করছে। যদিও অনেকে এখনও কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশে এখনও প্রায় ত্রিশ লাখ শিশু শ্রমিক রয়েছে। সরকার অবশ্য তাদেরও পড়ালেখার মধ্যে নিয়ে আসার কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে।

একবার ভেবে দ্যাখ তো স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের গ্রামীণ সমাজে কত ধরনের পরিবর্তন এসেছে? দলে ভাগ হয়ে তোমরা অনুসন্ধান চালিয়ে, বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আগেকার গ্রামীণ ও বর্তমান গ্রামীণ সমাজের ভিন্নতার চিত্র তৈরি করবে।

তোমরা তো জানই যে, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী - যিনি হলেন সরকার প্রধান - একজন নারী। সপ্তম শ্রেণির বইতে তোমরা দেখেছ জাতীয় সংসদের স্পিকারও একজন নারী। শিক্ষামন্ত্রী নারী, এমনকি শ্রমমন্ত্রীও নারী। এছাড়া সংসদের উপনেতাও একজন নারী।

কেউ কেউ নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, উপজেলা পরিষদে নারী ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে নারীরা সদস্য নির্বাচিত হন। একইভাবে শহরের কর্পোরেশনগুলোতেও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

দেখা যাচ্ছে সামাজিক কাঠামোতে যেমন পরিবর্তন ঘটে, তেমনি রাজনৈতিক কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটে। নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের মতই রাজনৈতিক অঙ্গনেও পরিবর্তন ঘটছে। এটি অবশ্য পরিবর্তনের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।

অনুশীলনী কাজ: ৩

এবার শিক্ষকের সহায়তা নিয়ে আমরা এ দুই ক্ষেত্রে পরিবর্তনের আরও আরও কারণ খুঁজে বের করতে পারি। আমরা তো জানি পরিবারের বয়স্কজনদের সঙ্গে আলাপ করলে অনেক পুরোনো তথ্য পাওয়া যাবে।

গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনের চিত্র

ক্ষেত্র	পূর্ববর্তী অবস্থা	বর্তমান পরিবর্তন
নারীর অংশগ্রহণ		
প্রতিনিধিত্বের ধরণ		
ভূমিকা		
অবদান		
রাষ্ট্রীয়/সামাজিক স্বীকৃতি		
গ্রহণযোগ্যতা		

Draft Copy

এত কথা শুনতে শুনতে তোমাদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে নিজেরাই সরকারের কিছু দায়িত্ব পালন করলে কেমন হয়। ভূমিকা অভিনয় করে তোমরা একটা কাজ করতে পার।

রাষ্ট্রের ধারণা

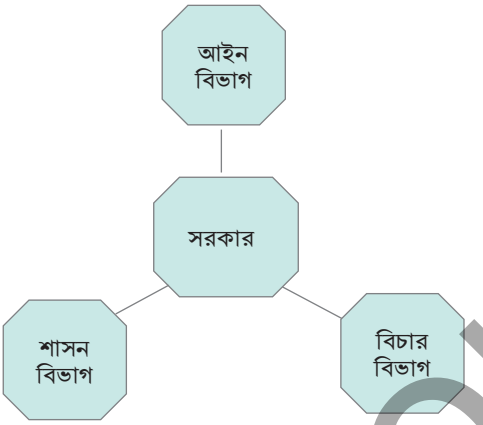

তোমরা পূর্বের শ্রেণিতে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছো।

রাষ্ট্রের ধারণা দিতে গিয়ে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, " রাষ্ট্র হলো বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যারা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে,যা বহির্শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সুগঠিত সরকার আছে, যে সরকারের প্রতি ঐ জনসমাজ স্বভাবতই অনুগত"।

তবে রাষ্ট্র এবং সরকার সম্পর্কে তোমরা ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে বিস্তারিত জেনেছ। সে তথ্যগুলো মনে রেখো, ভালো হয় আরেকবার দেখে নিলে।

এবারে আমরা জানব বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি।

১৯৭২ সনে গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানে ৪টি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে - জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। এগুলো এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. জাতীয়তাবাদ- একই ধরনের ভাষা ও সংস্কৃতি বাঙালি জাতির মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য সৃষ্টি করেছে। তাই সংবিধানে বলা হয়েছে, একই ভাষা ও সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যে ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে সেই ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

২. সমাজতন্ত্র- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমতা আনার মাধ্যমে সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। শোষণমুক্ত,ন্যায়ভিত্তিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. গণতন্ত্র- রাষ্ট্রের সকল কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি। এর মাধ্যমে নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে; মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৪. ধর্মনির্পেক্ষতা- রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে এবং ধর্ম পালনে কেউ কাউকে বাধা প্রদান করবে না - এই লক্ষ্য সামনে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

Draft Copy

তবে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরে সংবিধানের মূল নীতিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যায় যদিও সব ধর্মের সব অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল তবুও তৎকালীন সরকার সংবিধান পরিবর্তন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। তখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়, যদিও বহু ধর্মের মানুষের দেশে রাষ্ট্রের এরকম ধর্মীয় পরিচয় হতে পারে কিনা অনেকেই সে প্রশ্ন তোলেন। এছাড়া সমাজতন্ত্রের বদলে সামাজিক সুবিচারের কথা বলা হয়। এ সময় নাগরিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশি কথাটিও যোগ করা হয়। আরও পরে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয় রাষ্ট্র।

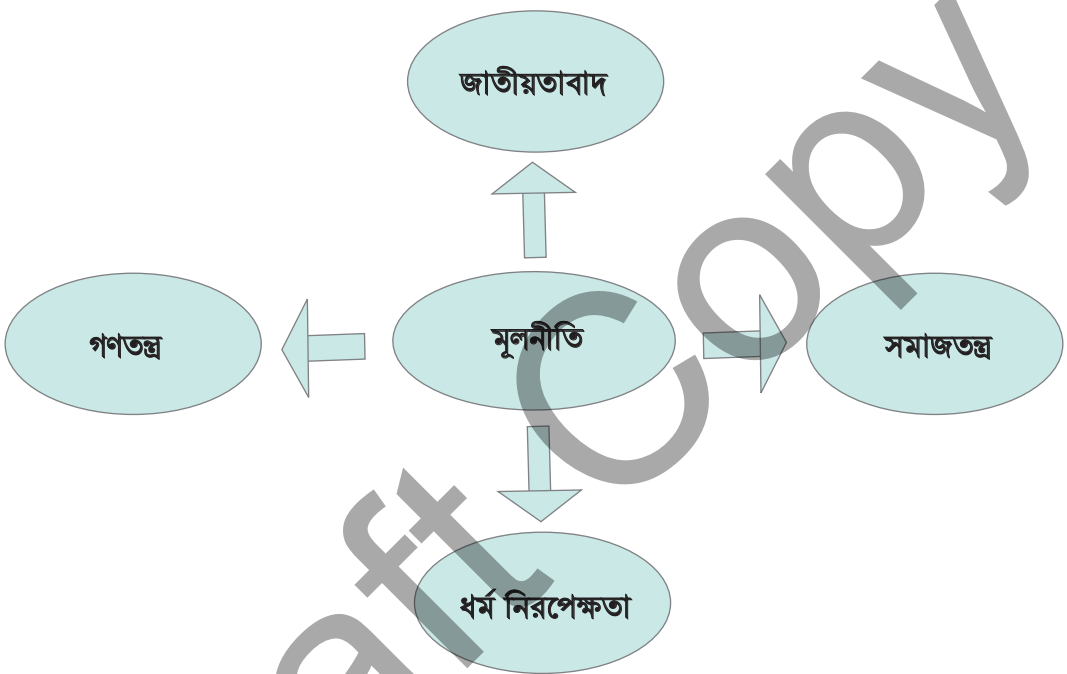

উল্লেখিত মূলনীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা সরকারের সকল অঙ্গের দায়িত্ব। প্রতিটি নাগরিকেরও দায়িত্ব হল এগুলো মেনে চলা।

অনুশীলনী কাজ: ৪

বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি অনুসারে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যগুলো দলে আলোচনা করে লিখি। প্রয়োজনে বই, ইন্টারনেট বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।

Draft Copy

অধিকার	কর্তব্য
১. ২. ৩. ৪. ৫.	১. ২. ৩. ৪. ৫.

এত কথা শুনতে শুনতে তোমাদের নিশ্চয় মনে হচ্ছে নিজেরাই সরকারের কিছু দায়িত্ব পালন করলে কেমন হয়। ভূমিকা অভিনয় করে তোমরা একটা কাজ করতে পার।

আমাদের ভাবনা

ঋতিকা,বর্ষা,সারা ,জাহিদ ও জুনায়েদ পাঁচ বন্ধু। তারা শৈশব থেকে এক সাথে পড়ালেখা করছে। ওরা এখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ছে। করোনা পরবর্তী সময়ে প্রতিনিয়ত কিছু বিষয় তাদের ভাবাচ্ছে। তাদের মনে হচ্ছে সমাজের সবাই কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। সবাই যেন কোনো এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বর্ষা বলল, চল আমরাই কিছু একটা করি। একেকজন একেক দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করার সিদ্ধান্ত নিল। ঋতিকার পরামর্শে একটা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করল এবং একেকজন একেক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিল। মন্ত্রণালয়গুলো হলো- কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পরিবেশ মন্ত্রণালয়, প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করে পাঁচ বন্ধু মিলে নতুন কার্যক্রম শুরু করলো। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদাভাবে এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো তুলে আনলো এবং সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সমস্যা গুলো সমাধানের পরামর্শ দিল।

এখন থেকে ঋত্বিকার ভাবনার ক্ষেত্র হল বেকার সমস্যার ও তার সমাধান, দায়িত্ব পেল কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের; বর্ষার ভাবনার ক্ষেত্র হল পরিবেশ দূষণের কারণ ও এর সমাধান, দায়িত্ব পেল পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের; সারার ভাবনার ক্ষেত্র হল প্রযুক্তির অপব্যবহার চিহ্নিত করা এবং এর সমাধান, দায়িত্ব পেল প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের; জাহিদের ভাবনার ক্ষেত্র হল মূল্যবোধের অবক্ষয় চিহ্নিত করা ও এর সমাধান, দায়িত্ব পেল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের; জুনাইদের ভাবনার ক্ষেত্র হল অপরিকল্পিত নগরায়নের সমস্যা ও সমাধান, দায়িত্ব পেল গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

Draft Copy

ছক -১

মন্ত্রণালয়ের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী	প্রাপ্ত তথ্য (সমস্যা)	সমাধানের সুপারিশ
কর্মসংস্থান	ঋত্বিকা		
পরিবেশ	বর্ষা		
প্রযুক্তি	সারা		
ধর্ম	জাহিদ		
গণপূর্ত	জুনাইদ		

তারা এখন নিজেদের ভাবনার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের নাম সম্বলিত প্লে কার্ড তৈরি করে সেগুলো নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে শ্রেণি শিক্ষক ও অন্যান্য সহপাঠীদের দেখালো। এরপর ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বগুলো দেখালো। সবাই দেখলো সমাজ নিয়ে তাদের ভাবনাগুলো ইতিবাচক সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান।

ছক-২

	অবস্থান	মূল ভূমিকা	পরিবর্তিত ভূমিকা
ঋত্বিকা			
বর্ষা			
সারা			
জাহিদ			
জুনাইদ			

Draft Copy

অনুশীলনী কাজ: ৫

এখন আমরাও পাঁচ বন্ধুর মতো বর্তমান সমাজকে বিবেচনায় নিয়ে নিজের অবস্থান ও ভূমিকার একেকটি পরিকল্পনার মডেল তৈরি করি। মডেল তৈরি শেষে দলীয়ভাবে উপস্থাপন করব। সমাজের সমস্যা চিহ্নিত করে ইতিবাচক সমাজ বিনির্মাণে নিজেদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করব।

আমরা জানি খুঁটি বা পিলার ছাড়া যেমন ঘর বা দালান (বিল্ডিং) তৈরি করা যায় না। তেমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছাড়া রাষ্ট্র ও গঠিত হয় না। আমরা এখন রাষ্ট্রের পরিচয় এবং রাষ্ট্রের উপাদানগুলোর নাম জানবো।

অনুসন্ধানী পাঠ

সংবিধানের প্রকারভেদ

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের দর্পণস্বরূপ। সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তাদের এই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সংবিধান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। যেকারণে সংবিধানকে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) প্রকৃতি অনুসারেঃ সকল সংবিধানের প্রকৃতি এক নয়, সংবিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. লিখিত সংবিধান ২. অলিখিত সংবিধান

খ) সংশোধন পদ্ধতি অনুসারেঃ সকল সংবিধানকে একই পদ্ধতিতে সংশোধন করা যায় না । সংবিধান সংশোধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। লর্ড ব্রাইস-এর মতে, সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান ২. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

গ) মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসারে কার্ল মার্কস রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সংবিধানকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র ২. শ্রমিক শ্রেণির শাসনতন্ত্র

এ সকল সংবিধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে আলোচিত হলো:

১. লিখিত সংবিধান

সাধারণত যে সংবিধান লিখিত অবস্থায় থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ যে আইনগত দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তা-ই লিখিত সংবিধান।

অধ্যাপক গেটেল-এর মতে, "যখন কোনো দলিলে সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার সকল মৌলিক নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত

Draft Copy

থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে"।

কে সি হুইয়ার বলেন, "লিখিত সংবিধান সেসব লিখিত নিয়মের সমষ্টি যা কী উদ্দেশ্যে ও সরকারের বিভাগসমূহের মধ্যে কীভাবে ক্ষমতা পরিচালিত হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে"।

ড.গার্নার-এর মতে, "লিখিত সংবিধান সাধারণত এমন এক বিশেষ কৌশল যা উচ্চতর আইনগত কর্তৃপক্ষ স্বীকৃত ও যা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনযোগ্য"।

সুতরাং লিখিত সংবিধান বলতে এমন এক লিখিত দলিলকে বোঝায়, যাতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতি-বিধানসমূহ লিপিবদ্ধ থাকে। যেমন- বাংলাদেশ, ভারত,যুক্তরাষ্ট্র,রাশিয়া প্রভৃতিসহ বিশ্বের প্রায় সব দেশেরই সংবিধান লিখিত। এরূপ সংবিধান রচিত হয় দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ও প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদদের মাধ্যমে এবং তা কোনো গণপরিষদ বা সম্মেলন কর্তৃক প্রণীত, ঘোষিত ও স্বীকৃত।

২. অলিখিত সংবিধান

সাধারণত কোনো দেশের শাসন পরিচালনার মৌল নীতিগুলো যখন প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতিসমূহ কোনো দলিলে লিপিবদ্ধ না থেকে বরং বিভিন্ন প্রথা, লোকাচার, রীতিনীতি ও আদালতের রায় বা বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে নিহিত থাকে তাই হল অলিখিত সংবিধান। কাগজে-কলমে লিখিত না থাকলেও লিখিত সংবিধানের মতোই সরকার এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

অধ্যাপক ফাইনার বলেন, "যেখানে আইন প্রণেতারা সংবিধানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন নি এবং এর ফলে সাংবিধানিক আইনকে অন্য প্রকার আইন থেকে পৃথক করা যায় না, তাকে অলিখিত সংবিধান বলে"।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ভিত্তিতে অলিখিত সংবিধান গড়ে ওঠে। এরূপ সংবিধানের একমাত্র প্রচলিত উদাহরণ হচ্ছে ব্রিটেনের (যুক্তরাজ্য) সংবিধান। মনীষী Ivor Jennings- এর মতে, "সংবিধান বলতে যদি লিখিত দলিলকে না বুঝিয়ে কোনো সংস্থাকে বোঝানো হয়, তবে বলতেই হবে যে ব্রিটিশ সংবিধানের উদ্ভব আপোসে হয়েছে, এর কোনো দলিল নেই"।

৩. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান

সংবিধানের একটি বিশেষ রূপ হচ্ছে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এটি সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে বিন্যস্ত। লর্ড ব্রাইস এ সংবিধানের অন্যতম সমর্থক। সাধারণত যে সংবিধান সংশোধনে আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সংশোধন বা পরিবর্তন সাধন করতে পারে তাকে সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয় সংবিধান বলে। অর্থাৎ বিশেষ কোনো পদ্ধতি ছাড়াই সাধারণ আইন পাসের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে যে সংবিধান সংশোধিত হয় তাই সুপরিবর্তনীয় সংবিধান।

এ সংবিধানে সাধারণ ও শাসনতান্ত্রিক আইন অনেকটা সমপর্যায়ভুক্ত। যুক্তরাজ্য ও নিউজিল্যান্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Draft Copy

৪. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান

যে সংবিধান সংশোধনে বিশেষ কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন, তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলে। অর্থাৎ যে সংবিধান সংশোধনে দেশের সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না, স্বতন্ত্র বা জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তাই দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিমার্জনে বিশেষ যে নিয়ম থাকে তা সাধারণ আইন প্রণয়নের তুলনায় পৃথক ও জটিল। সাধারণত এর জন্যে সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি প্রয়োজন হয়। এছাড়াও সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনেও বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। বিশ্বের প্রায় দেশেরই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও বাংলাদেশের সংবিধান।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক দার্শনিক কার্ল মার্ক্স পুঁজিবাদী দেশের গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুর্জুয়া ব্যবস্থা আখ্যা দিয়েছিলেন। এর বিপরীতে তিনি শ্রমিক শ্রেণির শাসনব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, যার দৃষ্টান্ত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রচলিত ছিল। এ জটিল বিষয়টি তোমরা বড় হলে জানবে। তবে আপাতত ছোট্ট করে বুর্জুয়া কাকে বলে তা জেনে নিতে পার।

বুর্জুয়া শব্দটি তোমরা কেউ কেউ শুনেছ আগে। মূল ফরাসি শব্দটির অর্থ নগরবাসী। কিন্তু পরবর্তী কালে এর ব্যবহারিক অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে। শ্রেণিগতভাবে সম্পদশালী উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরাই বুর্জুয়া বলে গণ্য হন। তবে শব্দটি রাজনৈতিক অঙ্গনে আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের স্বার্থসচেতন ব্যক্তিদেরই বোঝায়। এতে নেতিবাচক মনোভাব প্রকাশ পায়।

সংবিধানের ধরণ	উদাহরণ
লিখিত সংবিধান	
অলিখিত সংবিধান	
সুপরিবর্তনীয়	
দুষ্পরিবর্তনীয়	

Draft Copy

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রূপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করবো।

বাংলা অঞ্চল এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ আমরা কিছুটা অনুসন্ধান করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, স্থান ও কাল ভেদে মানুষ নানান বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা নিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন করেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি, আর সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। আবার অনেক উপাদান সময়ের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে। এর ফলে সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় এসেছে নানান পরিবর্তন ও বিবর্তন। তৈরি হয়েছে নানান ধরনের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব। এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয় তার ফলে সেই সমাজের মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকাতেও আসে নানান পরিবর্তন।

আদি যুগে মানুষ যখন চাষাবাদ জানতো না, তখন তার অবস্থান ও ভূমিকা ছিল এক রকম। মানুষ যখন ধীরে ধীরে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে স্থায়ী ও সুসংহত সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সভ্যতার বিকাশ ঘটায় তখন তার অবস্থান এবং ভূমিকাতেও আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

আদি মানুষ শিকার ও সংগ্রহ জীবন থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে কৃষির উদ্ভাবন করে স্থায়ী বসতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে তা আমরা ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্রেণির অধ্যায়গুলোতে অনুসন্ধান করে দেখেছি। কৃষি আবিষ্কারের পরই মূলত মানুষ ধীরে ধীরে বাণিজ্য ও শিল্পের উদ্ভাবন ঘটায় এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। প্রাচীন মিশর, ইরাক, গ্রিস, ভারত, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে গড়ে উঠা নগর সভ্যতাগুলোতেই প্রথম বহুমাত্রিক সমাজ জীবনের সূচনা হয় কেননা এই নগরগুলোতে একইসঙ্গে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের মিলন ঘটেছিল। শ্রেণি এবং ক্ষমতার ধরণ অনুযায়ী মানুষ ভোগ করতো আলাদা আলাদা সুযোগ-সুবিধা। সমাজে তাই বিদ্যমান ছিল নানান ভিন্নতা আর অসমতা। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য নির্মাণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা সহ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সভ্যতাগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের ধারা অবলম্বন করেছিল।

মূল পাঠে যাওয়ার আগে, চলো, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে দুইটি ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ধারার সমাজে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হতে পারে সেই বিষয়ে একটি আলোচনা করি। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই আলোচনা পর্বটি আমরা কার্যকর করতে পারি। আলোচনার শেষে নিচের ছকটি পূরণ করি-

Draft Copy

শিকার ও সংগ্রহ যুগে একজন মানুষের কীভাবে জীবন যাপন করতো	২০২৪ সনে যেকোন শহরে বসবাস করে এমন একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করছে

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

মিশরীয় সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বদিকে নীলনদের তীরে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সভ্যতাটির উদ্ভব হয়। প্রাচীন নগরভিত্তিক সমাজ কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গিয়েছিল মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থায়।

মিশরীয় সমাজে মানুষ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণিতে অবস্থান করতো- ফারাও বা শাসকগণ, অভিজাত অমাত্যগণ, পুরোহিত, বিত্তবান ভূমি মালিকেরা। দ্বিতীয় শেণিতে অবস্থান করতো- বণিক, কারিগর, শ্রমশিল্পী সহ বিভিন্ন স্বাধীন পেশার মানুষেরা। যে কৃষিকে কেন্দ্র করে সভ্যতার অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল, সেই কৃষকেরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মিশরে অধিকাংশ কৃষকের নিজের জমি ছিল না। কৃষকেরা তাই ভূমিদাস হিসেবে বিত্তবান ভূমি-মালিকদের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। প্রাচীন মিশরীয় সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করতেন রাজা, পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা। রাজাকে সেখানে বলা হতো ফারাও। সমাজ ব্যবস্থার একেবারে উপরে অবস্থান করতেন ফারাওগণ। ফারাও এবং পুরোহিতদের হাত ধরেই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হতো। ফারাওগণ যখন বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধযাত্রা করতেন, পরাজিত মানুষদের বন্দী করে নিয়ে আসতেন। যুদ্ধবন্দী মানুষদের দাস হিসেবে নানান শ্রমক্ষেত্রে কাজে লাগানো হতো। বাজারে

Draft Copy

বিক্রিও করা হতো। যুদ্ধবন্দী ছাড়াও মিশরে নানানভাবে দাস বানানোর কৌশল চালু ছিল। মিশরীয় নগরগুলোর অভিজাত এলাকায় বিশালাকৃতির প্রাসাদে বাস করতেন উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির নাগরিকেরা। অথচ কৃষক ও দাসদের জায়গা হয়েছিল অত্যন্ত অনুন্নত এলাকায় কাদামাটির ঘর আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। দাসদের তুলনায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা একটুখানি ভালো হলেও সামাজিক মর্যাদা বা স্বচ্ছলতায় এই দুই শ্রেণির মানুষই ছিল সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত।

মিসরীয় সভ্যতায় কীভাবে মমি তৈরি করা হতো, আর কেনই বা এই মমি এত দিন ধরে টিকে আছে- তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন গবেষণা করে চলেছেন। অনেক মমি পাওয়া গেছে। তবে এসব মমির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে ফারাও তুতেনখামেন বা রাজা তুতের মমি। তিনি মাত্র ৯ বছর বয়সে ফারাও হন প্রাক সাধারণ ১৪৩৩ অব্দে আর রাজত্ব করেন ১৪২৩ অব্দ পর্যন্ত। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি মৃতুবরণ করেন। গবেষকগণ তার মমি করা দেহের অবশেষ ও কঙ্কাল নিয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, তুতের একটি পা জন্মগতভাবেই বাঁকানো ছিল। তিনি কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন বলে মারা গিয়েছিলেন। এই ছবিতে তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষ থেকে ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত তুতেনখামেনের কফিনের পুরো ছবি আর তার মুখায়ববের কফিনে তৈরি করা চিত্র দেখানো হয়েছে।

Draft Copy

মিশরীয়দের প্রাচীন ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পারিবারিক সম্পত্তির উপর মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত ছিল। নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই উঁচু অবস্থানে। মিশরের রাণীকে দেবতার স্ত্রী, মা, কন্যা বলে বিবেচনা করা হতো। রাজবংশের মেয়েরাও সিংহাসনের দাবিদার ছিল এবং অনেকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিতও হতো। মিশরের একজন রাণীর নাম হচ্ছে নেফারতিতি। তিনি ছিলেন রাজা আখেনাতেন-এর স্ত্রী।

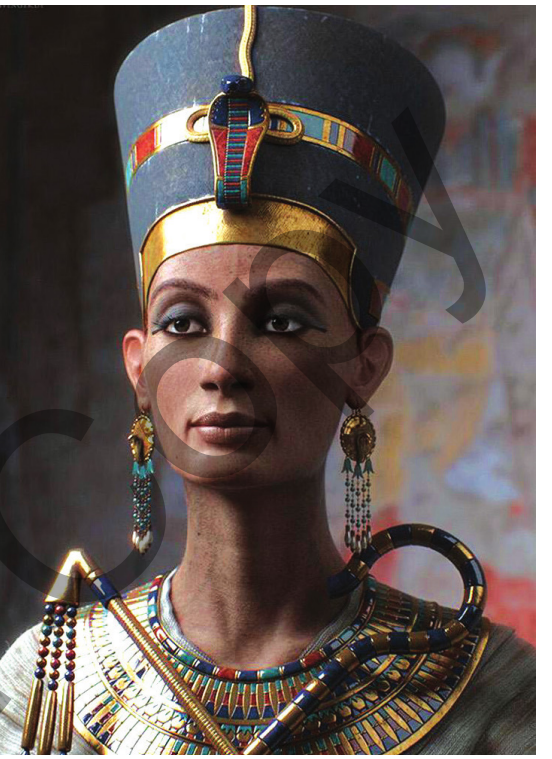

প্রাচীন মিশরেই প্রথম সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজেও নারীরা অংশ নিতেন। মিশরের রাজা আখেনাতেন-এর স্ত্রী রাণী নেফারতিতি ছিলেন তেমনই একজন প্রভাবশালী নারী। রাজা আখেনাতেন এবং তাঁর স্ত্রী নেফারতিতি মিশরীয়দের জীবনযাপনে বড় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। ছবিতে নেফারতিতির ভাস্কর্য।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিশরীয়দের অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বহুবিচিত্র অবদানের নজির পাওয়া যায়। মিশরীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল। তারা বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন- সূর্য, চন্দ্র, ঝড়, প্লাবন, বাতাস প্রভৃতি) এবং পশুপাখির (যেমন- সিংহ, বাঘ, সাপ, বাজপাখি, কুমির, বিড়াল প্রভৃতি) পূজা করতো। মিশরীয় প্রধান দেবতা ছিল সূর্য দেবতা। সূর্য দেবতার নাম ছিল 'আমান রে'। মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণির দেহের সংমিশ্রণে মিশরীয়দের অধিকাংশ দেব-দেবীর গড়ন রচিত হয়েছিল। মিশরীয়দের আকাশের দেবতার নাম ছিল হোরাস। হোরাস দেহ ছিল মানুষের, মাথা ছিল বাজপাখির। মিশরীয়দের পাতালের দেবতা ছিল আনুবিস। আনুবিসের দেহ ছিল মানুষের মতো, মাথা ছিল শেয়ালের।

মিশরের শাসকদের উপাধি ছিল ফারাও। শাসক এবং পুরোহিতেরা মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিল যে, ফারাওগণ দেবতাদের বংশধর। পরকালেও ফারাওগণ শাসকের মর্যাদা ফিরে পাবে। মৃত্যুর পর ফারাওদের দেহ যাতে পঁচে নষ্ট না হয়ে যায় সেইজন্যে বিশেষ কায়দায় তাদের দেহ মমি করা হতো। পিরামিড নামে এক

Draft Copy

ধরণের অতিকায় স্থাপনার মধ্যে এইসব মমি রাখা হতো। মমিকরণ প্রক্রিয়া এবং পিরামিড নির্মাণ কৌশলে মিশরীয়দের স্থাপত্যশৈলী এবং শরীরবিদ্যা সম্পর্কে উন্নত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিরামিড তৈরি বিভিন্ন ধাপ:

কাছে কোনো পাথরের উৎস ছিল না। ছিল না কোনো যন্ত্র বা আধুনিক প্রযুক্তি। তারপরেও কীভাবে মিসরীররা পিরামিড তৈরি করেছিলেন? বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে এই জটিল স্থাপত্যগুলো নির্মাণের প্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকগণ। প্রথমে নীল নদের মাধ্যমে জাহাজে বহন করে পাথর নিয়ে আসা হতো পিরামিড তৈরি করার জন্য।

জাহাজ থেকে পাথরের টুকরাগুলো কীভাবে নিয়ে আসা হতো পিরামিড নির্মাণ করার স্থানে? ছবি দেখে তোমরা বলতে পারবে?

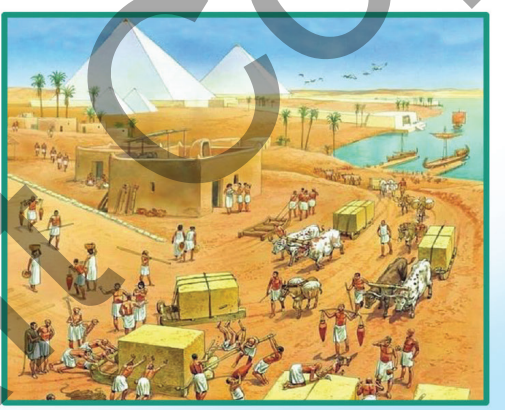

জাহাজ থেকে কাঠ বসিয়ে একদিক থেকে নিচ দিয়ে চাপ দিয়ে তুলে ধরে অন্যদিক থেকে দড়ি দিয়ে অনেকে মিলে টেনে পাথরের টুকরাগুলোকে পিরামিড তৈরি করার স্থানের কাছে নিয়ে যাওয়া হতো।

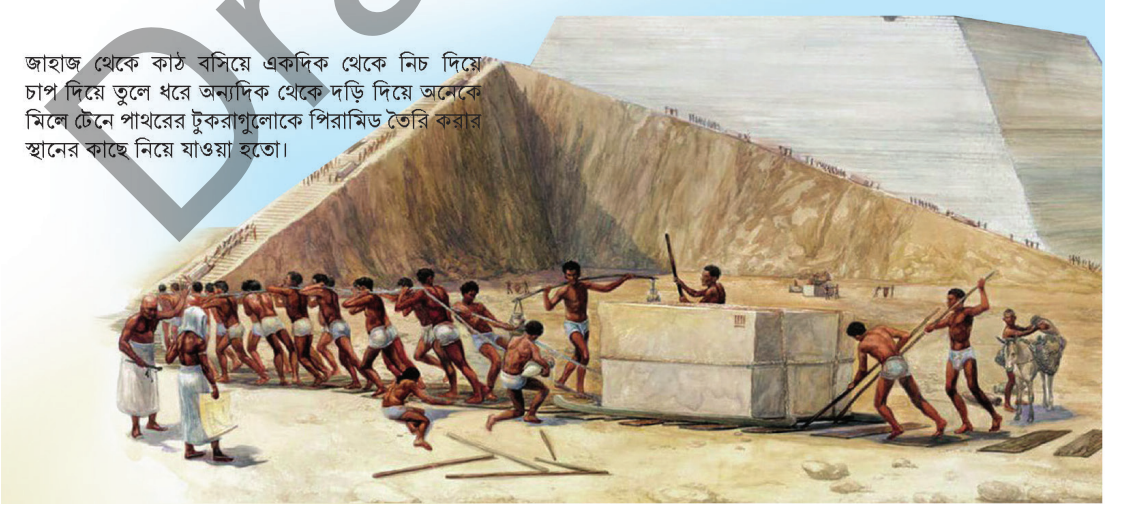

Draft Copy

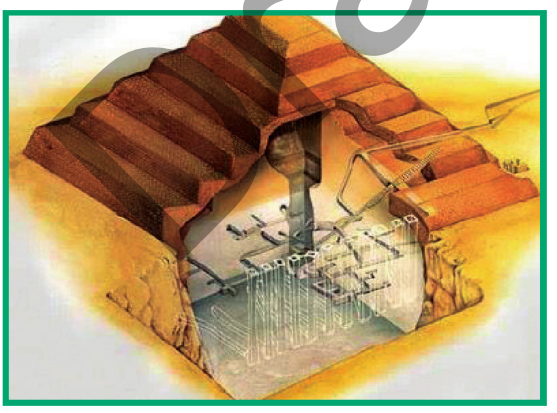

পিরামিডের ভিতরের দেখতে কেমন ছিল।

পিরামিড নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ :
পাথর মেপে, কেটে দরকারী আকার দিয়ে পিরামিড তৈরির উপযোগী করা হত। একটা পাথরের উপরে আরেকটা পাথরের টুকরো বসানো হত। দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে উপরের দিকে পাথরের টুকরাগুলোকে উঠানো হত। একটার উপরে আরেকটা স্থাপন করা হত। পিরামিড তৈরির এই প্রক্রিয়ার প্রচুর শ্রমিক দরকার হত। গবেষকগণ মনে করেন, বড় আকারের একটা পিরামিড তৈরি করতে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হত। এই শ্রমিকগণের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত নির্মাণ স্থানের কাছে। উপরের ছবি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কল্পনা করে আঁকা হয়েছে।

Draft Copy

ফারাওদের পাশাপাশি সমাজের অনেক উচ্চশ্রেণির মানুষদের শরীরও মমি করে সংরক্ষণ করে রাখা হতো। পিরামিডে মমিকৃত দেহগুলোকে সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য দিয়ে নির্মিত কফিনে রাখা হতো। কফিনের সাথে নানান প্রকার খাদ্য, অস্ত্র, আসবাবপত্রও দেওয়া হতো। নানান প্রকারের দ্রব্যের পাশাপাশি মৃত দেহের সঙ্গে প্যাপিরাসে লেখা একধরণের উৎসর্গপত্রও দেওয়া হতো। এইগুলাকে বলা হয়, 'বুক অব ডেথ' বা 'মৃতের বই'। এইসব লেখা থেকেও মিশরীয়দের ইতিহাসে প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

শবদেহ থেকে মমি তৈরি করে কফিনে রাখা বিভিন্ন পর্যায়ে ঘটতো। কফিনটি মৃতদেহের শ্রেণি ও ক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন উপাদান, অলংকরণ আর ধর্মাচার অনুসারে তৈরি হতো। তারপরে কফিনটি একটি বাক্সে রাখা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাক্সটি পাথরের হতো। এ ধরনের বাক্সকে সারকোফাগাই বলা হয়। বাক্সটিকে কবরের কক্ষে রাখা হতো।

পিরামিড তৈরির কয়েকটি ধাপ ছবিতে দেখেছো। ছবিগুলো দেখে চলো আমরা এই প্রক্রিয়ার ধাপ গুলো লেখার চেষ্টা করি। পিরামিড তৈরির ধাপগুলো লিখবে ও বোর্ড/ কাগজ দিয়ে পিরামিড তৈরি করি।

কিউনিফর্ম লিপির রূপান্তর। তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে বিভিন্ন শব্দ বোঝানোর জন্য কীভাবে লেখা হতো। তোমরা নিজেরা এই হরফে কাদার উপরে একটা কাঠি দিয়ে লিখে সেটা শুকিয়ে নিতে পারো। বা পুড়িয়ে শক্ত করে নিতে পারো।

Draft Copy

মৃতদেহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তর, পরিবর্তন, রাসায়নিক ব্যবহার করে, কাপড়ের পরতে পরতে আবৃত করে কয়েকটি ধাপে অনেক সময় ধরে মমিতে পরিণত করা হতো। উপরের ছবিতে তেমনই কয়েকটি ধাপ গবেষণার মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলায় মিশরীয় সভ্যতা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কৃষির উপর ভিত্তি করেই মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নীলনদের বন্যা, খরা প্রভৃতি বিষয়ের সাথে আকাশের নক্ষত্ররাজির সম্পর্ক লক্ষ করেই তারা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল। কৃষি এবং ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে তারা চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। আকাশে চন্দ্রের অবস্থান নিরীক্ষণ করে রচিত হয়েছিল চন্দ্রপঞ্জিকা। এই পঞ্জিকা অনুসারে বছরে তাদের দিনের সংখ্যা ছিল ৩৫৪টি। আনুমানিক ৪২০০ সাধারণ পূর্বাব্দের দিকে মিশরীয়রা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে ৩৬৫ দিনে বছর হিসেব করে সৌর পঞ্জিকা তৈরি করে। ৩০ দিনে ১ মাস, ১২ মাসে বছরের হিসেব মিশরীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, নীলনদের বন্যার সাথে বছরের হিসেবে মিলাতে গিয়ে তারাই প্রথম 'লিপ ইয়ার' আবিষ্কার করে প্রতি চার বছর পর পর ৩৬৬ দিনে বছর গণনার রীতি চালু করে। দিনের বিভিন্ন সময় নিরূপণের জন্যে তারা একধরণের সূর্যঘড়ি আবিষ্কার করেছিল।

গণিতের ক্ষেত্রেও তাদের অবদান ছিল অনেক। যোগ, বিয়োগ, গুণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল তারা। জ্যামিতিক হিসাব ও নকশা মিলিয়ে নির্মাণ করেছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বেশকিছু স্থাপত্যকীর্তি। এইসব কীর্তি ইতিহাসের এক বিশেষ কালে নির্দিষ্ট এক ভূ-খণ্ডে একদল মানুষের জীবন-সংগ্রাম আর সভ্যতা রচনার অভিজ্ঞতাকে আজো ধারণ করে আছে।

ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম বড় অবদান হচ্ছে লিপির আবিষ্কার। মানুষের ইতিহাসে তারাই প্রথম লিপির উদ্ভাবন করে। প্রথমদিকে তাদের লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক। কোন একটি বস্তুর নাম ও সংখ্যা লিখে রাখার জন্যে তারা সে বস্তুটির চিত্র আঁকতো এবং ছোট ছোট বিন্দু দিয়ে তার সংখ্যা উল্লেখ করতো। চিত্রভিত্তিক সেই

Draft Copy

লিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক। হায়ারোগ্লিফিক নামটি গ্রিকদের দেওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র খোদাই কর্ম। চিত্রভিত্তিক লিপি থেকেই তারা ক্রমে ক্রমে অক্ষরভিত্তিক লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। লেখার উপকরণ হিসেবে মিশরীয়রা প্যাপিরাস নামক কাগজ এবং কালো কালির আবিষ্কার করেছিল। প্যাপিরাস ছিল মূলত এক ধরনের নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ। প্যাপিরাসের কান্ডকে খুব পাতলা করে কেটে রঙে ডুবিয়ে, রোদে শুকিয়ে লেখার উপযোগী করা হতো।

পাথরে খোদাই করা আর প্যাপিরাসে লেখা হায়ারোগ্লিফিক লিপি।

Draft 2024

A		EAGLE	I/E/Y		REEDS	S/Z		CLOTH
A		ARM	J		COBRA	SH		POOL
B		FOOT	K/C		BASKET	T		LOAF
C/K		BASKET	L		LION	TH		ROPE
D		HAND	M		OWL	U/W		CHICK
E/I/Y	\\	2 STROKES	N		WATER	V/F		VIPER
F/V		VIPER	O/U/W		LASSO	W		CHICK
G		JAR	P		DOOR	X		BASKET/ CLOTH
H		HOUSE	Q		SLOPE	Y		2 REEDS
H		FLAX	R		MOUTH	Z/S		DOOR BOLT

কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিক চিত্রলিপির অর্থ দেওয়া হলো ইংরেজিতে। তোমরা খোদাই করা লিপির ছবির সঙ্গে মিলাতে পারো।

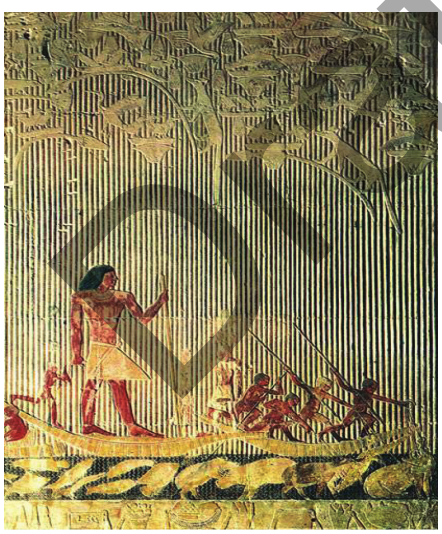

চুনা পাথরের উপর অঙ্কিত জলহস্তী শিকারের চিত্র, সাক্কারা, মিসর

পোশাক- পরিচ্ছদ তৈরি, পরিধান ও ভূমিকাভিনয়:

ছবিতে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক-আশাক লক্ষ করো। তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো (এখন থেকে পড়ে বা অন্য বই পড়ে অথবা ইন্টারনেট ঘেঁটে)। এবারে কাপড়, কাগজ, রং ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রাচীন মিসরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষদের পোশাক, অলংকার ও অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করে সেগুলো পরে সে সময়কার কোনো কল্পিত ঘটনার অভিনয় করো। এমন একটি ঘটনা তৈরি করবে যেন তা সব শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রতিফলিত করে।

Draft Copy

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

আনুমানিক ৪০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, ফনেশীয় এবং ক্যালডীয় সভ্যতার নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে এই সভ্যতাগুলোর সমন্বিত নাম মেসোপটেমীয় সভ্যতা। ভূ-পৃষ্ঠের ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এই নগর সভ্যতাগুলোতেও মিশরীয় সভ্যতার মতোই শ্রেণিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজাদের এই ক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছিল পুরোহিত বা ধর্মগুরুরা। রাজাকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের সামাজিক অবস্থান ছিল অনেক নিচে। সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচের শ্রেণিতে।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতাগুলোর মধ্যে সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় মেয়েরা সম্পদের অধিকারী হতে পারতো এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার তাদের ছিল। অন্যদিকে একই অঞ্চলে গড়ে উঠা এসেরীয় সভ্যতায় মেয়েদের সেই অধিকার ছিল না। ক্যালডীয় সভ্যতায়ও মেয়েদের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অগ্রদূত বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতাকে। ইতিহাসে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ৩০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সুমেরীয়রা কিউনিফর্ম নামের এক ধরণের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কাদামাটির নরম প্লেটের উপর সরু কাঠির অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হতো। পরে তা রোদে শুকিয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে সংরক্ষণ করা হতো। সুমেরীয়রা ছিল সাহিত্যপ্রেমি। আনুমানিক ২০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা ‘গিলগামেশ’ নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিল। গিলগামেশ কাব্যে মহাপ্লাবন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত এমন অনেক কিছুই বলা হয়েছে যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

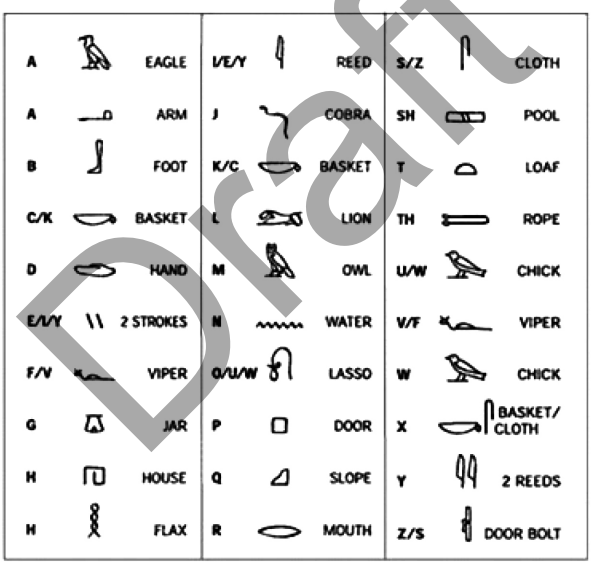

কয়েকটি হায়ারোগ্লিফিক চিত্রলিপির অর্থ দেওয়া হলো ইংরেজিতে।

তোমরা খোদাই করা লিপির ছবির সঙ্গে মিলাতে পারো।

Draft Copy

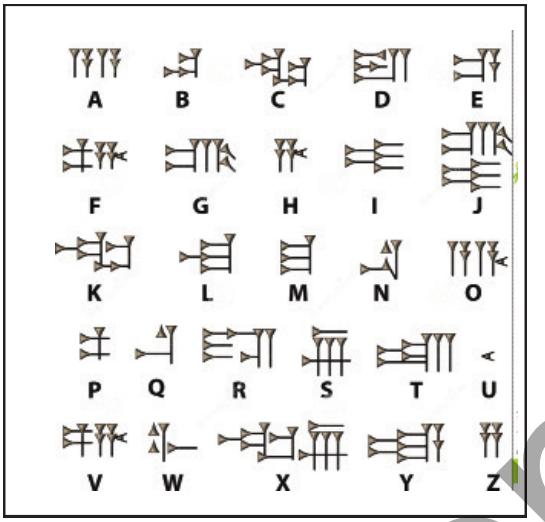

ইংরেজি বর্ণমালার অনুসারে কিউনিফর্ম লিপি

সুমেরীয় সভ্যতায় প্রথম চাকাচালিত যানবাহনের প্রচলন হয়। স্থাপত্যক্ষেত্রেও সুমেরীয়দের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয়দের স্থাপত্যবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল জিগুরাত নামের ধর্মমন্দির।

সুমেরীয়দের প্রতিটি নগরকেন্দ্রে একটি নগরদেবতার নামে উৎসর্গ করা মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো। উর নগরের জিগুরাতটি তখন দেখতে কেমন ছিল? সেই মন্দিরের দুটো কাল্পনিক ছবি।
কপিরাইট : জ্যঁ ক্লদগোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/project/middle-east/

Draft Copy

সভ্যতা যেমন জীবন-প্রযুক্তি-স্থাপত্য-চিন্তায় বিভিন্ন ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসে, তেমনই সভ্যতার শাসকগণ অন্য অঞ্চল দখল করতে চান। একটি রাজত্বের সঙ্গে আরেকটি রাজত্বের যুদ্ধ হতো। রাজা বা সম্রাটগণ অন্য রাজ্য বা লোকালয় দখল করতে গিয়ে নৃশংস অত্যাচার করতেন। অনেক মানুষকে হত্যা করতেন। অন্যদের বসতি ধ্বংস করতেন। বেশির ভাগ সভ্যতায় শাসকগণ পরাজিত মানুষজনের অনেককে দাস হিসেবে বন্দী করে নিয়ে আসতেন। এই দাসদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বিভিন্ন কঠিন শ্রমের কাজে ব্যবহার করা হতো। সভ্যতার বিভিন্ন বিখ্যাত স্থাপনা তৈরি করেছিল প্রধানত এই দাসগণ। গ্রিক বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের মধ্যেও যুদ্ধ লেগেই থাকত। উপরে গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র।

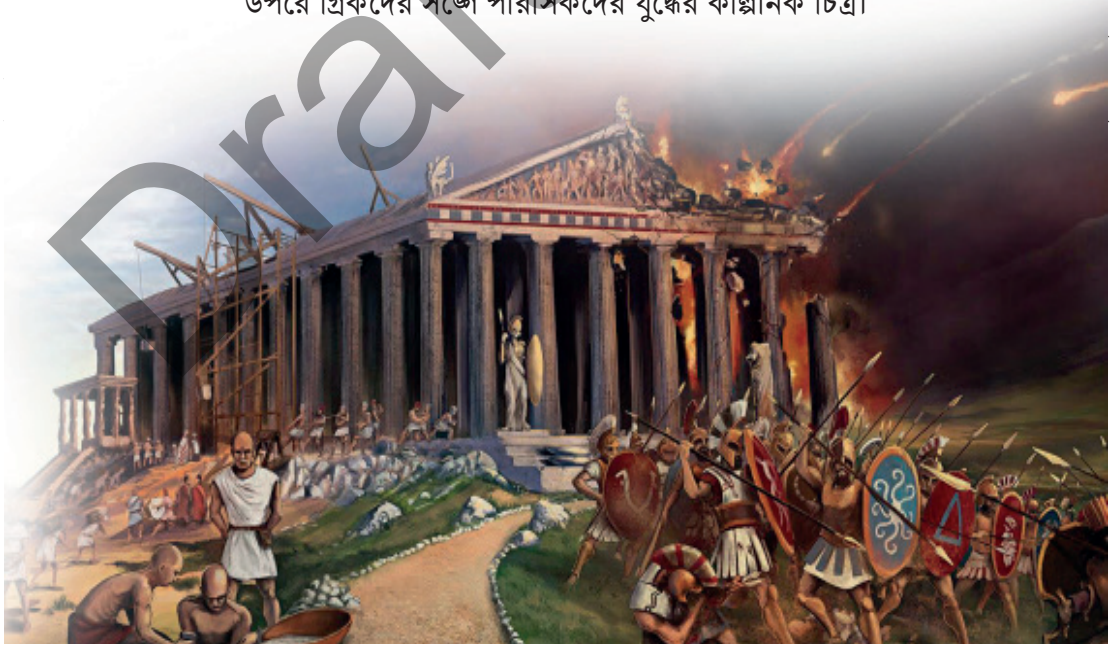

Draft Copy

চলো একটি দলগত কাজ করি। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আমরা সুমেরীয় এবং ব্যবিলনীয় সভ্যতার নানান অবদান নিয়ে কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর তৈরি করি। প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো খাতায় লিখে ফেলি-

প্রশ্ন:

উত্তর:

প্রশ্ন:

উত্তর:

প্রশ্ন:

উত্তর:

প্রশ্ন:

উত্তর:

প্রশ্ন:

উত্তর:

Draft Copy

প্রাচীন গ্রিসে সমাজ ও সংস্কৃতি

পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীকে আশ্রয় করে। গ্রিক সভ্যতা ছিল সেই ধারায় একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। গ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে নদীর চেয়ে সমুদ্রের অবদান ছিল বেশি। গ্রিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পর্বত এবং সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ। অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে আনুমানিক ১২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সভ্যতাটির যাত্রা শুরু হয় এবং ৬০০ সাধারণ অব্দের দিকে এসে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। অনেকগুলো ছোট ছোট নগর নিয়ে এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। গ্রিসের প্রধান নগর ছিল এথেন্স। গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসেবে এথেন্সের নাম ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে লিখিত হয়ে আছে।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসেরে বর্তমান আলোকচিত্র (Source: history৪kids.co)

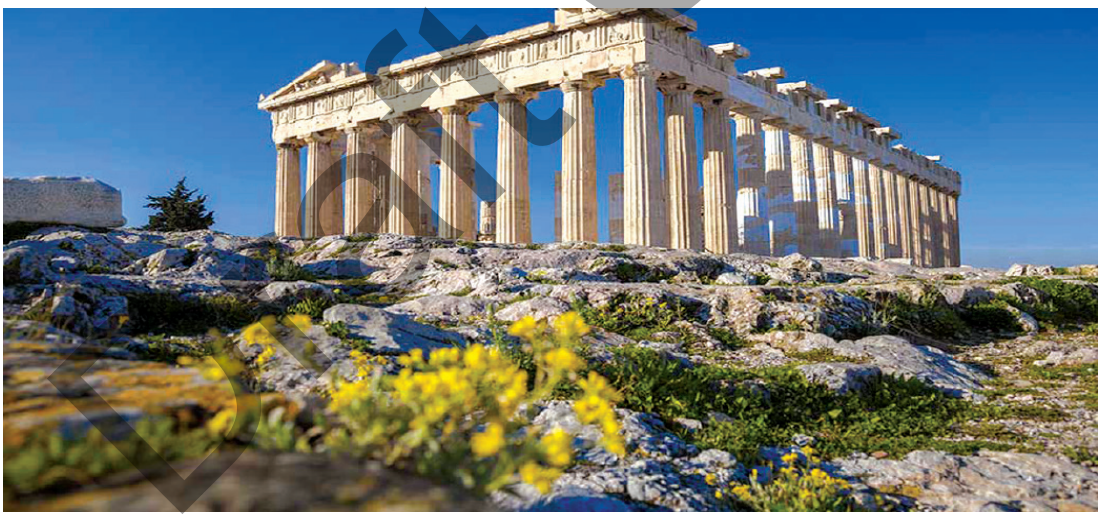

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: his tory4kids.co)
গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র ক্রিটের সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে। সূত্র ও কপিরাইট: https://jeanclaudegolvin.com/en/

Draft Copy

প্রাচীন মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার মতো গ্রিসেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সমাজের উচ্চ শ্রেণিতে ছিল শাসক, পুরোহিত, বণিক প্রভৃতি সুবিধাভোগী মানুষেরা। শ্রমিক, কৃষক এবং দাসদের অবস্থান ছিল নিচু শ্রেণিতে। গ্রিক সমাজ মূলত অভিজাত এবং শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতরা ছিল সকল সম্পদ এবং প্রশাসনিক সুবিধার অধিকারী। দাস এবং শ্রমিকেরা তাদের হাতে শোষিত ও নির্যাতিত হতো। কৃষি এবং বাণিজ্য ছিল গ্রিকদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। গম ও যব ছিল তাদের প্রধান কৃষিপণ্য। তবে অধিকাংশ ভূমি অনুর্বর হওয়ায় বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো। কৃষকেরা তাই অধিকাংশ সময়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করতো। সম্পদের মূল মালিকানা থাকতো অভিজাত শাসক ও বণিকদের হাতে। সমুদ্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল গ্রিক সভ্যতা। বিভিন্ন দ্বীপ এবং নগরগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল গ্রিকরা। নৌযুদ্ধেও তারা ছিল প্রায় অপরাজেয়। বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যে আক্রমণ করতে তারা যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করতো। আবার গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও প্রায়শই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেতো। নিচে গ্রিকদের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো দেখে তোমরা সেইসময়ের গ্রিকদের জাহাজ নির্মাণের দক্ষতা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহৃত অস্ত্র ও বর্ম সম্পর্কে ধারণা পাবে।

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের কোনো কাহিনিই পুরোপুরি বোঝা যাবে না যদি সমুদ্রের সঙ্গে গ্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা না-জানি। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ আর যুদ্ধের জন্য গ্রিকরা নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জাহাজ ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যও তারা বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজ নির্মাণ ও চালনায় গ্রিকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। জাহাজকে ট্রিয়েম বলা হতো। বিভিন্ন লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিতো। বেশির ভাগ নামই দেবতা-দেবী, স্থান, প্রাণী, বস্তু বা ধারণার (যেমন: স্বাধীনতা, গৌরব, সাহস ইত্যাদি) নামে হতো।

নৌযুদ্ধ

অনুশীলনী:

প্রাচীন গ্রিস ও আমাদের দেশের কাঠের জাহাজের পার্থক্য খুঁজে বের করো। মিল অমিল লিখ।

মালবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ

Draft Copy

অনুশীলনী: ৩

প্রাচীন মিশরীয় সমাজ, মেসপটেমিয়া সভ্যতা ও গ্রিক সভ্যতার সমাজব্যবস্থা নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

	বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান	ভূমিকা
প্রাচীন মিশরীয় সমাজ		
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা		
গ্রিক সভ্যতা		

বিতর্ক: "মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিল"।

বন্ধুরা, দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরি, খুশি আপা হবেন বিচারক।

এর পক্ষে আর বিপক্ষে যুক্তি গুলো পয়েন্ট আকারে লিখে রাখিঃ

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়া

একটা বিষয় নিশ্চয়ই তোমরা অনুধাবন করতে পেরেছো তা হলো মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা প্রেক্ষাপটে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনধারার মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছে। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেছে। এর ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এইসব বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার কথা তোমরা বাংলা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি পাঠ করতে গিয়ে অনুধাবন করেছো, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছো। বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও তোমাদের সামনে একই চিত্র – মানুষের চিন্তা ও কাজ যেমন স্থান ভেদে ভিন্ন হয়, তেমনই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও ভিন্ন গড়ানার হয়ে থাকে। তাই সব সময় জেনে রাখবে, ভিন্নতা মানুষের জীবনের বাস্তবতা। পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান

Draft Copy

গ্রিকদের ধর্মীয় জীবন ছিল বহু দেব-দেবীতে পূর্ণ। প্রতিটি নগরের পৃথক দেবতা ছিল। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস। জিউজ ছিল বজ্র, বৃষ্টি এবং আকাশের দেবতা। যুদ্ধের দেবতার নাম ছিল আরাস। চিরকুমারী এথেনা ছিল জ্ঞান ও বায়ুর দেবী। সহিংসতা ও রক্তপাতের দেবতা ছিল অ্যারিস। আবেগ, সৌন্দর্য ও ভালোবাসার দেবী ছিল আফ্রোদিতি। অ্যাপোলো ছিল কবিতা, শিল্পকলা এবং চিকিৎসার দেবতা। প্রাচীন গ্রিসের দেব-দেবীদের নিয়ে নানান ধরণের কাহিনী ও আখ্যান লেখা হয়েছে। গ্রিক পুরাণ অনুসারে স্বর্গের অলিম্পাস নামক পর্বতে ১২ জন দেব-দেবী বাস করতেন। তাদের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হতো আকাশ, বজ্রপাত, সমুদ্র, ঝড়, জন্ম-মৃত্যু, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-কবিতা, কৃষিক্ষেত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কারিগরি ও প্রকৌশলবিদ্যা, আনন্দ-বিনোদন, জমির উর্বরতা, ব্যবসা-বাণিজ্য, খেলাধুলা, রাজনীতি সহ প্রায় সকল কিছু। মহাকবি হোমারের লেখা ইলিয়াড এবং অডিসি নামে মহাকাব্যে এই দেব-দেবীদের সঙ্গে মানুষের নানান রকম সম্পর্ক এবং দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, দর্শন, নাট্যকলা, খেলাধুলা, রাজনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গ্রিক সভ্যতার অবদান সমকালীন অন্য সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসের জনক হিসেবে পরিচিত হেরোডোটাসের জন্ম গ্রিসে। গ্রিক ও পারসিক যুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনিই প্রথম ইতিহাস-সংক্রান্ত বই রচনা করেন। ইতিহাস চর্চায় সঠিক উৎস অনুসন্ধান এবং ঘটনার বর্ণনায় নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো খ্যাতিমান দার্শনিক এবং পিথাগোরাসের মতো প্রতিভাবান গণিতবিদের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিকরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করে। বলা হয়ে থাকে, গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয়, পুরো পৃথিবীকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান দিয়ে ইতিহাস নির্মাণ করেছে।

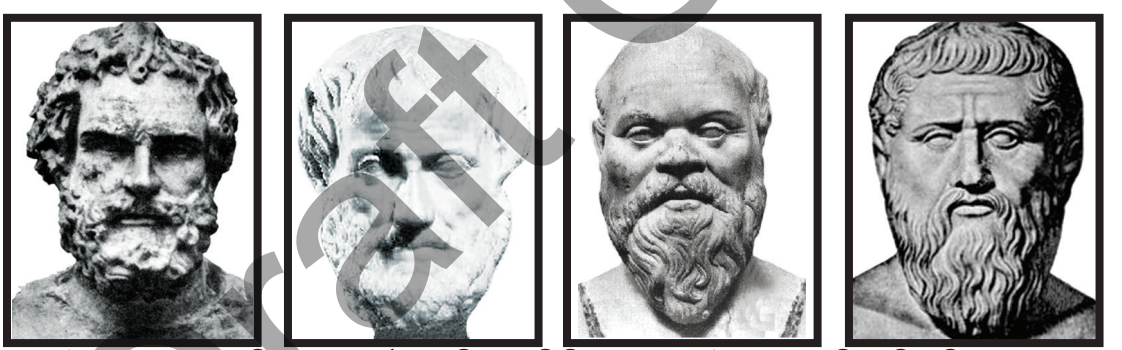

সেই সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা হত গ্রিসের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে। অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের প্রভাব গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকিৎসাবিজ্ঞানে পড়েছে। তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমনই চারজন চিন্তাবিদের ভাস্কর্যের ছবি এখানে রয়েছে। বাম থেকে ডানে: থেলেস (প্রাক সাধারণ ৬২৩-৫৪৫ অব্দ); অ্যারিস্টটল (প্রাক সাধারণ ৩৮৪-৩২২ অব্দ); সক্রেটিস (প্রাক সাধারণ ৪৭০-৩৯৯ অব্দ); প্লেটো (প্রাক সাধারণ ৪২৭-৩৪৭ অব্দ)

Draft Copy

দুইটি ভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতা এবং তাদের নানান অবদান সম্পর্কে জানলাম। চলো এইবার একটি বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। বিতর্কের শিরোনাম হচ্ছে, "মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার চেয়ে বেশি অগ্রগামী ছিল"। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরি। আমাদের মধ্য থেকেই দুই/চারজন হবেন বিচারক। পক্ষ এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো এখানে তুলে রাখি।

পক্ষে যুক্তি	বিপক্ষে যুক্তি

প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও গ্রিক সভ্যতার সমাজব্যবস্থা নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

	বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান	ভূমিকা
প্রাচীন মিশরীয় সমাজ		
গ্রিক সভ্যতা		
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা		

Draft Copy

সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়া

একটা বিষয় নিশ্চয়ই তোমরা অনুধাবন করতে পেরেছো তা হলো মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা প্রেক্ষাপটে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জনধারার মানুষ বসতি স্থাপন করেছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রথা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করেছে। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নির্মাণ করেছে। এর ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। এইসব বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতার কথা তোমরা বাংলা অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতি পাঠ করতে গিয়ে অনুধাবন করেছো, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উপলব্ধি করেছো। বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও তোমাদের সামনে একই চিত্র® দৃশ্যমান হবে। মানুষের চিন্তা ও কাজ যেমন স্থান ভেদে ভিন্ন হয়, তেমনই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাই সব সময় জেনে রাখবে, ভিন্নতা মানুষের জীবনের বাস্তবতা। পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সকল প্রকার সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই কেবল মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতা সফলভাবে সামনে এগিয়ে যেতে পারে।

অনুসন্ধানী কাজ: ১

চলো, নিচের শিরোনামটিকে বিশ্লেষণ করে একটি প্রতিবেদন লিখি

“মানুষের ইতিহাস মূলত সাংস্কৃতিক ভিন্নতার ইতিহাস”

Draft Copy

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, ৫০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকেই প্রাচীন মিশরের নীল নদের তীরে শ্রেণিভিত্তিক সমাজ এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। স্থাপত্য ও শিল্পকলায় এই সমৃদ্ধি ছিল দৃষ্টান্তমূলক। ধরো যদি প্রশ্ন করা হয়, পৃথিবীর সকল স্থানে কি একই ধারায় নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? উত্তর হচ্ছে, না। মিশরে যখন নগর সভ্যতার উদয় হয়েছে, তার কাছাকাছি সময়ে বা কিছু পরে মেসোপটেমিয়া, গ্রিক, রোমান, হরপ্পা, ফিনিশীয়, হোয়াংহো প্রভৃতি নগরভিত্তিক সভ্যতাসমূহের যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু এই নগর সভ্যতাগুলোর বাইরেও প্রচুর মানুষ ছিল। সেই মানুষেরা কেউ কেউ চাষাবাদ পদ্ধতি রপ্ত করে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক জীবন যাপন করছিল, কেউ কেউ আবার শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক জীবনধারাতেই নিজেদের টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। আর তাদের প্রত্যেকেরই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাতে ছিল নানান রকমের বৈচিত্র্য, ভিন্নতা আর চ্যালেঞ্জ।

প্রাচীন যে নগরসভ্যতাগুলো সম্পর্কে এই অধ্যায়ে তোমরা জেনেছো, সেগুলো কৃষিকে উপজীব্য করে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে শিল্প এবং বাণিজ্যের বিকাশ ঘটিয়ে নগরভিত্তিক অর্থনীতির সূচনা করেছিল। আর এই নগরের শাসকগণ নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করে সূচনা করেছিল সাম্রাজ্যবাদের। যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমানা এবং সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি যুদ্ধে পরাজিত মানুষদের ধরে নিয়ে এসে তারা দাস বানাতো। শ্রমক্ষেত্রে দাসদেরকে কাজে লাগানো হতো। প্রাচীন সমাজ ও নগররাষ্ট্রগুলোর সবচেয়ে অন্ধকার দিক বলা হয় এই দাস প্রথাকে। একজন যুদ্ধবন্দী মানুষকে ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হতো। ভারী ভারী কাজগুলো করানো হতো। বিনিময়ে তিনবেলা খাদ্য কিংবা সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশও তাদের দেওয়া হতো না। নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো। মূলত দাসদের শ্রমের উপর নির্ভর করেই গ্রিক-রোমান সভ্যতাগুলো স্থাপত্যে ও ঐশ্বর্যে এতো বেশি উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল। কৃষক ও দাসদের শ্রমের বিনিময়ে যে পণ্য উৎপাদিত হতো তার প্রধান ভোক্তা ছিল অভিজাত শ্রেণির মানুষ এবং যোদ্ধারা।

কলোসিয়ামে ক্রীতদাসগণ গ্লাডিয়েটর হিসেবে মৃত্যু না হওয়া অব্দি একজন আরেকজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতেন। গ্যালারিতে বসে দর্শকগণ সেই যুদ্ধ দেখে বিনোদন পেতেন। এমনই একটি দৃশ্যের কাল্পনিক চিত্র।

Draft Copy

ক্রীতদাস হিসেবে বন্দী নারী ও পুরুষদের বাজারে কেনাবেচার কাল্পনিক চিত্র।

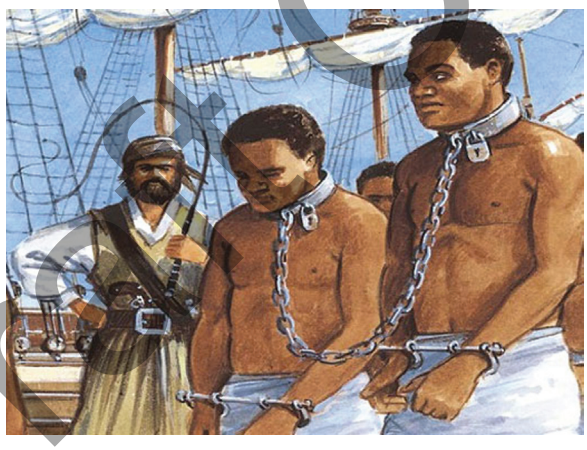

দাসদের অমানবিকভাবে কাজ করতে বাধ্য করা হতো।

অনুশীলনী:

Draft Copy

শাসক শ্রেণির মানুষদেরকে পুরোহিতেরা পৃথিবীতে 'স্বর্গের প্রতিনিধি' হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন। ফলে নগরগুলোতে দুইটা পৃথক শ্রেণির উদয় হয় – ১। শাসক ও অভিজাত শ্রেণি এবং ২। কৃষক ও দাস শ্রেণি। শাসক ও অভিজাতশ্রেণির মানুষেরা সকল সম্পদ এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকেন। সাধারণ কৃষক এবং দাসেরা নির্যাতিত ও শোষিত হন অভিজাত শ্রেণির মানুষদের হাতে। মানুষ হয়ে মানুষকে নির্যাতন করার এই সামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। চলো উপরের পাঠে উল্লিখিত দুই শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে তোমার নিজের মতামত বা চিন্তাগুলো খাতায় লিখে রাখি।

যাহোক, প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে কয়টি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে রোমান সাম্রাজ্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সাম্রাজ্যের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিল সেনাবাহিনী। বিভিন্ন ধরনের স্তরবিশিষ্ট সেনাবাহিনী ছিল রোমান সম্রাটের। নতুন নতুন এলাকায় আক্রমণ করে নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা এবং লুটপাট চালাতো এরা। পরাজিত ভূমি থেকে হাজার হাজার মানুষকে বন্দী করে নিয়ে এসে দাস হিসেবে বিভিন্ন কাজে লাগাতো।

৫ম শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অবসান হয়। সাম্রাজ্যবাদের এই পতনের ফলে সমাজ ব্যবস্থাতেও বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা হয়। সামন্ত ব্যবস্থা নামে নতুন এক ধরণের আর্থ-সামাজিক জীবন ধারার সূচনা হয় ইউরোপে মূলত পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর হতেই। তাছাড়াও, চতুর্থ-পঞ্চম শতক থেকেই রোম সহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়। নতুন এই ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে পোপতন্ত্র এবং মঠতন্ত্র নামে নতুন কিছু ধর্ম-সাংস্কৃতিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠানেরও উদ্ভব হয়। শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যেও ধীরে ধীরে খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হতে শুরু করে। ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম এতোই প্রভাবশালী হয়ে উঠে যে, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য- সকল কিছুই ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং গন্ডিবদ্ধ হয়ে যেতে শুরু করে। প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী খ্রিস্ট ধর্ম ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিল্প-সাহিত্যের চর্চাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সমাজে পোপ, ধর্মগুরুদের প্রভাব বেড়ে যায়। প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতিতে খ্রিস্ট ধর্মের এই আধিপত্য বজায় ছিল। অন্যদিকে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যের চর্চায় এই সময়ে নেমে এসেছিল প্রগাঢ় অন্ধকার।

সপ্তম শতকের শুরুর দিকে ইউরোপে যখন খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে ঠিক সেই সময়েই আরবের মক্কা থেকে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়, প্রচার ও প্রসার ঘটে। বহু গোত্র এবং জনধারার মানুষে বিভক্ত আরবভূমির সুনির্দিষ্ট অংশে নতুন এই ধর্মের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকাশ ঘটে। আরবভূমির নির্দিষ্ট অংশ থেকে যাত্রা শুরু হলেও ধীরে ধীরে তারা ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা, আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে নিজেদের সমাজ-সংস্কৃতি বিস্তারে মনোযোগী হয়। রাজশক্তির হাত ধরেই ইসলামের ধর্ম-সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ধীরে ধীরে পির, সুফি, আলেমদের প্রচারণায় আরব ভূ-খন্ডের বাইরেও নানান অঞ্চলে ইসলামি সমাজ গড়ে উঠে। তবে এই বিস্তৃতির পথেও ছিল নানান রকমের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ, বর্জন, সমন্বয় ও সংযোজনের ধারা। পারস্য, তুরস্ক, আফ্রিকা, স্পেন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি অঞ্চলের খন্ড খন্ড অংশে যখন ইসলামের নানান ধারার বিস্তার ঘটতে থাকে তখন দেখা যায় ওই অংশগুলোতে বহুকাল ধরে চলমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানান রীতিনীতি, স্থাপত্যশৈলী, প্রথা-পদ্ধতি ইসলামের ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন আঞ্চলিক রূপে বিকশিত হচ্ছে। বাংলা অঞ্চলের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করার সময় গ্রহণ-বর্জন ও সমন্বয়ের এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই অনেক কিছু

Draft Copy

অনুধাবন করেছো। বাংলা অঞ্চলের মতোই পৃথিবীর অপরাপর ভূখন্ডেও এই ধারা সক্রিয় ছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার, নতুন নতুন ভূমি নিয়ন্ত্রণ, ধন-সম্পদ আহরণ কিংবা ধর্ম-সংস্কৃতির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে শাসকদের মধ্যে অনেকেই তাদের যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করতেন। তবে অনেক সময় এই যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েও দুটি বিবাদমান শক্তি কাছাকাছি চলে আসতো এবং যুদ্ধের পর শান্তির সময়গুলোতে এদের মধ্যে নানান সাংস্কৃতিক উপাদানের বিনিময় ঘটতো। এইভাবেও নতুন নতুন সাংস্কৃতিক উপাদান একটি সমাজ থেকে অন্য একটি সমাজে প্রবাহিত হতো।

দশম শতকের মধ্যেই ইউরোপে এবং মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম পৃথক পৃথকভাবে আবির্ভূত হয়। খ্রিস্টান এবং মুসলমান উভয় ধর্ম-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর কাছেই জেরুজালেম ছিল অত্যন্ত প্রিয় জায়গা। জেরুজালেমে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এক সময় এই দুই সম্প্রদায়ের কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব চরম রূপ লাভ করে এবং তা এক প্রলম্বিত যুদ্ধে রূপ নেয়। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনা ক্রুসেড নামে পরিচিত। ৯ম শ্রেণির ইতিহাস পাঠে আরো বিস্তারিত পরিসরে এই বিষয়ে তোমরা জানতে পারবে। ধীরে ধীরে প্রাচ্য (এশিয়া) এবং পাশ্চাত্য (ইউরোপ)-এর মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রাচ্যের পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইগুলো ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়, অন্যদিকে গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষায় লেখা বইগুলো প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হতে থাকে। স্থাপত্য এবং শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব এবং লেনদেনের রীতি পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দলগত আলোচনা করি এবং পাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

বিভিন্ন সময়	বিভিন্ন সমাজ	রাজনৈতিক অবস্থা
পঞ্চম শতাব্দী		
সপ্তম শতক		
দশম শতক		

রেনেসাঁঃ পুনর্জাগরণের কাল

রেনেসাঁ একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ। ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অন্যতম প্রধান ঘটনা এই রেনেসাঁ। রেনেসাঁর প্রভাবে আজো পৃথিবীর মানুষ যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হেঁটে চলেছে। ১৪৯৩ সালে বা সাধারণ অব্দে তুরস্কের শাসকগণ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমদিকের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিত, শিল্পী এবং চিন্তকগণ তখন ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইতালির উপদ্বীপগুলোতেও অনেক শিল্পী, পণ্ডিত ও চিন্তকেরা নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে আগত পণ্ডিত ও শিল্পীদের সঙ্গে ইতালির পণ্ডিতদের জ্ঞান ও দর্শনের মিলন হয়। এর ফলে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা নতুন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ইতিহাসে এই ঘটনাটিকেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাল বলে অভিহিত করা হয়।

Draft Copy

ইউরোপে খ্রিস্ট ধর্ম বিস্তারের পর হতে প্রায় এক হাজার বছরের জন্যে ইউরোপের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র-সকলকিছুর উপর ধর্মের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা নেমে আসে। এর ফলে ইহজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়ে এবং প্রাচীন গ্রিসের স্বর্ণযুগের বিজ্ঞা, দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানের সাথে ইউরোপের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পনের শতকে বোকাচ্চিও, পেত্রার্ক প্রমুখ মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধারার চিন্তাভাবনার চর্চা করছিলেন।

এই সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে মূলত অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদ হয়েছিল প্রাচীন গ্রিক থেকে প্রথমে আরবিতে। তারপর ল্যাটিন ভাষায়। এ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন অসংখ্য মুসলিম ও ইহুদি পন্ডিত ব্যক্তি। এক সময় আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় জোয়ার এসেছিল। এসময় মুসলিম জ্ঞান সাধনায় প্রাচীন গ্রিসের গ্রন্থরাজির সন্ধান কাজ ও অনুবাদ শুরু করেন। এই সংযোগ ইতালির উদীয়মান জ্ঞান র্চচার ক্ষেত্রে সাড়া জাগায়। ইতালীয় রেঁনেসা শিল্প ও সাহিত্যে জাগরণ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ইতালির শিক্ষাকেন্দ্রগুলো কেবল ধর্ম শিক্ষার রীতি বাতিল করে পার্থিব জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শেখাতে শুরু করে। রেনেসাঁ যুগে এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী, সাহিত্যি, চিন্তক ও শিল্পীর আগমন ঘটে যারা শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসকে তাদের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে প্রভাবিত করে গিয়েছেন। জ্ঞান ও আলোর পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। রেনেসাঁ যুগের দুইজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন, কোপারনিকাস এবং গ্যালিলিও। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মনে করতো, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। চন্দ্র, সূর্য সহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এই কথা বলা হয়েছে। রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ইতিহাসের এই সত্য আবিষ্কার করেন। রেনেসাঁ যুগের দুইজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে এখনও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন বলে বিবেচনা করা হয়।

Draft Copy

চিত্র: লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

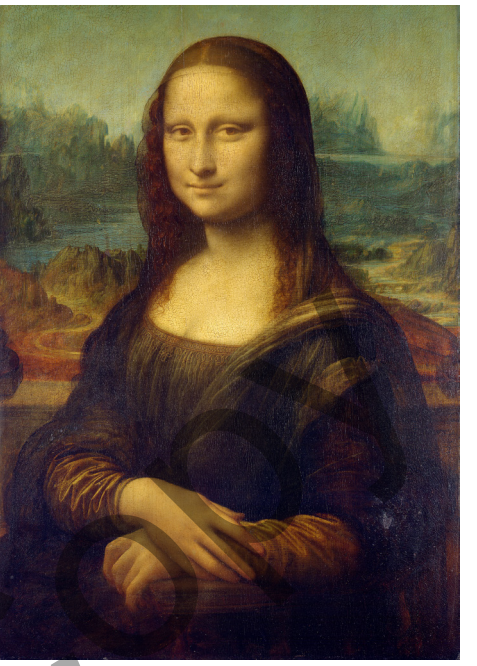

চিত্র: মোনালিসা

Draft C

রেনেসাঁ যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান। পনের শতক থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাজশক্তির হাত ধরে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। জাতিরাষ্ট্রের রাজাগণ বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিল তার উপর ভিত্তি করেই আবারও জাহাজ যোগে দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল হয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে ইতালীর নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে অর্থ সহায়তা নিয়ে ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছে যান। ইউরোপ এবং এশিয়ার মানুষের কাছে আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে তখন অবধি কোনো তথ্যই ছিল না। আটলান্টিক মহাসাগরের অগাধ জলরাশি মধ্যখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলম্বাসের দেখানো পথ ধরেই স্পেনীয়রা আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু অংশে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরপর একে একে পর্তুগিজ এবং ইংরেজ নাবিক এবং বণিকেরাও নতুন মহাদেশটিতে অভিযান পরিচালনা করে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকার স্থানীয় আদি অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যক মানুষকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নতুন মহাদেশের ভূমি এবং সোনারূপা দখল করে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করে।

অনুশীলনী:

খুশি আপা ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিলেন। প্রতিটি দল একটি করে দেয়াল পত্রিকা বানাবে। ১৫০০ সাল পর্যন্ত সময়ে বিশ্ব সভ্যতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিকগুলো কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ এবং ছবির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ফুটিয়ে তুলবে। দেয়াল পত্রিকাগুলো শ্রেণিকক্ষে অথবা স্কুলের ফাঁকা কোনো স্থানে টানিয়ে দিতে হবে যাতে করে সকল শিক্ষার্থী সকল দেয়াল পত্রিকার লেখা ও ছবিগুলো পড়তে ও দেখতে পারে।

শুধু আমেরিকায় নয়, জলপথ আবিষ্কারের এই সূত্র ধরেই এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কলোনী বা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত বিভিন্ন ধরণের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নতুন ভূমির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যেই ইউরোপের রাজশক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করে। এইসব ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং মহাদেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ ঘটে। এই সংযোগ ধীরে ধীরে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন , স্থাপত্যরীতি প্রবেশ করে। সামাজিক নানান প্রথা, বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানেও ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রচলন হতে দেখা যায়।

Draft Copy

শিল্প বিপ্লব

ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনাবলী মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে শিল্প বিপ্লব সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় । কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আদিকাল থেকেই মানুষ নিজের শ্রম দিয়ে সকল কাজ করতো। চাষ ও মালামাল পরিবহণে পশু এবং পালতোলা জাহাজ ব্যবহার করতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের সময় মানুষ প্রথম এই শ্রমক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করে। এই সময় ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। এই ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত হয় বড় বড় ফ্যাক্টরী ও শিল্প কারখানা। ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। শুধু শিল্প নয়, কৃষিক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই শিল্প বিপ্লবের সময় হতেই। কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ, যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন, উন্নতমানের পশু এবং খাদ্যশস্য পৃথক করে নতুন প্রজনন পদ্ধতি আবিষ্কার, খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পশুপালন প্রভৃতি আধুনিক প্রক্রিয়া যুক্ত হয় কৃষিক্ষেত্রে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ থাকায় শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তারা এইসব উপনিবেশ থেকে সংগ্রহ করতো। আবার শিল্প বিপ্লবের ফলে যে প্রভূত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছিল সেগুলো বিক্রি করার ক্ষেত্রও ছিল উপনিবেশগুলো। শিল্প বিপ্লবের সূচনা ইংল্যান্ডে হলেও ধীরে ধীরে তা ইউরোপ সহ পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। এরফলে শিল্পকে উপজীব্য করে বড় বড় আধুনিক নগর গড়ে উঠতে শুরু করে।

নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি যানবাহনেও প্রথমে বাষ্পচালিত এরপর তেল ও বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন বসানো হয়। এরফলে সভ্যতার বিকাশে নতুন এক গতির সঞ্চার হয়। মানব সভ্যতা খুব দ্রুতই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সাথে এই যন্ত্র ও প্রযুক্তির তৈরি হয়েছে অকাট্য এক সম্পর্ক। কৃষি, শিল্প, বিনোদন, পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন যন্ত্রপ্রযুক্তির রয়েছে অবাধ ব্যবহার। এই শিল্প বিপ্লবের ঢেউ ভারতীয় উপমহাদেশেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের ফলে তা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। যাকে বলা হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব। উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হয় তৃতীয় শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান অবদান হচ্ছে, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার। তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের যুগকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা তথ্য প্রযুক্তির যুগও বলা হয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দশকে। অল্প দিনের মধ্যেই তা মানব সভ্যতার নানান ক্ষেত্রে নিয়ে এসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন । ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, কৃত্তিমবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, চালকবিহীন গাড়ি, ড্রোন, কৃত্তিম উপগ্রহ, ন্যানোপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্রভৃতি হচ্ছে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Draft Copy

কৃত্তিমবুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের ফলে যন্ত্রের সহায়তায় জিনপ্রকৌশল থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের নানান প্রান্তে অভিযান পরিচালনা করছে। ইতিহাসের সকল অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে বর্তমানে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব মানুষকে পরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষ এখন নানান বৈচিত্র্যের মধ্যেও একতার সূত্র খুঁজতে শুরু করেছে। সমগ্র বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নানান গড়ানার সমাজ ও সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জীবনধারার গল্প ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও সহ নানান ফরমেটে চিত্রায়িত ও ধারণকৃত হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে মানুষ নিজের সমাজ ও সংস্কৃতি লালন করার পাশাপাশি ভিন্ন ভূমি, ভিন্ন ভিন্ন ধারার সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে। আবারও অনেক ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের সংস্কৃতির পুরোটা অথবা অংশবিশেষ গ্রহণও করছে।

এইভাবেই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে ঐক্য, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন ঐক্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রূপান্তরের অভিজ্ঞতা এখন সহজেই সকল মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রবহমানতা এবং গতিশীলতা এখন বেড়েছে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, গোটা পৃথিবীটাই এখন একটা গ্রামে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলনী:

শিশিল্প বিপ্লব ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পুরনো সমাজ ও সংস্কৃতির উপর নতুন এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। নতুন এই প্রেক্ষাপট একজন মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার উপর কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা অনুসন্ধান করে নিজের ভাষায় লিখি-

Draft Copy

অনুশীলনী:

বিভিন্ন সমাজের বৈচিত্র্যময় প্রেক্ষাপট অনুধাবনে নাটিকা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা বিভিন্ন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এখন আমরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন সমাজের চিত্র নাটিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করব যেখানে বিভিন্ন

ব্যক্তির ভূমিকায় আমরা অভিনয় করব। যেমন মিশরীয় সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা উপস্থাপন করার জন্য আমরা রাজার ভূমিকায়, রাজার সহচারী ভূমিকায়, রাণীর ভূমিকায়, শ্রমিক ভূমিকায় ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করব। এভাবে প্রতিটি সমাজের চিত্র আমরা তুলে ধরব। এজন্য আমরা নিজেরা গল্প তৈরি করে নাটিকা করব। লক্ষ রাখবো নাটিকা যেনো ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ হয়।

Draft Copy

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন

সৃষ্টির শুরু থেকেই মানব সভ্যতা ও প্রকৃতির বন্ধন অবিচ্ছেদ্য। প্রাচীনকাল থেকেই আমরা বসবাস থেকে শুরু করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি; কখনও সরাসরি আবার কখনও বা তার পরিবর্তিত রূপে। প্রতিদিনের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি অবিরাম। আমরা আমাদের বেঁচে থাকার সকল উপাদানই পাই প্রকৃতি থেকে। কিন্তু প্রকৃতির উপাদানের এই অবিরাম ব্যবহার কি কোনো বদল ঘটাচ্ছে আমাদের চারপাশের পরিবেশের? তাই যদি হয়, তাহলে তা কি আমাদের জন্য কোন ধরনের বিপদ ডেকে আনতে পারে? এই বিপদ এড়াবার জন্য আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করে দিতেও পারছি না, বন্ধ করে দিয়ে বাঁচার উপায় নেই। যে সম্পদ ব্যবহারে প্রকৃতির ক্ষতি নাই সেগুলো ব্যবহারের উপায় আমরা খুঁজে বের করতে পারি। এই উপায় খুঁজে বের করার কাজ সহজ নয় মোটেই। এর জন্য আমাদের প্রকৃতিকে আমরা আরো নিবিড়ভাবে দেখবো, জানতে হবে প্রকৃতি ও মানুষের মিথস্ক্রিয়া।

আমরা আমাদের নিচের কাজগুলো করে প্রকৃতিকে ভালোভাবে দেখার ও বোঝার চেষ্টা করবো। জেনে নেবো প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের সাতকাহন।

- প্রথমে আমরা যে ছবি গুলো দেখছি সেগুলো সম্পর্কে নিচের ছকে কিছু বাক্য লিখবো। বাক্যগুলো হবে- এটি কি? কোথায় বা কিভাবে আছে? কিভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত? এবং এটি হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে আমরা কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি?

ছবি	বাক্য
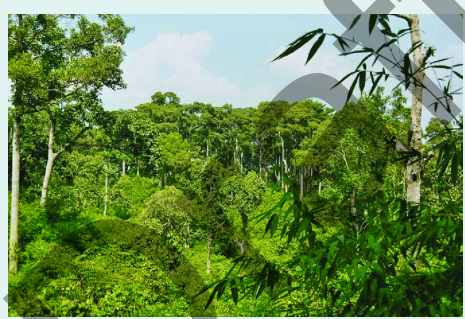	

Draft Copy

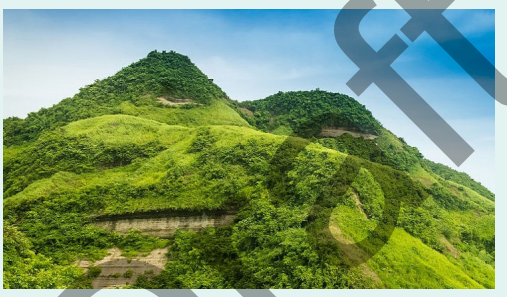	

Draft Copy

- উপরের কাজটি করে প্রকৃতির সকল কিছুর সাথে মানুষের সম্পর্ক যে কতটা নিবিড় তার কিছুটা বুঝতে পারা গেল। এবার আমরা শিক্ষকের সহায়তায় আমাদের আশেপাশে উদ্ভিদ ও প্রাণির সন্নিবেশ আছে এমন একটি জায়গা সরাসরি গিয়ে দেখে আসবো। এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করবো।

পর্যবেক্ষনকৃত প্রতিবেশের সাথে মানুষের কার্যাবলীর প্রভাব

স্থানের ছবি ও নাম	আমাদের সাথে সম্পর্ক আছে	সমস্যা চিহ্নিতকরণ	সংরক্ষণে করণীয়

Draft Copy

- পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল আমাদের বন্ধুদের ও শিক্ষকের সাথে বিনিময় করবো।

বিভিন্ন প্রকার বায়োম সম্পর্কে অনুসন্ধান ও মডেল তৈরি

- আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে আমাদের আশেপাশের প্রতিবেশ দেখেছি। এ সকল প্রতিবেশের সাথে আমাদের সম্পর্কের কিছুটা জেনেছি। পুরো পৃথিবীজুড়েই রয়েছে এরকম অনেক ধরণের প্রতিবেশ। যে সকল স্থানের জলবায়ু, উদ্ভিদ ও প্রাণিও আলাদা রকমের, বাংলায় এ সকল স্থানকে বলে জীবাঞ্চল, ইংরেজিতে বলে বায়োম (Biome)। এ সকল জীবাঞ্চলগুলোর জলবায়ু কেমন, কেমন ভাবে সেখানে উদ্ভিদ ও প্রাণির বিন্যাস ঘটেছে এবং সে সকল স্থানের ভারসাম্য যদি নষ্ট হয়ে যায় বা যেভাবে আছে সেভাবে আর না থাকে, তাহলে আমাদের জীবনে তার কি ধরণের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয় তোমাদের জানতে হবে। এসব জানা হলে আমরা প্রকৃতি ধ্বংস না করে প্রকৃতি ব্যবহারের কথা ভাবতে পারবো। এসব বিষয় অনুসন্ধান করে আমরা বের করবো জীবাঞ্চলগুলোর সাথে মানুষ ও প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া।
- এ কাজটি করার জন্য আমরা প্রথমে পৃথিবীর একটি মানচিত্র দেখবো, পরে আমরা মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানগুলো গ্লোব বা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে খুঁজে বের করে আমাদের বইয়ে দেওয়া ছকে সেগুলো লিখবো।

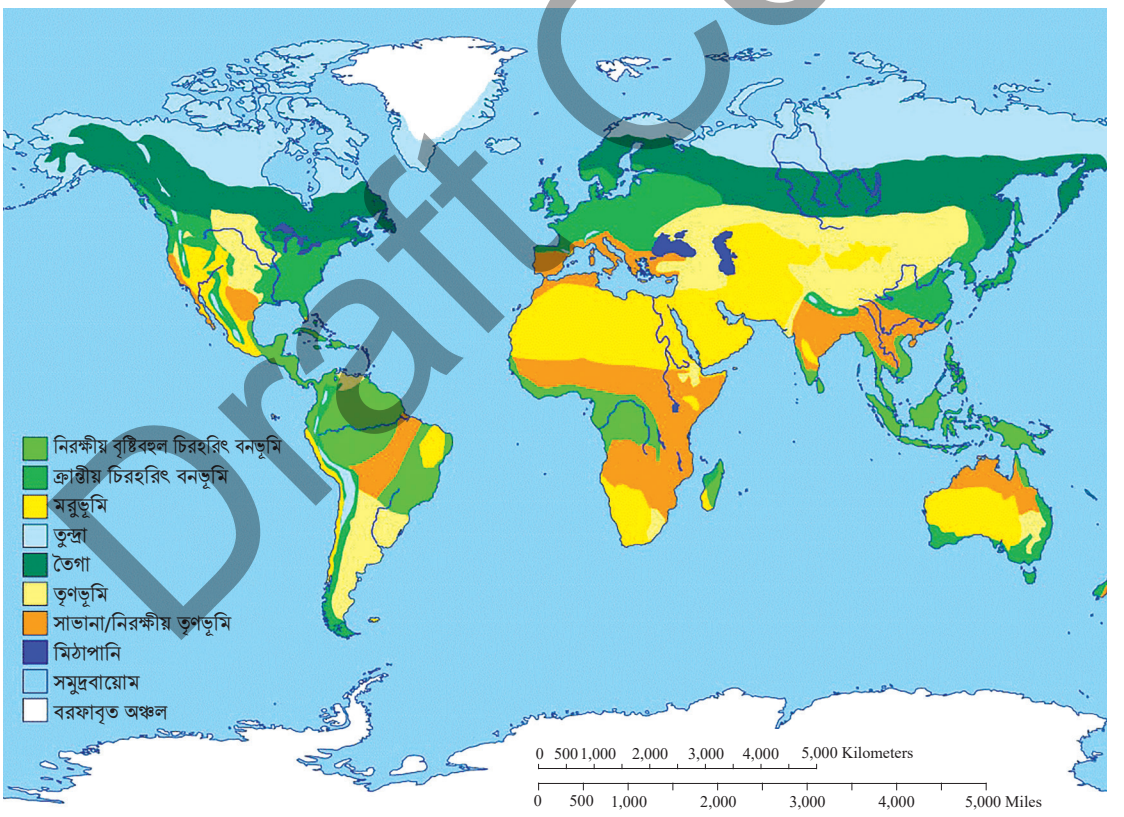

Draft Copy

মানচিত্রে প্রদর্শিত স্থানের নাম	পৃথিবীর মানচিত্রে অবস্থান

- এবার আমরা এসকল বায়োম সম্পর্কে আরেকটু ভালোভাবে জেনে নেবো। যেকোনো বিষয়ে জানার গভীরে যেতে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। সেজন্য আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রত্যেক দল একটি করে বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান করবো। এই অনুসন্ধান কাজটি আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ মেনে করবো। অনুসন্ধানের জন্য আমরা প্রথমে একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবো। প্রশ্নমালাটি আমরা নিচের মতো করে তৈরি করতে পারি, আবার এর সাহায্য নিয়ে অন্যরকম ভাবেও করতে পারি।

বায়োম নিয়ে অনুসন্ধান

১. বায়োমটি কোথায় কোথায় আছে?
২. সেখানে কোন ধরণের জলবায়ু বিদ্যমান?
৩. কী কী ধরণের উদ্ভিদ ও প্রাণীর সন্নিবেশ দেখা যায়?
৪. উক্ত বায়োমটি পৃথিবীর জন্য কী কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে?
৫. উক্ত বায়োমটির জলবায়ু ও অন্যান্য সমাবেশের পরিবর্তন হলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?
৬.
৭.
৮.

Draft Copy

- এই অনুসন্ধান কাজের জন্য আমাদের যে যে তথ্য লাগবে, তা আমরা আমাদের বইয়ের শেষে যে অনুসন্ধানী পাঠ অংশ থেকে নিতে পারি অথবা ইন্টারনেটের সাহায্যও নিতে পারি।
- অনুসন্ধানের কাজ শেষ হলে আমরা আমাদের নিজ নিজ দলের অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত ফলাফল বায়োমের মডেল আকারে উপস্থাপন করবো এবং প্রত্যেকে প্রতিবেদন লেখার নিয়ম মেনে একটি প্রতিবেদন লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দেবো।

চিত্র: বায়োম মডেল

বৈশ্বিকভাবে ও বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদের (বনভূমি) পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি অনুসন্ধান

আমরা তো দেখলাম আমরা আমাদের চারপাশের পরিবেশের উপর কতটা নির্ভরশীল, আর এই পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে বনভূমি। আমাদের বাঁচতে হলে যেমন প্রকৃতিকে প্রয়োজন, তেমনি প্রকৃতির টিকে থাকার জন্য দরকার বনভূমি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতেই বনভূমির পরিমান উল্লেখযোগ্য আকারে কমে যাচ্ছে। এবারে আমরা জানবো, বনভূমি কোথায় কোথায় কমে যাচ্ছে কিংবা তার বর্তমান অবস্থা কী। এর জন্যে প্রথমে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর কোথায় কোথায় বনভূমি রয়েছে এবং সেসব কী নামে পরিচিত। আমরা পরবর্তী কয়েকটি কাজের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন বনভূমি কোথায় অবস্থিত এবং সময়ের সাথে সাথে সেসকল বনভূমির কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে তা অনুসন্ধান করে বের করি।

- প্রথমে আমরা পৃথিবীর মানচিত্র বা একটি গ্লোবের সাহায্যে পৃথিবীর বিখ্যাত বনভূমিগুলো কোন কোন দেশে আছে এবং তারা কোন মহাদেশের অন্তর্গত তা খুঁজে বের করবো;তারপরে নিচের ছকটি পূরণ করবো।

Draft Copy

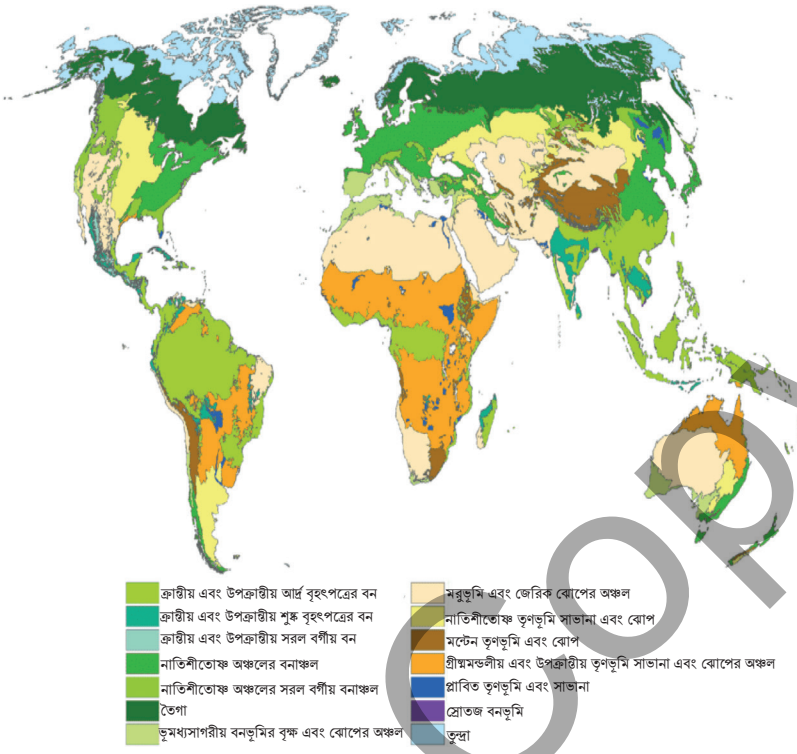

বনভূমির নাম	মহাদেশ ও দেশের নাম

- এই পৃথিবীর অনেকগুলো বনভূমির কথা আমরা জানলাম, দেখলাম সেগুলোর নামের বৈচিত্র্য। এখন আমরা জানবো এই বনভূমিগুলো কী অবস্থায় আছে। এ জন্যে আমরা পৃথিবীর মানচিত্রের সাহায্যে বনভূমিগুলোর ২০০০ সাল এবং ২০২০ সালের অবস্থার পরিবর্তনের তুলনা করবো।

Draft Copy

পৃথিবীর বন আচ্ছাদিত অঞ্চল ২০০০

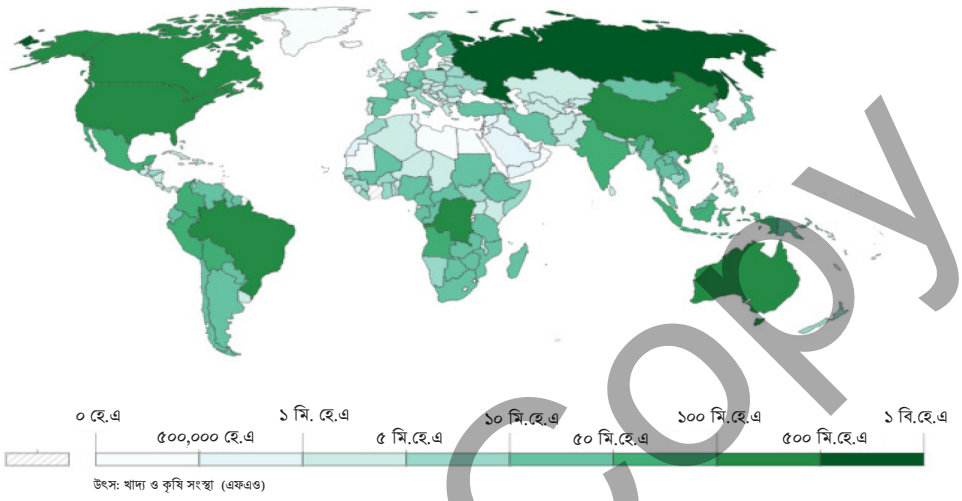

উৎস: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)

পৃথিবীর বন আচ্ছাদিত অঞ্চল ২০২০

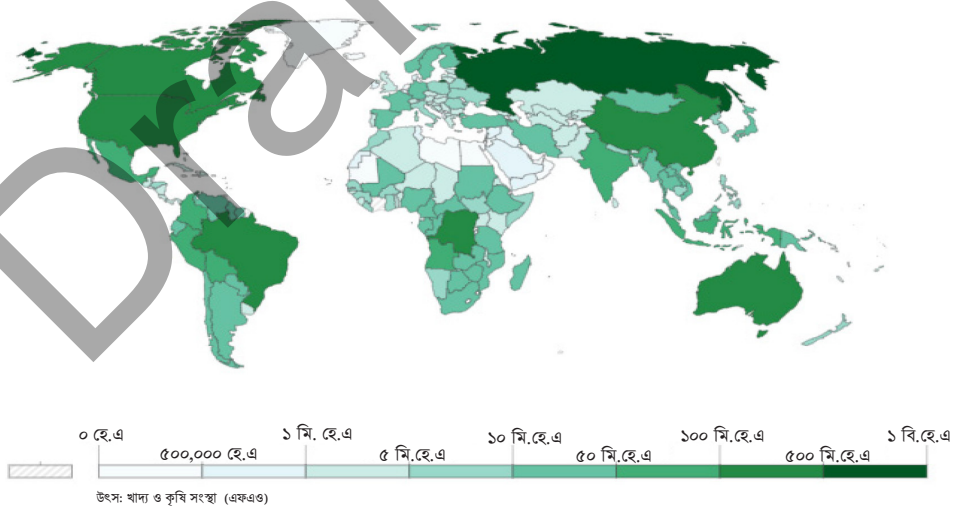

উৎস: খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)

Draft Copy

পৃথিবীর মানচিত্রে বন আচ্ছাদিত অঞ্চল ২০০০ ও ২০২০ সালের তুলনামূলক আলোচনা	

বাংলাদেশের বনভূমি:

- এবার আমরা চোখ রাখবো আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বনাঞ্চলের দিকে । অনুসন্ধান করে বের করবো বনজ সম্পদের বর্তমান অবস্থা; খুঁজে বের করবো বাংলাদেশের প্রকৃতিকে বাঁচানোর উপায়। তাহলেই আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে বাঁচানোর কথা আমরা ভাবতে পারবো। এভাবে সারা পথিবীর মানুষ নিজ নিজ মাতৃভূমির দিকে ফিরে তাকালে সারা পৃথিবীর প্রকৃতি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

অনুশীলনী:

প্রথমে আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রের সাহায্যে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন আচ্ছাদিত এলাকার অবস্থান দেখবো এবং তারপর বাংলাদেশের একটি খালি মানচিত্রে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে বনভূমিগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করবো।

Draft Copy

Draft Copy

- এবারে আমরা যেসব বনভূমিগুলোর নাম ও অবস্থান জানলাম, সেসবের সময়ের সাথে পরিবর্তনের ধরণ দেখবো।

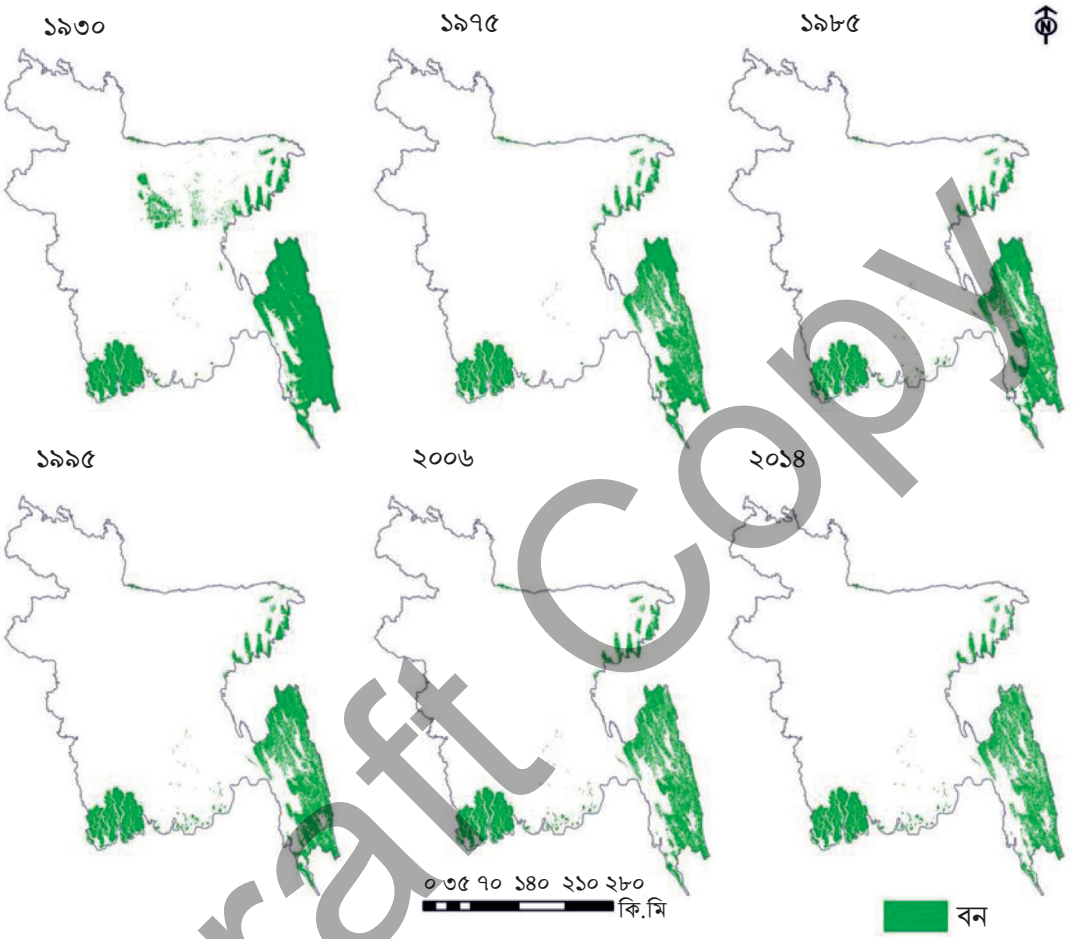

- উপরে বাংলাদেশের বনভূমির দিন দিন কমে যাওয়া দেখলাম। এর ফল যে ভালো নয় তা তো তোমরা জানোই। কিন্তু এর ফলে ঠিক কোন কোন ধরণের বিপদে আমরা পড়তে পারি তা জানতে হলে বা বিপদের মাত্রা নির্ধারন করতে হলে আমাদের আরো গভীরভাবে জানতে হবে। আর এর জন্যে এবার আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করবো।
- আমরা এই অনুসন্ধানের কাজটি দলীয়ভাবে করবো। আর এর বিষয় হবে–

  ক. বাংলাদেশের বনভূমির কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

  খ. পরিবর্তনের কারণগুলো কি কি?

  গ. পরিবর্তনের ফলাফল কি হতে পারে?

  ঘ. প্রকৃতির টেকসই সংরক্ষনে কি কি ভূমিকা নেওয়া যেতে পারে?

Draft Copy

- এই অনুসন্ধান কাজের তথ্য আমরা পাবো অনুসন্ধানী পাঠ অংশে বা ইন্টারনেটের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।
- অনুসন্ধানের কাজ করার সময় আমরা নিচের ছকে প্রদত্ত সূচকগুলো মনে রেখে করবো ।
- অনুসন্ধান পরবর্তী ফলাফল পোস্টার এর মাধ্যমে অথবা নাটক আকারে উপস্থাপন করবো।

বনভূমির নাম ও অবস্থান	বর্তমানে কি কি পরিবর্তন হয়েছে	পরিবর্তনের কারণ সমূহ	এসকল পরিবর্তন আমাদের জীবনে কোন কোন প্রভাব ফেলতে পারে/ ফলাফল	টেকসই উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আমাদের করণীয়

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী কাজের মাধ্যমে এটা বুঝতে পারলাম যে মানুষ দিন দিন প্রকৃতির একটা ছোট অংশ হয়েও অবিরত প্রকৃতিকে ধ্বংস করে চলছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। এর ফলাফল যে কতটা মারাত্মক তা ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়। এখন আমরা পরবর্তী কাজগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী ও বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিতে পারি।

- প্রথমে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে যে ভূমিরূপের অভিধান তৈরি করেছিলাম, সেই কথা মনে করার চেষ্টা করি। কেউ ভুলে গিয়ে থাকলে পুরানো বই জোগাড় করে দেখে নিতে পারবে। এখন আমরা আমরা প্রত্যেকে ষষ্ঠ শ্রেণির মত একটি অভিধান তৈরি করবো। তবে সেটি হবে আমাদের দুর্যোগ অভিধান। কাজটি করার জন্য প্রত্যেকে আমরা একটি ডায়েরি বানাবো, পরে আমরা যে যে দুর্যোগ সম্পর্কে জেনেছি তার প্রত্যেকটির একটি করে ছবি এবং সেটি সম্পর্কে কয়েকটি লাইন লিখবো।

Draft Copy

চিত্র: দুর্যোগ অভিধান

- আমাদের অভিধান বানানো হলে আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথেও তা বিনিময় করবো।
- এরপর আমরা দলে ভাগ হয়ে প্রকল্পভিত্তিক কাজের মাধ্যমে আমাদের এলাকায় কোন কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, এ সকল দুর্যোগের কারণে আমাদের কোন কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং এটি প্রতিরোধ করতে টেকসই ব্যবস্থাপনা কি কি হতে পারে তা অনুসন্ধান করে বের করবো। এই অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা আমাদের পরিবার বা এলাকায় মানুষদের কাছ থেকে নিতে পারবো।
- আমরা আমাদের ফলাফলগুলো নিয়ে একটি পত্রিকা তৈরি করবো। আমাদের পত্রিকার শিরোনাম হবে আমাদের পত্রিকা: দুর্যোগ সংখ্যা।

Draft Copy

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা পালন

আমরা জানি আমরা বাঁচার জন্য প্রকৃতির ওপর কতটা নির্ভরশীল। অনেকগুলো কাজের মাধ্যমে আরো জানলাম প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক কতটা নিবিড়। কিন্তু আমরা কেবল প্রকৃতি থেকে নিচ্ছি, কিন্তু কিছুই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি না। আমরা যদি প্রকৃতিকে সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার না করি, যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে একদিন প্রকৃতির আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষমতা নিঃশেষ হবে যাবে। তাহলে আমরা প্রকৃতি ঠিক রেখে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর পরিকল্পনা করবো। আর এর নাম হলো টেকসই উন্নয়ন। এই পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই বন্ধন আরো সুদৃঢ় করতে পারবো। তাহলে আমাদেরও উচিৎ আমাদের নিজস্ব পরিসরে টেকসই উন্নয়নের চর্চা করা, তাই না? এ কাজগুলো আমরা আমাদের সক্রিয় নাগরিক ক্লাব ও প্রকৃতি সংরক্ষণ ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবো।কিন্তু আমরা এখনতো ছোটো তাই আমরা আমাদের এসকল কাজে এলাকার মানুষের সহযোগিতা নেবো।

চলো তাহলে আমরা কি কি কাজ করতে পারি তার একটি তালিকা দলে বসে চূড়ান্ত করে ফেলি।
১.
২.
৩.
৪.
৫.

এলাকায় সম্পদের টেকসই ব্যবহার মূলক কাজ:

১.	বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরণের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
২.	এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ এবং বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
৩.	এলাকায় ও নিজের আবাসনে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ সব ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণ
৪.	নালা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এলাকাবাসীকে সচেতন করা।
৫.	সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

সবশেষে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের সামনে অপেক্ষা করছে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। আর এই সকল চ্যালেঞ্জ তখনই মোকাবেলা করতে পারবো যখন আমরা টেকসই ভাবে সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম হবো। আর এই কাজে আমরা সফল হবো তোমাদের মতো ভবিষ্যত নাগরিকদের মাধ্যমে, তোমরাই গড়ে তুলবে, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত-সহিষ্ণু নিরাপদ সমৃদ্ধ বদ্বীপ।

Draft Copy

সুরক্ষিত রাখি প্রকৃতি ও মানুষের বন্ধন: অনুসন্ধানী অংশ

তুন্দ্রা বায়োম

আমাদের দেশে প্রকৃতি খুবই প্রাণবন্ত। যেদিকে তাকাই কোন না কোন গাছপালা চোখে পড়ে। কত রকম গাছ, তরুলতায় সবুজ এ দেশ। এখানে যেমন প্রচুর বৃষ্টি হয় তেমনি রোদের তাপও মেলে পর্যাপ্ত। এমন পরিবেশ গাছপালার জন্য খুব অনুকূল। তাই ভাবুক মানুষের ভাষায় এ দেশ হলো- সুজলা -সুফলা, শস্য-শ্যামলা। জানোতো, গাছপালা থাকলে পশুপাখিও থাকবে। কোন কোন জায়গায় গাছপালারই রাজত্ব। যেমন সুন্দরবন, মধুপুর, পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন বন।

আমাদের আবাসভূমি এ পৃথিবী এমন এক অনন্য গ্রহ যেখানে বিভিন্ন পরিবেশে নানা ধরনের জীবের সন্নিবেশ ঘটেছে। বিশাল সমুদ্র থেকে সুউচ্চ পর্বত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ তাদের পরিবেশের সাথে একটি বিস্ময়কর সমন্বয়ের মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলে বিশেষ ধরনের জলবায়ু ও মৃত্তিকায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র ভৌগোলিক এলাকাকে বায়োম বলা হয়ে থাকে। বায়োমকে বাংলায় জীবভূমি বা জীবাঞ্চলও বলা যেতে পারে। প্রাণী বা উদ্ভিদের আবাসস্থলের (habitat) থেকে বড় পরিসরে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, মৃত্তিকা ইত্যাদিসহ বিবেচনায় নিয়ে বায়োমকে চিন্তা করা হয়। এই বৈচিত্র্যময় বায়োমগুলো বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) বজায় রাখে এবং বিভিন্ন প্রজাতিকে ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অংশে আমরা বায়োমের আকর্ষণীয় জগতকে জানবো এবং এর অস্তিত্বের সৌন্দর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করবো।

Draft Copy

১. তুন্দ্রা (Tundra): তুন্দ্রা বায়োম হল এমন অঞ্চল যেখানে তাপমাত্রা খুব কম, শীতকাল দীর্ঘ এবং জীবের উৎপাদনকাল সংক্ষিপ্ত। এখানকার মাটি ঠান্ডা এবং অপেক্ষাকৃত কম উর্বর, ছোট আকারের খুব অল্প গাছপালা জন্মায়। বৃষ্টিপাত খুবই অল্প, কিন্তু প্রায়ই প্রবল বায়ুপ্রবাহ হতে দেখা যায়। মানব বসতিহীন তুন্দ্রা অঞ্চলকে এর বৈশিষ্ট্যের কারণে মেরু মরুভূমিও বলা হয়ে থাকে। বরফ আবৃত আর্কটিক অঞ্চলের নিচেই তুন্দ্রা বায়োম অবস্থিত যা উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। আলাস্কা এবং কানাডার প্রায় অর্ধেক অংশ তুন্দ্রা বায়োমের অন্তর্গত। আর্কটিক তুন্দ্রা অঞ্চলে স্থায়ীভাবে হিমায়িত মাটির স্তর দেখা যায় যাকে permafrost বলা হয়। এখানে বসবাসকারী প্রাণীদের ত্বকের নীচে পুরু চর্বির স্তর থাকে এবং গায়ের বর্ণ সাধারণত তুষারের মতই সাদা হয় যা তাদেরকে অভিযোজনে সহায়তা করে। মেরুভাল্লুক, বলগা হরিণ, আর্কটিক শিয়াল, সামুদ্রিক সিংহ, বিভিন্ন ধরনের সীল ইত্যাদি বলিষ্ঠ প্রাণী প্রজাতিরা এই কঠিন পরিবেশে টিকে থাকতে পারে। পরিযায়ী পাখি যারা শীতকালে দক্ষিণে চলে যায় তাদেরকেও এ তুন্দ্রা অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। আপাত দৃষ্টিতে যদিও তুন্দ্রা অঞ্চলকে বৃক্ষহীন মনে হয় তবে এখানে স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ায় ফুল ফোটে এবং দ্রুত বৃদ্ধি হয় এমন লোমশ ডালপালার ক্ষুদ্র আকারের উদ্ভিদ, যেমন-তুলা, লাইকেন, এমাপোলা, বেরি ইত্যাদি দেখা যায়। এই বায়োম বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটিয়ে জীববৈচিত্র সমৃদ্ধ করেছে। তবে সারা বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলেও পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন তুন্দ্রা অঞ্চলের বরফ আগামী কিছুদিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে গলে যেতে পারে। তাতে এখানকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর বংশবিস্তার ও স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হবে। যথাযথ পরিবেশ না পাওয়ার কারণে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। আবার গলে যাওয়া বরফ থেকে যে পানি তৈরি হবে তা সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি করবে। এতে আমাদের দেশের মতো সমুদ্র উপকূলীয় সমতল ভূমির দেশ সমূহে নানারকম সমস্যা, যেমন-নিম্নভূমি তলিয়ে যাওয়া, লবণাক্ত এলাকার বিস্তৃতি এবং কৃষিকাজ ব্যাহত হয়ে খাদ্য উৎপাদন হ্রাসের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের দেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে উপকূলীয় অঞ্চলের কিছু অংশ তলিয়ে গেলে সেখানকার ব্যাপক সংখ্যক লোকজনের জলবায়ু-উদ্বাস্তু হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

২. তৈগা বায়োম (Taiga Biome): তৈগা (Taiga) একটি রাশিয়ান শব্দ, যার অর্থ হল সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বন। উত্তর গোলার্ধে তুন্দ্রা অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া, বিশেষভাবে কানাডা এবং রাশিয়ার সুবিস্তৃত সরলবর্গীয় অরণ্য অঞ্চলই হল তৈগা। তুন্দ্রা বায়োমের যেখানে শেষ তার দক্ষিণে তৈগা বায়োম শুরু যা কর্কটক্রান্তি রেখার উত্তরে ৫০ থেকে ৭০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের মাঝখানে ছড়িয়ে আছে। এটি রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র (মূলত আলাস্কা অঞ্চল), সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, এস্টোনিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (মূলত স্কটিশ উচ্চভূমি অঞ্চল), আইসল্যান্ড, কাজাখস্তান (উত্তরাংশ), মঙ্গোলিয়া (উত্তরাংশ), জাপান (হোক্কাইডো দ্বীপ) প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত রয়েছে। ইংরেজিতে এটি Boreal Forest বা Snow Forest নামে পরিচিত। এই বায়োমের প্রধান উদ্ভিদ প্রজাতিগুলি হল পাইন, বার্চ, লার্চ, এল্ডার, উইলো, পপলার, ওক, ম্যাপল, স্প্রুস, ফার প্রভৃতি। তৈগা বায়োমের প্রধান প্রাণী প্রজাতিগুলি হল বাদামী ভালুক, কালো ভালুক, সাইবেরিয়ান বাঘ, নেকড়ে, বলগা হরিণ, লাল শিয়াল, ভোঁদড়, নেউল, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রভৃতি। এ বায়োমের সরলবর্গীয় অরণ্য বা পাইন বনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এধরনের গাছের পাতাগুলো ফলা আকৃতির এবং উপর দিকে খাড়া থাকে। এদের ডালপালা ছড়ায় না বিশেষ, সোজা উঠে যায় বলে এরা হল সরল বর্গের গাছ বা সরলবর্গীয় বৃক্ষ। এর ফলে শীতকালে এর উপরে পড়া তুষার বা বরফ সহজেই মাটিতে ঝরে যায়। এ বায়োমে সারাবছরই তুষারপাত বা বৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত বছরের শীতকালের ছয়মাস এখানে

Draft Copy

নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যে তুষারপাত হয় তার গড় উচ্চতা ৫০ থেকে ১০০ সে.মি. হয়ে থাকে। দুই থেকে তিন মাস স্থায়ী গ্রীষ্মকালে এই বায়োমে গড়ে ৭৫ সে.মি. এর মতো বৃষ্টিপাত হয়। তুন্দ্রার মতো তৈগা বায়োমও জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের শিকার হচ্ছে।

৩. নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল (Tropical Rainforest): এই বায়োম হলো সতেজ এবং প্রাণবন্ত বাস্তুতন্ত্র যা প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং ঘন গাছপালা সমৃদ্ধ। এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্র ভূ-ভাগের প্রায় ১৪ শতাংশ জুড়ে এ বনভূমি থাকলেও তা এখন কমে প্রায় ৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিষুবরেখার উত্তর বা দক্ষিণে ১০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চল বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া ইন্দো মালয়েশিয়া অঞ্চল, নিউগিনির দ্বীপসমূহ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় এই বায়োম ছড়িয়ে আছে। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বনের গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হল আমাজন বনাঞ্চল যা অক্সিজেন উৎপাদনে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এ কারণে এটি ''পৃথিবীর ফুসফুস" হিসেবে পরিচিত। এটি বিশ্বের বায়ুমন্ডলের কার্বন শোষণ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখছে। এছাড়াও এটি অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাস স্থল, যার অনেকগুলো এখনো আবিষ্কৃত হয়নি বলে মনে করা হয়। নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বনাঞ্চলের উদ্ভিদগুলো দ্রুত বৃদ্ধিপায় এবং গাছপালা খুব ঘন থাকায় তাদের মধ্যে সূর্যের আলো পাওয়ার জন্য একধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এ ধরনের বনভূমির কিছু এলাকায় ঘন বৃক্ষরাজির কারণে সূর্যালোক মাটির কাছে পৌঁছায়না। এ বনভূমির মাটি বৃষ্টির কারণে বেশিরভাগ সময় আর্দ্র এবং স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং দিনে-রাতের তাপমাত্রার ব্যবধান খুবই কম। এ অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০০ সে.মি. এর বেশি। তবে নিরক্ষরেখা থেকে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমতে থাকে। এখানকার গাছের পাতাগুলো বেশ বড় এবং প্রশস্ত হয় এবং সারাবছর ধরে সবুজ থাকে। একারণেই এ বনভূমিকে চিরসবুজ বন বলা হয়। এই বায়োমে প্রধানত তিন ধরনের উদ্ভিদ দেখা যায়। যথা- বৃক্ষ, লতানো বা আরোহী উদ্ভিদ এবং পরজীবী বা পরগাছা জাতীয় উদ্ভিদ।

এই ধরনের বনে বৃক্ষপ্রজাতির মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রধান বৃক্ষের মধ্যে রয়েছে রোজউড, রাবার, আবলুস, মেহগনি, চাপালিস, গর্জন ইত্যাদি। লতানো বা আরোহী উদ্ভিদের মধ্যে আছে ফার্ণ, লিয়ানাস। পরজীবী ও আরোহী উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে অর্কিড, মস, লিচেন, শৈবাল ইত্যাদি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উষ্ণতার কারণে এই বায়োমে উদ্ভিদের দ্রুত বৃদ্ধি হয় বলে প্রাণীদের খাদ্যের জন্য অন্যত্র যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এ বনের ভূমিতে অবস্থানকারী প্রাণীদের মধ্যে আছে হরিণ, হনুমান, কটিমুন্ডিসের মতো প্রাণী। শিম্পাঞ্জী, বাইসন, হাতি, চিতাবাঘ, গরিলার মতো প্রাণীরা এ বনের ঘন জঙ্গালের মধ্য দিয়ে সহজেই চলাচল করতে পারে। এ বনে রাতের বেলায় সক্রিয় প্রাণীদের মধ্যে আছে অপসাম, আর্মাডিলো, জাগুয়ার, পেঁচা ইত্যাদি। এ বনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৈচিত্র্যপূর্ণ পাখির সমাবেশ দেখা যায়। পাখিদের মধ্যে বাজপাখি, সুইফ্ট, কুরাসোস্, টিনামুস, হামিং, বাদুর, পতঙ্গভুক ময়ূর, বিভিন্ন প্রজাতির মোরগ, দীর্ঘ ঠোঁটের টোকান, লম্বা লেজওয়ালা টিয়া, বারবেট, কটিঙ্গা, বিলবার্ড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিরক্ষীয় চিরহরিৎ বায়োমের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন সর্বাধিক যা পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদের প্রাথমিক উৎপাদনের (সূর্যালোক ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদন) প্রায় ৪০ শতাংশ। তবে সারাবিশ্ব জুড়েই মানুষের নির্বিচার বৃক্ষ নিধনের শিকার এ বনভূমিও। অনেক দেশে এ বনভূমি ধ্বংস করে কৃষিজমিতে রুপান্তর করা হয়েছে। যার ফলে বনভূমির উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে, বন্যপ্রাণী, পাখি তাদের বাসভূমি হারিয়েছে। এতে আমাদের জন্য বেশ কিছু কৃষি জমি বাড়লেও পরিবেশগত নানা ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ী এলাকার বনভূমিতে বৃক্ষ নিধনের ফলে সেখানে ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বসের মতো প্রাকৃতিক

Draft Copy

দূর্যোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বনভূমি ধ্বংসের কারণে জীববৈচিত্র্যও ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে। তবে অনেক রাষ্ট্রই এ ব্যাপারে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বনভূমির বিনাশ মোকাবেলায় কাজ করছে।

৪. মরুভূমি (Desert): চিরহরিৎ বনাঞ্চলের সতেজ ও প্রাণবন্ত পরিবেশের বিপরীতে মরুভূমি হলো শুষ্ক বায়োম যা সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত এবং রাত-দিনের তাপমাত্রার অনেক বেশি তারতম্যের জন্য পরিচিত। এ ধরনের বায়োমে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২০-২৫ সে.মি. থেকে বেশি নয়। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে বায়ু আরোহণ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প হারিয়ে মরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এখানকার বাতাস অত্যন্ত শুষ্ক থাকে। আর জলীয়বাষ্প কম থাকায় সূর্যরশ্মি সরাসরি ভূমিতে পড়ে দিনের বেলায় অতিদ্রুত তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আবার বাতাসে আর্দ্রতা কম এবং আকাশে মেঘের উপস্থিতি না থাকায় রাতের বেলায় ভূ-পৃষ্ঠ দ্রুত তাপ হারিয়ে শীতল হয়ে যায়। মরুভূমিগুলো বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি নিয়ে গঠিত এক অনন্য ভূমিরূপ ধারণ করে। এক সময়ে এসব মরূভূমিতে বড় বড় পাথর ছিল যা দিনের তাপ আর রাতের শীতল আবহাওয়ার কারণে যথাক্রমে প্রসারণ ও সংকোচনের মাধ্যমে ভেঙে ক্রমে বালির সৃষ্টি হয়। এখানে স্থায়ী বা সাময়িক কোন জলাশয় বা জলধারা দেখা যায়না।

আপাতদৃষ্টিতে মরু বায়োমের প্রকৃতি চরম ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে অনন্যভাবে অভিযোজিত গাছপালা এবং প্রাণী রয়েছে। তবে মরু বায়োমে উদ্ভিদ বা প্রাণীর বৈচিত্র্য অন্য বায়োমের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। মরুতে যে সব উদ্ভিদ জন্মায় তারা মূলত জেরোফাইটিক শ্রেনির যারা শুষ্ক আবহাওয়ায় টিকে থাকতে পারে। শক্ত ঘাস, কাঁটাযুক্ত ও লম্বা শিকড়যুক্ত ঝোপঝাড়, যেমন ক্যাকটাস, খেজুর ইত্যাদি মরুভূমির পরিচিত উদ্ভিদ। স্বল্পস্থায়ী আর্দ্র ঋতুতে কিছু ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের ফুল ফুটতে দেখা যায়। প্রাণীদের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা নিশাচর। মরুভূমির কীটপতঙ্গের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছু, মাকড়সা এবং অন্যান্য পোকামাকড়। টিকটিকি, গিলা দানব, র‍্যাটেল স্নেক ইত্যাদি বেশ কিছু সরীসৃপ এ পরিবেশে অভিযোজিত হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে উট, ক্যাঙ্গারু, সাদা লেজের হরিণ, পাহাড়ী ভেড়া, খরগোশ, ইঁদুর, শিয়াল, ব্যাজার অন্যতম। পাখিদের মধ্যে ক্যাকটাস-কাঠঠোকরা, দাঁড়কাক, গর্ত করা পেঁচা, টার্কি, শকুন, সুইফ্ট, গিলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমি সাহারা যা আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত। এটা লক্ষ্যণীয় যে, মরুভূমির উদ্ভিদ ও প্রাণীগুলো পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যের অনন্য নিদর্শন। এদের উপস্থিতি প্রকৃতির ভারসাম্যের জন্য অত্যাবশ্যক। মানুষের নানা কর্মকান্ডের মাধ্যমে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে যাতে এসব জীবের বংশবৃদ্ধি এবং স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত না হয় সেজন্য মানুষকেই উদ্যোগ নিতে হবে।

Draft Copy

পৃথিবীর স্থল ও সমুদ্র ভাগে বিদ্যমান বায়োমসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ প্রাণীদের বিস্তরণ

৫. তৃণভূমি (Grasslands): তৃণভূমি বায়োম বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ঘাস বা তৃণ এবং অল্প কিছু বৃক্ষ দ্বারা আবৃত। গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ উভয় অঞ্চলেই তৃণভূমি রয়েছে। এগুলো অনেক বৈচিত্র্যময় বাস্তুসংস্থানকে ধারণ করে। তৃণভূমির বায়োমকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা-(ক) ক্রান্তীয় তৃণভূমি বা সাভানা (Tropical Grassland or Savanna) এবং (খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমি (Temperate Grassland)।

(ক) সাভানা তৃণভূমি উভয় গোলার্ধের ১০ থেকে ২০ ডিগ্রি অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। সারাবছর তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের উপরে থাকে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২৫-৭৫ সে.মি.। বৃষ্টিপাতের ৮০-৯০ শতাংশ গ্রীষ্মকালেই সংগঠিত হয়। বিস্তৃত পরিসরে সাভানা তৃণভূমির মধ্যে ক্রান্তীয় তৃণভূমি ও ক্রান্তীয় ঝোপঝাড় অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব আফ্রিকা ও সাহারার দক্ষিণাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, মাদাগাস্কার দ্বীপ, মধ্য ও উত্তর আমেরিকায় সাভানা তৃণভূমি রয়েছে। সাভানা তৃণভূমি অঞ্চলে তিনটি ঋতু পরিলক্ষিত হয়, যথা: শুষ্ক শীতকাল, শুষ্ক গ্রীষ্মকাল এবং আর্দ্র গ্রীষ্মকাল। এখানে আর্দ্র গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন আকৃতির উজ্জ্বল সবুজ বা রুপালি রঙের তৃণ জন্মায় যা শুষ্ক শীত বা শুষ্ক গ্রীষ্মকালে বাদামি ধূসর রঙ ধারণ করে এবং নুয়ে পড়ে। এই তৃণভূমিতে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প কিছু বৃক্ষ দেখতে পাওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে বৃক্ষগুলোর পাতা ঝরে পড়ে বা ধূসর বর্ণ ধারণ করে। সাভানা তৃণভূমির ভূমিস্তরটিতে প্রধানত তৃণ ও বীরুৎ জাতীয় গাছ দেখা যায় যাদের উচ্চতা ৮০ সে.মি. থেকে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে আফ্রিকার তৃণভূমিতে ৫ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত তৃণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান তৃণপ্রজাতির মধ্যে রয়েছে পাস্পালাম, প্যানিকাম, স্কিমিসিয়া ইত্যাদি। এছাড়া গুল্ম ও কাঁটা জাতীয় কিছু উদ্ভিদ, পাইন, ইউকিলিপ্টাসও দেখা যায়। সাভানা বায়োমের প্রাণীদের ব্যাপারে সকল শ্রেণীর মানুষের বিশেষ কৌতূহল রয়েছে। আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে সবচেয়ে বেশি তৃণভোজী স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়। এসবের

Draft Copy

মধ্যে আছে মহিষ, জেব্রা, জিরাফ, সিংহ, চিতা, হাতি, অ্যান্টিলোপ, জলহস্তী, গ্যাজেল ইত্যাদি। অস্ট্রেলিয়ার সাভানাতে ক্যাঙ্গারু বাস করে। সাভানা তৃণভূমি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির অভয়ারণ্য। এসব পাখির মধ্যে টুকান, তোতাপাখি, ফিঞ্চ, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, উটপাখি, এমু অন্যতম। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে মাছি, পঙ্গপাল, উই, পিপীলিকা, বিছা, আরশোলা, ফড়িং ইত্যাদি।

(খ) নাতিশীতোষ্ণ তৃণভূমিতে সাভানা তৃণভূমির মতো বড় গাছ দেখা যায়না। এ তৃণভূমি মূলত মহাদেশীয় অঞ্চলের সেইসব এলাকাতে দেখা যায় যেখানে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কম বৃষ্টি হয়। সারা পৃথিবী জুড়েই এ তৃণভূমি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। ইউরেশিয়ান স্তেপ, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, উত্তর আমিরিকার প্রেইরি, নিউজিল্যান্ডের ক্যান্টাবেরি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য তৃণভূমি বায়োম। এই বায়োমে গ্রীষ্মকালীন গড় তাপমাত্রা ২০-২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এখানে গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৫০ থেকে ৬৫০ সে.মি.। ইউরেশিয়ান স্তেপে টার্ফ, ট্রিফোলিয়াম, স্টিপা এবং জেরোফাইটের মতো কাঁটা জাতীয় ঘাস জন্মায়। প্রাণীদের মধ্যে আছে সাইগা অ্যান্টিলোপ, মঙ্গোলিয়ান গ্যাজেলস, বুনো ঘোড়া, ঈগল, বাজপাখি, রোডেন্ট। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি তৃণভূমিতে ব্লুয়েস্টেম, সুইচ, নিডল, জুন, বাফেলো প্রজাতির ঘাস দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীদের মধ্যে আছে-বাইসন, রোডেন্ট, নেকড়ে, শেয়াল, ঈগল, বাজপাখি। দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস তৃণভূমিতে ব্রীজা, পাসপালুম, লুনিয়াম প্রভৃতি ঘাস দেখা যায়। এখানকার পম্পা হরিণ, ভিসকা রোডেন্ট, বক, হাঁস প্রাণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আফ্রিকার তৃণভূমিতে অ্যান্টিলোপ, হায়েনা, শিয়াল, লেপার্ড, জেব্রা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর বিচরণ দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার তৃণভূমিতে ক্যাঙ্গারু, ওয়াল্লারুস, মেষ, এমু রয়েছে।

তৃণভূমি বায়োম কৃষিকাজ এবং গবাদি পশুর চারণভূমি হিসেবে অপরিহার্য। আবার এসব বায়োমে জীববৈচিত্র্যের এক অনন্য সমাবেশ ঘটেছে। তবে মানুষের অবিবেচিত কর্মকান্ডের কারণে এসব বায়োমের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। তৃণাঞ্চল পুড়িয়ে মানুষ অনেক স্থান কৃষি জমিতে রুপান্তর করেছে। বহু বছর ধরে এভাবে তৃণভূমি পুড়িয়ে কৃষি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের ফলে তৃণভূমি অনেক সংকুচিত হয়েছে এবং সেসব স্থানের উদ্ভিদ ও প্রাণীরা ঝুঁকিতে পড়েছে।

৬. সামুদ্রিক বায়োম (Marine Biomes): তোমরা তো জান, পৃথিবী গ্রহটিতে স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ অনেক বেশি। বিশাল মহাসাগর এবং সাগর সমূহ নিয়ে গঠিত সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭০ ভাগ দখল করে আছে। এটি একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় বাস্তুতন্ত্র, যা বিভিন্ন ধরনের রহস্যময় সামুদ্রিক জীব, যেমন- বিচিত্রসব মাছ, তিমি, প্রবাল প্রাচীর এবং অগণিত অন্যান্য জীবসমূহকে ধারণ করছে। সমুদ্রের পানি লবণাক্ত হওয়ায় সামুদ্রিক বায়োমের জীবদের লবণাক্ত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হতে হয়। এই বায়োম আঞ্চলিক জলবায়ুর ধরণ দিয়ে তেমন একটা প্রভাবিত নয় বরং বিভিন্ন এলাকার জলবায়ুর ধরনকে মহাসাগরসমূহ নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে পারে। পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের বাইরেও অন্যান্য সাগর ও উপসাগরও এ বায়োমের অন্তর্ভুক্ত। স্থলভাগে অবস্থিত লবণাক্ত পানির হ্রদ সমূহে সামুদ্রিক বায়োমের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন: কাস্পিয়ান হ্রদ, জর্ডান ও ইজরায়েলের মধ্যবর্তী মৃতসাগর, ইরানের উরমিয়া হ্রদ ইত্যাদি। সামুদ্রিক বায়োমকে উল্লম্ব ভাবে তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা: পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের স্তর (euphotic zone) যার গভীরতা প্রায় ২০০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে, এর পরের অপেক্ষাকৃত কম সূর্যালোক পাওয়া স্তর (dysphotic zone) এবং সবার নিচে সূর্যালোক পৌঁছায়না এমন স্তর (Aphotic zone)। সূর্যালোক প্রাপ্তির তারতম্য অনুযায়ী জীবের ধরণ ও বিস্তরণ নির্ধারিত হয়। তবে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পাওয়া উপরের ইউফোটিক স্তরে সমুদ্র

Draft Copy

বায়োমের প্রায় ৯০ শতাংশ জীবের বসবাস। সামুদ্রিক বায়োমকে তাদের অবস্থানের ভিত্তিতে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: মহাসাগরীয় বায়োম, প্রবাল প্রাচীরের বায়োম এবং মোহনার বায়োম। এসব বায়োমের পরিবেশ, বিদ্যমান উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীবের মধ্যে পার্থক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। সামুদ্রিক বায়োমকে বোঝার সুবিধার জন্য আমরা চিত্র থেকে সাগরের গঠন দেখে নেব।

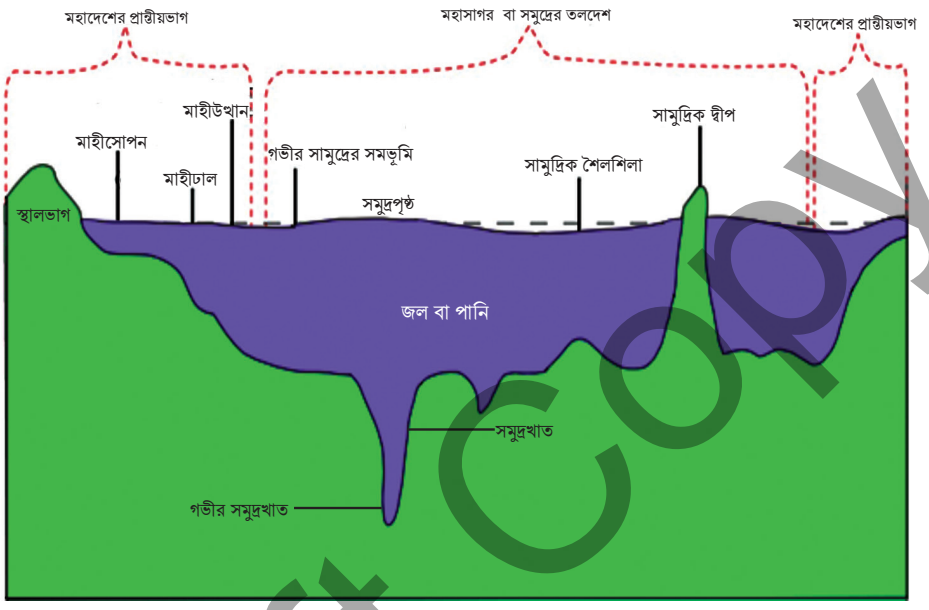

চিত্রঃ সমুদ্র এবং সংলগ্ন স্থলভাগ, দ্বীপ এর গঠনগত

সমুদ্র বায়োমের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদকে হ্যালোফাইট (halophytes) বলা হয়। সমুদ্রের লবণ-সহিষ্ণু উদ্ভিদ সমূহ বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী। এখানে ঘাস, ঝোপঝাড়সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফুল হয়ে থাকে। জৈবিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদসমূহকে প্রধানত সী-গ্রাস, কেল্প, সারগাসাম, ফাইটোপ্লাংটন এবং লাল শৈবাল এই পাঁচ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মজার বিষয় হচ্ছে, সামুদ্রিক উদ্ভিদ জগত অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং সংখ্যায় অনেক বেশি হলেও এখানে জন্মানো ৯৯ শতাংশ উদ্ভিদের জন্য লবণাক্ত সমুদ্র প্রাণঘাতি হিসেবে কাজ করে। আর মাত্র ১ শতাংশ উদ্ভিদ লবণাক্ত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে টিকে থাকে।

সমুদ্র বায়োমের প্রাণীরা এতবেশি বৈচিত্র্যময় যে ছয়টি প্রধান প্রাণী শ্রেণিরই এখানে উপস্থিতি দেখা যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত উভচর প্রাণীরা, যাদের একটি অংশ সরাসরি সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে বাস না করে বরং অপেক্ষাকৃত কম লোনা পানিতে বসবাস করে। অমেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে স্পঞ্জ, শামুক, ঝিনুক, নানা ধরনের কীট-পতঙ্গ, জেলিফিশ। সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে আছে সমুদ্র কচ্ছপ, সমুদ্র সাপ, লোনা পানির কুমির সমূহ। এছাড়াও রয়েছে প্রায় ২০,০০০ এর অধিক প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের মাছ। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে আছে নীল তিমি, সীল, সামুদ্রিক ভোঁদড়, মেরু ভাল্লুক, ডলফিন, সী লায়ন ইত্যাদি। ডাম্বো অক্টোপাস, ভ্যাম্পায়ার স্কুইডস, অ্যাংলারফিশ, জম্বি ওয়ার্মস ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের কিছু ভয়ানক প্রাণী। প্রায় ৩৫০ প্রজাতির বিভিন্ন ধরনের পাখি সমুদ্র বায়োমের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যদিও তারা খুব বেশি সময় সমুদ্রে কাটায়না। সমুদ্রের বৈরি পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সমুদ্র বায়োমের উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। যেমন

Draft Copy

অনেক উদ্ভিদের বিশেষ ধরনের শক্ত মূল রয়েছে যার মাধ্যমে এগুলো পাথর বা শক্ত কিছুর সাথে লেগে থাকতে পারে এবং প্রচন্ড স্রোতেও স্থানচ্যুত হয়না। প্রাণীরাও আলো, তাপ, খাদ্য এবং পানির চাপের ব্যাপক তারতম্যের মধ্যেও টিকে থাকতে পারে। তাই সামুদ্রিক বায়োম সকল দিক দিয়েই বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হওয়ায় এখানকার জীবসমূহ পৃথিবীর মূল্যবান সম্পদ। সামুদ্রিক বায়োম পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখা, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ এবং মানবজাতির জন্য খাদ্য এবং সম্পদের উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে সমগ্র পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরের মাত্র ১৩ শতাংশ তার স্বাভাবিক ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে, আর বাকি অংশ মানবসৃষ্ট নানা কারণ, যেমন-প্লাস্টিক দূষণ, অতিরিক্ত মাছ আহরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব। এছাড়া রাসায়নিক দূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি সামুদ্রিক বায়োমের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মাছের প্রজাতি বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে যেমন-অ্যালবাকোর টুনা, আটলান্টিক কড, হ্যালিবাট, স্যালমন, সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি। যেহেতু এই সমুদ্র আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সাথে জড়িত এবং পৃথিবীজুড়ে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ মাছ ধরে আয় এবং জীবিকার জন্য সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের এই সমুদ্র বায়োমের জীববৈচিত্র রক্ষায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা জরুরি।

তবে উল্লেখিত বায়োমসমূহের বাইরে স্বাদু পানির বায়োমের কথা বলা যেতে পারে। স্বাদু পানির বায়োম পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তৃত, যার ফলে এই বায়োমে স্থান ভেদে জলবায়ুর ভিন্নতা রয়েছে। পুকুর, খাল-বিল, ডোবা, নদ-নদী সমূহ মূলত স্বাদু পানির বায়োমের অংশ। স্বাদু পানির বায়োমেও নানা ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। তবে স্বাদু পানির বায়োম মানুষ ও প্রাণীদের জন্য প্রয়োজনীয় মিঠা পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এছাড়া এ বায়োমে প্রচুর পরিমাণে মিঠা পানির মাছ পাওয়া যায় যা বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের জন্য প্রাণীজ আমিষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করে।

উল্লেখিত বায়োমসমূহ পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্যের প্রমাণ। এটি আমাদের বুঝতে হবে যে, পৃথিবীটা শুধু মানুষের জন্য নয় আর মানুষ এককভাবে কখনো টিকে থাকতেও পারবেনা। কারণ মানুষ তার বেঁচে থাকার সমস্ত উপাদান তার আশে-পাশের জীব ও জড় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করে। অন্যান্য জীব ও মানুষ পরস্পরের সমৃদ্ধি এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণ ভাবে বাঁচার সহযোগী। পৃথিবীতে বিদ্যমান বায়োমগুলো মূলত মানুষ, অন্যান্য জীব ও প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ফুটিয়ে তোলে। প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট যে কোন কারণেই হোক না কেন, যদি বায়োমসমূহের প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয় তাহলে তা মানুষের সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। আবার, মানুষ যদি তার বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য তার সামাজিক জীবনে পরিবর্তন আনে, যেমন-খাদ্যাভ্যাস, শিল্পায়ন ও অবকাঠামো সৃষ্টি, ভূমি ব্যবহার ইত্যাদিতে, তবে প্রকৃতিতে তার সরাসরি প্রভাব পড়ে। আর তাই এই অমূল্য বায়োম ও বিদ্যমান বাস্তুসংস্থানগুলোকে অনুধাবন করা ও সেই অনুযায়ী তাদেরকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। ব্যক্তি পর্যায়ে একক প্রচেষ্টার চাইতে সবার সমন্বিতভাবে অংশগ্রহণে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা আমাদের এই প্রিয় পৃথিবীকে আজ এবং আগামীর জন্য সকল জীবের বাস উপযোগী করে রাখতে পারি।

সমুদ্র সম্পদ এবং বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা

সামুদ্রিক সম্পদ বলতে পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর এবং এর উপকূলীয় এলাকাসমূহের জৈব-অজৈব সম্পদের বিশাল ভান্ডারকে বোঝায়। এই সম্পদসমূহ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমরা সমুদ্র বায়োম বিষয়ে পড়ার সময়

Draft Copy

পেয়েছি। এই সম্পদসমূহ যে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এবং তার নানাবিধ প্রয়োজন মেটাতে বড় ভূমিকা পালন করে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সমুদ্র এবং তা থেকে সংগৃহীত সম্পদের ভূমিকা অপরিসীম। এই অংশে আমরা মূলত সামুদ্রিক সম্পদের গুরুত্ব, এর প্রকারভেদ, বাংলাদেশে সামুদ্রিক সম্পদের ধরণ ও সম্ভাবনা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনায় বাধাসমূহ বুঝতে চেষ্টা করব।

আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিভাগের ৭০ ভাগ মহাসাগর যা এক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সামুদ্রিক সম্পদের আবাসস্থল। এই সম্পদসমূহকে মূলত জীবন্ত (জৈব) এবং নির্জীব (অজৈব) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

জীবন্ত সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) মৎস সম্পদ: সমুদ্র মাছসহ অন্যান্য সামুদ্রিক খাবারের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশ্ব জুড়ে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের খাদ্য ও জীবিকার জোগান দেয়। এই প্রকৃতিক সম্পদ মৎস্য খাত বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপকূলীয় এবং অভ্যন্তরীণ জলাশয়, এই উভয় উৎস থেকে সংগৃহীত মাছের উপর নির্ভর করে আমাদের দেশে সমৃদ্ধ মৎস্য শিল্প গড়ে উঠেছে। সামুদ্রিক মৎস্য খাত বিপুল সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান ও আয়ের উৎস যা খাদ্য নিরাপত্তা ও রপ্তানি আয়েও অবদান রাখছে।

(খ) এ্যাকুয়াকালচার: এ্যাকুয়াকালচার, যা মৎস্য চাষ নামেও পরিচিত। নিয়ন্ত্রিত জলজ পরিবেশে মাছ, শেলফিস ও জলজ উদ্ভিদ চাষের সাথে এটি সম্পর্কিত। এটি সীফুডের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং প্রোটিনের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাতে সাহায্য করে। বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল মাছ চাষ। পুকুর, ঘের এবং উপকূলীয় এলাকার কৃষি জমিতে বাঁধ দিয়ে সমুদ্রের পানি ধরে রেখে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, কাঁকড়া এবং বাগদা চিংড়ি চাষের মাধ্যমে দেশে অ্যাকুয়াকালচারে উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে, রপ্তানি আয় বাড়াতে এবং প্রাকৃতিক মাছের মজুদের উপর চাপ কমাতে অ্যাকুয়াকালচার অবদান রাখছে।

(গ) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য: মহাসাগরসমূহ সামুদ্রিক বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিস্তৃত সমাহারে সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রয়েছে স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখি এবং অমেরুদন্ডী প্রাণীর এক বিশাল সম্ভার। এই প্রজাতিসমূহ বাস্তুতন্ত্রের কার্যকারিতা, পুষ্টিপ্রবাহ, এবং বিনোদনমূলক কার্যক্রম যেমন পর্যটন ও ডুবুরিদের কাজে (diving) অবদান রাখে। এছাড়া বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও শৈবালেরও পুষ্টিগুণ রয়েছে। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

নির্জীব সামুদ্রিক সম্পদ:

(ক) খনিজ এবং জ্বালানি: সমুদ্রের তলদেশে মূল্যবান খনিজ পদার্থ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ নডিউলস, কোবাল্টসমৃদ্ধ ক্রাস্ট এবং তলদেশের খনিজ ও শিলার আকরিক আধার (hydrothermal vent deposits)। সমুদ্র উপকূল থেকে দূরবর্তী গভীর সমুদ্রে তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তির (যেমন- বায়ু ও জোয়ারের শক্তি) গুরুত্বপূর্ণ উৎস। নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষ করে সমুদ্রতীরবর্তী বায়ু, ঢেউ এবং জলোচ্ছ্বাসের শক্তি সুনীল অর্থনীতির আরেকটি সম্ভাবনাময় খাত। দেশের জ্বালানি খাতের উৎসকে বহুমুখী করতে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমাতে বায়ু বা সমুদ্রের ঢেউ এর শক্তি ব্যবহার করার সম্ভাবনা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল ও সমুদ্রতীর থেকে লম্বালম্বি ভাবে ২০০ নটিক্যাল (১ নটিক্যাল মাইল= ১,৮৫২ মিটার) দূরবর্তী এলাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের একচেটিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল (exclusive

Draft Copy

economic zone)। এতে বাংলাদেশের একচ্ছত্র মালিকানা রয়েছে। এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল ইত্যাদির অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তবে এ ধরনের জ্বালানি অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

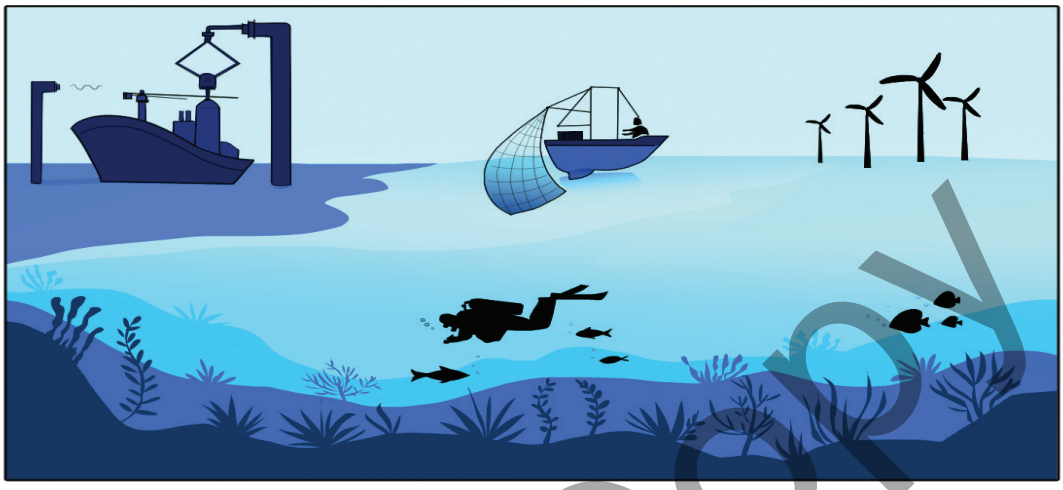

সমুদ্র সম্পদের উপর মানুষের নির্ভরশীলতার ধরণ

(খ) বালি ও নুড়ি: উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে প্রচুর পরিমাণে বালি ও নুড়ি জমা হয়। এগুলো নির্মাণ শিল্প, যেমন- ভবন নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ও সমুদ্রতট সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের কক্সবাজার থেকে টেকনাফ পর্যন্ত দীর্ঘ সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায় কালো রঙের খনিজ বালু যা মূলত ভারী খনিজ পদার্থ। এসব কালো রঙের বালুতে জিরকন, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গার্নেট, রিউটাইল, লিওকনিক্স, কায়ানাইট, মোনাজাইট এর মতো মূল্যবান ভারী খনিজ রয়েছে। এসব খনিজ পদার্থ শিল্পে ব্যবহার এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য সম্ভাবনাময়।

(গ) পর্যটন: বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে বাংলাদেশের উপকূলীয় তটরেখা প্রায় ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ। তাই এই দীর্ঘ তটরেখা ধরে পর্যটন ও বিনোদন নতুন অর্থনৈতিক খাত হিসেবে বিবেচিত। পর্যটন সম্ভাবনাময় উপকূলীয় এলাকার মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের বিশ্বের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক বালুকাময় সমুদ্র সৈকত ও এর সংলগ্ন এলাকা এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপ, যা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় পর্যটকদের আকর্ষণ করে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন যা ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। এটি সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের মতো বিপদ থেকে আমাদেরকে রক্ষার কাজ করে। আবার পর্যটকদের জন্যও এটি আকর্ষণীয় স্থান। সুন্দরবনের পূর্বদিকে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় অবস্থিত কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। সামুদ্রিক পরিবহন ও সরবরাহ, সামুদ্রিক পরিষেবা, জাহাজ নির্মাণ এবং উপকূলীয় শিল্প কার্যক্রমও বাংলাদেশের সুনীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। বন্দর এবং টার্মিনালগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে সহজতর করে, একই সাথে জাহাজ নির্মাণ শিল্প কর্মসংস্থান এবং রপ্তানি আয়ে অবদান রাখে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা তাদের দীর্ঘমেয়াদী যোগান নিশ্চিত করতে পারে। তবে এই টেকসই ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো হলো:

Draft Copy

১. অতিরিক্ত মাছ ধরা এবং নিঃশেষকরণ: অতিরিক্ত মাছ ধরা, অবৈধভাবে মাছ ধরা এবং মাছ ধরার ধ্বংসাত্মক কৌশল ব্যবহারের ফলে যেমন মাছের মজুদ হ্রাস পাচ্ছে তেমনি ভাবে তাদের প্রজননও ব্যাহত হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনে যথাযথ আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ জরুরি।

২. আবাসস্থল ধ্বংস এবং দূষণ: সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরা, উপকূল এলাকায় নানা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালানো এবং রাসায়নিক ও প্লাস্টিক দূষণের মতো কর্মকান্ডে সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য উদ্ভিদ-প্রাণীদের আবাসস্থল ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন এবং তাদের স্বাভাবিক প্রজনন ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বিপন্ন আবাসস্থল রক্ষা, সমুদ্রের স্থানিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সব ধরনের দূষণ হ্রাস করা অত্যন্ত জরুরি।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন: মহাসাগরসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এসবের মধ্যে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অম্লতার বৃদ্ধি এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি। এই পরিবর্তনগুলো সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। প্রজাতির বণ্টন ও সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটছে। এতে পরিবেশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলো ব্যাহত হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবগুলো কমিয়ে আনার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা এবং সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৪. সমুদ্র ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন, কারণ মহাসাগরগুলো নানা দেশের সাথে সংযুক্ত এবং সবার সম্মিলিত সম্পদ। কোন একক দেশের মাধ্যমে এর ব্যবস্থাপনা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দিতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার মতো কার্যকরী শাসন কাঠামো অতিরিক্ত বা অবৈধ মাছ ধরা, দূষণ ও চোরাচালানরোধ এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করতে পারে।

সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা নির্ধারণ, টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা, সামুদ্রিক দূষণ কমানোর উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ চিহ্নিতকরণ ও প্রশমিত করা। অর্থনৈতিক উন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ ও সুনীল অর্থনীতির যে উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন শুধুমাত্র স্থলভাগের সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার সহনশীল মৎস্য আহরণ নিশ্চিতে, ঝুঁকিপূর্ণ সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় এবং টেকসই অ্যাকুয়াকালচারের উন্নয়নে নীতি ও প্রবিধান বাস্তবায়ন করছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বর্জ্য নিঃসরণে কঠোর বিধি-বিধানের প্রয়োগের মাধ্যমে দূষণ কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। উপকূলীয় ক্ষয় ও ভাঙ্গন মোকাবেলা, টেকসই ভূমি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামুদ্রিক সম্পদ এবং সুনীল অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জীবিকা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

Draft Copy

বাংলাদেশের বনজ সম্পদ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা

বন হলো পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষ এবং পরিবেশের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান দেয়। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখা, জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমিত করা এবং বিভিন্ন পণ্য ও সেবার জন্য বনভূমি অপরিহার্য। এই অংশে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে বনের তাৎপর্য এবং বনভূমির টেকসই ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলো জানব। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর ২০২২ সালের তথ্য মতে পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগের প্রায় শতকরা ৩১ ভাগ জুড়ে বনভূমি রয়েছে এবং উদ্ভিদ, প্রাণীজগত ও বাস্তুতন্ত্র ভেদে এসব বনভূমি খুবই বৈচিত্র্যময়। পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং এই গ্রহের কার্যকলাপ সচল রাখতে বনভূমি নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে বনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বসমূহ আলোচনা করা হলো।

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ: বন হলো প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতির বিস্তীর্ণ আবাস। এসব প্রজাতির মধ্যে অনেকে আজ বিপন্ন। অনেক প্রজাতি আছে যারা নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ বা প্রাণী হিসেবে পরিচিত (endemic)। বনভূমিসমূহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে। তারা অসংখ্য জীবের জন্য আবাসস্থল, খাবারের উৎস এবং আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। বন না থাকলে পৃথিবীতে বিদ্যমান জীববৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হতো না।

২. কার্বন শোষণ এবং জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ: বায়ুমন্ডলের কার্বন চক্রে বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনের বৃক্ষরাজি সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং গাছ ও মাটিতে কার্বন সংরক্ষণ করে। তারা কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে, বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব হ্রাস করে এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করতে বনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৩. কাঠ এবং অ-কাঠ জাতীয় পণ্যের যোগান: বন হল কাঠের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস, যা নির্মাণ সামগ্রী, আসবাবপত্র এবং শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়। উপরন্তু, বন বিস্তৃত পরিসরে অ-কাষ্ঠ জাতীয় পণ্য যেমন ফল, বাদাম, ঔষধি গাছ, ফাইবার, রজন এবং প্রাকৃতিক রঙের সরবরাহ করে থাকে। এসব পণ্যের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ঔষধি মূল্য অপরিসীম।

৪. জলাভূমি সুরক্ষা এবং পানির সরবরাহ ও গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ: বনভূমি পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, মাটির ক্ষয় রোধ করে, পানির গুণমান বজায় রাখে এবং ভূগর্ভস্থ পানির উৎস পূরণ করে পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন পানির প্রাকৃতিক ফিল্টার হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বন পলল এবং বিভিন্ন দূষককে ধরে রাখে এবং মানুষ ও পরিবেশের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

> কার্বন সিঙ্ক হলো এমন কিছু যা বায়ুমন্ডলে যতটুকু কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে দেয় তার থেকে বেশি পরিমাণে শোষণ করে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে। বনভূমি, সমুদ্র এবং মাটি পৃথিবীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্বন সিঙ্ক হিসেবে কাজ করে।

৫. বিনোদন এবং সাংস্কৃতিক মূল্য: বনভূমি মানুষের জন্য নির্মল বিনোদনমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ সৃষ্টি করে, যেমন হাইকিং, ক্যাম্পিং, বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃতি পর্যটন ইত্যাদি। বনসমূহ অনেক সম্প্রদায়ের

Draft Copy

জন্য সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য বহন করে, ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমি হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

এসবের বাইরেও বনভূমি আমাদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। ২০০৭ সালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আঘাতহানা ভয়াবহ ঝড় সিডরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সুন্দরবন সে সময় ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদ বহুলাংশে রক্ষা করেছিল। সুন্দরবন না থাকলে ক্ষয়-ক্ষতি আরো ব্যাপক হতে পারত। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন আমাদেরকে এভাবেই রক্ষা করে আসছে।

সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশের বনজ সম্পদও দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছোট দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে বৈচিত্র্যময় বনভূমির বাস্তুতন্ত্র রয়েছে যা মানুষকে বিভিন্ন সুবিধা ও সেবা প্রদান করে থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখছে। চা ও রাবার বাগানসহ বাংলাদেশের মোট বনভুমির পরিমাণ প্রায় ২৬ লাখ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ১৭.৪ শতাংশ। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় বনভূমিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

১. গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ এবং অর্ধ-চিরসবুজ বন: এই বনভূমিগুলো দেশের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অংশে পাওয়া যায়। এগুলো ঘন গাছপালায় আচ্ছাদিত, যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বৃক্ষ, গুল্ম এবং লতা। এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষের মধ্যে আছে সেগুন, গর্জন, মেহগনি, গামারি, জারুল, চাঁপালিশ, শিমুল, কড়ই ইত্যাদি। এ বনে বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশ দেখা যায়, যেমন-মূলী, মিতিংগা, ভুলু, ওরাহ। এক সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি থেকে আহরিত বাঁশের উপর ভিত্তি করে চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী পেপার মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বনে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বৃক্ষরাজির পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে রাবার গাছের চাষ করা হচ্ছে। তবে এ রাবার চাষের পরিবেশগত ফলাফল ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় এখনো ততটা সফল বলা চলে না। এই বনগুলো হাতি, হরিণ, শুকর, সজারু এবং বিভিন্ন প্রজাতির বানরসহ অসংখ্য প্রজাতির বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল। তবে এ বনভূমিতে মানুষের বিচরণ বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বনায়ন দিনে দিনে প্রাণীদের বাসস্থান এবং বংশবৃদ্ধি হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

Draft Copy

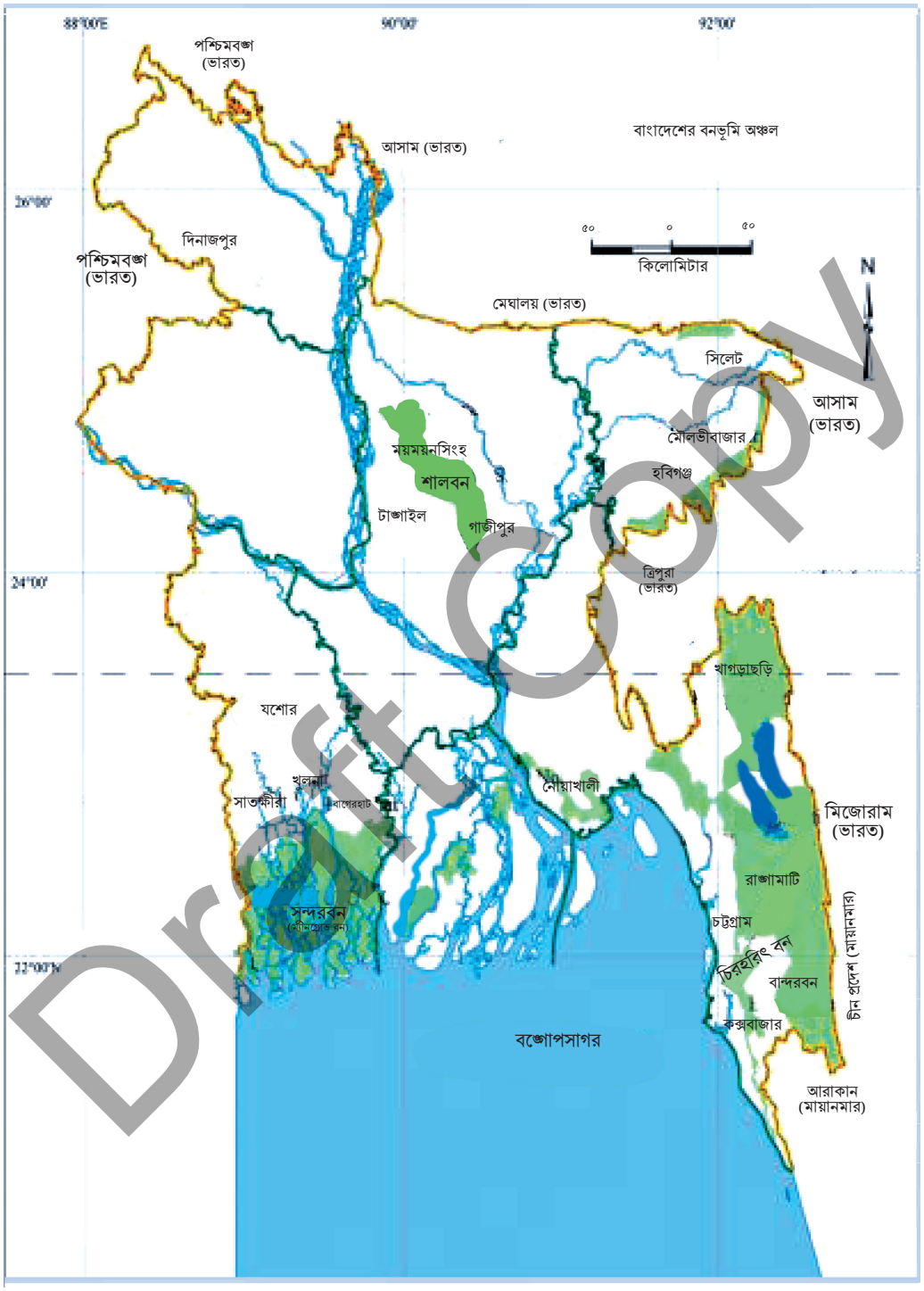

Draft Copy

চিত্র: বাংলাদেশের বনাঞ্চল সমূহ (শালবন, চিরহরিৎ বন, ম্যানগ্রোভ বন)

২. ম্যানগ্রোভ বন: সুন্দরবন, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ (৫২২ তম বিশ্ব ঐতিহ্য)। এই লোনা পানির বন বাংলাদেশের বনজ সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এটি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত এবং এর অনন্য জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বড়গুনা জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে এই বন বিস্তৃত। এই বন সমুদ্রের তীরে হওয়ায় জোয়ারের পানিতে প্রতিদিন প্লাবিত হয় এবং মাটি সিক্ত ও কর্দমাক্ত থাকে। এ বনের সুন্দরী গাছে বিশেষ ধরনের শ্বাসমূল রয়েছে যা মাটির উপর উঠে এসে উদ্ভিদকে অক্সিজেন নিতে সাহায্য করে। এ ধরনের শ্বাসমূলকে ইংরেজিতে pneumatophore বলে। সুন্দরী, গেওয়া, গরান, পশুর, গোলপাতা, কেওড়া, ধুন্দুল, বাইন ইত্যাদি এ বনের উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ। এ বন থেকে আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ, যানবাহন তৈরির উপযোগী কাঠ, ঘরের ছাওনি ও বেড়া তৈরির জন্য গোলপাতা সহ পেন্সিল, দিয়াশলাই, নিউজপ্রিন্ট তৈরির কাঁচামাল পাওয়া যায়। লবণাক্ত পানিতে প্লাবিত এ বনে মাছ, মধু, মোম, শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি পাওয়া যায়। বর্তমানে সুন্দরবনে প্রায় ১২০ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এছাড়া কাঁকড়া, চিংড়ি, কাছিম, কুমির, ডলফিন, হাঙ্গর, ভোঁদর রয়েছে এখানে। প্রাণীদের মধ্যে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, শুকর, বানর, বনবিড়াল, বাঘরোল, গুঁইসাপ, অজগর দেখতে পাওয়া যায়। পাখ-পাখালির মধ্যে বক, পানকৌড়ি, ধনেশ, লাল কাক, শঙ্খচিল, মাছরাঙা, ঘুঘু ইত্যাদির বিচরণ দেখা যায়।

৩. শাল বন: বাংলাদেশের মধ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে টাংগাইলের মধুপুর, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, শেরপুর, নেত্রকোণা এবং সিলেট অঞ্চলে শালবন দেখা যায়। এই বনগুলোতে শাল গাছের উপস্থিতি সর্বাধিক বলেই এরকম নামকরণ। এটি মূলত ক্রান্তীয় পতনশীল বৃক্ষের বন। দিনাজপুর, রংপুর এবং নওগাঁ জেলাতেও এ বনের সামান্য অংশ দেখতে পাওয়া যায়। এ বনে কাঠ উৎপাদনকারী গাছের মধ্যে আছে গজারি, কড়ই, মনকাটা, সেগুন, হিজল, হরিতকি ইত্যাদি। এছাড়া আমলকি, বেল, জাম, তেঁতুল, কাঁঠাল, বৈরাগীলতা, বহেরা, ধূতরা ইত্যাদি গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এ বন একসময় চিতাবাঘ, ভাল্লুক, হরিণের মতো প্রাণীর জন্য বিখ্যাত থাকলেও এখন এদের দেখা যায়না। তবে হনুমান, বানর, শিয়াল, গুঁইসাপ ইত্যাদি প্রাণী এবং বেশকিছু পাখ-পাখালি এ বনে এখনো দেখতে পাওয়া যায়।

আমরা জানি মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্যপূর্ণ বসবাস এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য যে কোন দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে বনভূমির পরিমাণ প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এর পেছনে যে সব কারণ প্রধান তা হলো-

১. বন উজাড় এবং অবৈধ গাছ কাটা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি জমির সম্প্রসারণ এবং অবৈধ গাছ কাটার মাধ্যমে বন উজাড় দেশের বনাঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। এর ফলে বনভূমি বিনাশের সাথে সাথে বন্য প্রাণীর বাসস্থানের ক্ষতি, মাটির ক্ষয় এবং মূল্যবান বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

২. দখল ও ভূমির রূপান্তর: কৃষি, বসতি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রায়ই বনাঞ্চল দখল করা হয়। বনভূমির এই রূপান্তর বনের বাস্তুতন্ত্রের বিস্তার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য সমন্বয়ে ব্যাঘাত ঘটায়।

৩. বন্যপ্রাণী শিকার এবং এর অবৈধ ব্যবসা: অনিয়ন্ত্রিত শিকার এবং বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসা বাঘ, হাতি ও বানরসহ বিপন্ন প্রজাতির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। এই কর্মকান্ডগুলো বাস্তুতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে।

উল্লেখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ

Draft Copy

সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে এবং করছে:

১. সংরক্ষিত এলাকা নির্ধারণ: সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবাসস্থল সুরক্ষিত করার জন্য জাতীয় উদ্যান, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং প্রকৃতি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত বনায়ন প্রতিষ্ঠা করেছে।

২. কমিউনিটি-ভিত্তিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা: বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সময় স্থানীয় সম্প্রদায় এবং আদিবাসী গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং বন পুনরুদ্ধারে এই সহযোগিতামূলক উদ্যোগ স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

৩. পুনঃবনায়ন এবং বনায়ন: ক্ষয়প্রাপ্ত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং বনায়ন কর্মসূচী প্রসারের প্রচেষ্টা চলছে। এই উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে বৃক্ষ রোপণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য প্রণোদনা প্রদান করা।

৪. আইনের প্রয়োগ শক্তিশালীকরণ: সরকার অবৈধ গাছ কাটা, বন্যপ্রাণী শিকার এবং বন্যপ্রাণীর অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কঠোরভাবে বিধি-বিধান এবং জরিমানা বাস্তবায়ন, নজরদারি বাড়ানো এবং বন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা:

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা বলতে সঠিক সময়ে নির্বাচিত গাছ কাটা, নিয়ন্ত্রিতভাবে ফসল সংগ্রহ এবং বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনজ সম্পদের যৌক্তিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহারকে বোঝায়। এর লক্ষ্য হল জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিশ্চিত করা। মোট কথা হলো, বনজ সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে বনের উৎপাদনশীলতা ও স্থায়িত্ব ভবিষ্যতে হ্রাস না পেয়ে বরং ক্ষয়-ক্ষতি কাটিয়ে বনজ সম্পদ আরো বেশি সমৃদ্ধ হতে পারে। টেকসই বন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত মান বজায় রাখা এবং বৃদ্ধি করা হয়। টেকসই বন ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের জন্য জাতীয় আইন, নীতি, কৌশল, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) অধীনে দেশের বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বনের উপর চাপ কমাতে বন নির্ভর মানুষের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, দখলকৃত বন পুনরুদ্ধার, বন্যপ্রাণী ও বিপন্ন প্রজাতির সংরক্ষণ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে বন পাহারার ব্যবস্থা, জ্বালানি কাঠের পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি সরবরাহ, উন্নত ভূমি ব্যবহার নীতি বাস্তবায়ন, বনের অবক্ষয় মোকাবেলায় অংশীজনের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো এবং সর্বোপরি জনসচেতনতা বৃদ্ধি টেকসই বন ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় এবং আদিবাসী সম্প্রদায় যারা জীবিকা ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য বনভূমির উপর নির্ভরশীল তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

Draft Copy

দুর্যোগ এবং টেকসই উন্নয়ন:

দুর্যোগ বলতে প্রাকৃতিক কারণে এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপে সৃষ্ট চরম বা বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিকে বোঝায়। এরকম ঘটনায় মানুষের জীবন, অবকাঠামো এবং পরিবেশের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়। দুর্যোগ প্রায়ই আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত, মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে প্রাকৃতিক শক্তির কারণে ঘটে, যেমন-বন্যা, খরা, ঘুর্ণিঝড়, সুনামি ইত্যাদি। আবার মানুষের ভুল, অসর্তকতা বা অপরিকল্পিত কাজের ফলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন-জলাবদ্ধতা, সামাজিক নৈরাজ্য, অপরিকল্পিত নির্মাণ বা উন্নয়ন, যুদ্ধ ইত্যাদি। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের ভুল বা অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের কারণে ত্বরান্বিতও হতে পারে, যেমন-অপরিকল্পিতভাবে পাহাড় কাটলে বা নদীতে বাঁধ দিলে বা বালি তুললে ভূমিধ্বস, নদী ভাঙ্গন, বন্যা হতে পারে। যেকোন দুর্যোগের ফলে গুরুতর আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয় হতে পারে, যা মোকাবেলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ এবং দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ প্রয়োজন হয়। দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সৃষ্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা আক্রান্ত সমাজের সামর্থ্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সামর্থ্য হচ্ছে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দুর্যোগকালে বা দুর্যোগের পরে ইতিবাচক সাড়া দেবার সার্বিক সক্ষমতা। কোন জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের সাথে সেখানকার টেকসই উন্নয়ন ওতপ্রোত ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপ এবং জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদী প্রণালীর ব-দ্বীপ এবং বঙ্গোপসাগরের সীমান্ত ঘেঁষে থাকায় বাংলাদেশ সারা বছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে রয়েছে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, নদীভাঙন,বজ্রপাত, ভূমিধ্বস, খরা ইত্যাদি। দুর্যোগের মতো ঘটনা দেশের মানুষ, অবকাঠামো এবং অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আমরা বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে জানি। তবে নদীমাতৃক এই দেশের একটি নিরন্তর সমস্যা হলো নদীভাঙ্গন।

নদীভাঙ্গন: নদীভাঙ্গন বাংলাদেশের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষ করে খরস্রোতা নদীগুলোর তীরে এটি বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে। বর্ষাকালে নদীর তীব্র স্রোতধারা তীরকে দ্রুত ক্ষয় করে, যার ফলে কৃষি জমি, বসতভিটা এবং অবকাঠামো নদীতে বিলীন হয়। নদীভাঙ্গন ঐসব এলাকার জনগোষ্ঠীকে বাস্তুহারা করে এবং এর ফলে তাদের স্বাভাবিক জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে পড়ে। নদী ভাঙ্গনের শিকার জনগোষ্ঠী অনেক ক্ষেত্রে ভূমিহীন হয়ে পড়ে। আর বার বার এমন ঘটলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসিত করা রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকায় প্রায় ১২০০ কি.মি. এলাকা জুড়ে ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। এছাড়া বর্ষাকালে যমুনা নদীসহ দেশের অন্যান্য নদীর পানি প্রবাহের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছরই বহু মানুষ তাদের জমি-জমা, ঘরবাড়ি নদী ভাঙ্গনের মাধ্যমে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে ঐসব এলাকার মানুষ দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে বাধার সম্মুখীন হয়।

Draft Copy

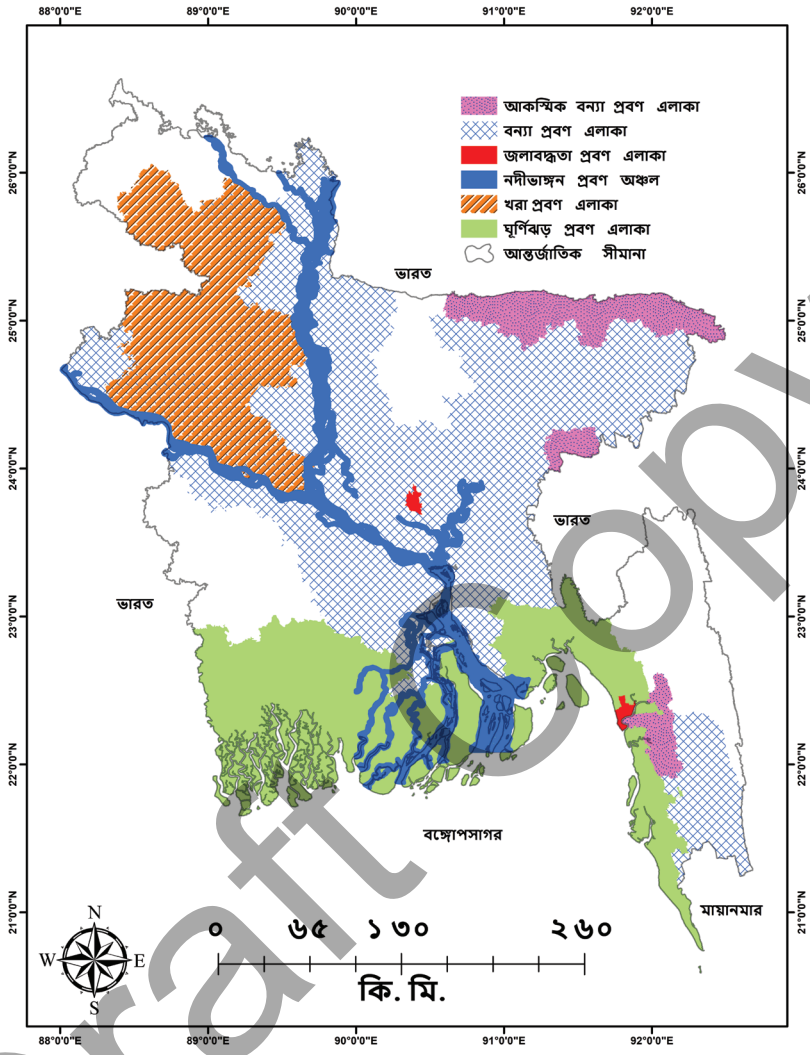

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এলাকা

বজ্রপাত: পৃথিবীর অনেক দেশেই বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে, তবে বাংলাদেশে মৃত্যুর হার ক্রমাগতই বাড়ছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০২১ সালে বাংলাদেশে বজ্রপাতে ৩৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আবার প্রতি বছর দেশে বজ্রপাত ১৫ শতাংশ হারে বাড়ছে। বনভূমি ও উঁচু বৃক্ষ উজাড়, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর অন্যান্য নিয়ামকের পরিবর্তন বজ্রপাত বাড়ার মূল কারণ। আর ঘনবসতি, বজ্রপাতের মৌসুমে উন্মুক্ত স্থানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসরণ না করা, অসচেতনতা ইত্যাদি বাংলাদেশে বজ্রপাতে মৃত্যু বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণ বলে মনে করা হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকায় বজ্রপাতে মৃত্যু বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে এটির কারণে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছে।

Draft Copy

জলাবদ্ধতা: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের নগর বা শহরগুলো বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বাসিন্দারা এ সমস্যায় সবচেয়ে বেশি ভুক্তভুগী। এর পেছনে দায়ি আমাদের অপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়ন, ত্রুটিপূর্ণ বর্জ্যব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিক দূষণ, খাল-নালা ও অন্যান্য জলাশয়ের ভরাট ও দখল ইত্যাদি। তাই এ সমস্যা যে আমাদেরই সৃষ্ট তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শহরের ড্রেন ও প্রাকৃতিক নালায় প্লাস্টিক বোতল, পলিথিন ও আবর্জনা ফেলার কারণে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ আটকে যায় এবং অনেক স্থানে নালা সংকুচিত করার ফলে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়েছে। যার ফলে একটু বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীল আচরণ। এছাড়া ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পিত নগরায়ণ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে এ সমস্যাকে প্রশমিত করা সম্ভব।

ভূমিধ্বস: ভূ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক এবং মানবসৃষ্ট নানা কারণে ভূমিধ্বসের মতো দুর্যোগ দেখা দেয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন এলাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভূমিধ্বসের প্রকোপ বেড়েছে। এসব এলাকার পাহাড়গুলোর মাটিতে বেলে কণার আধিক্য দেখা যায়। ফলে ভারী বৃষ্টিপাতের সময় মাটির উপরের অংশ পানি ধারণ করে ভারী হয়ে উঠলে তা নিচের স্তরকে ছেড়ে দিয়ে প্রচন্ড বেগে নিচের দিকে নেমে আসে। আর পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসরত মানুষ তখন এর নিচে চাপা পড়ে জান-মাল হারায়। সাম্প্রতিক সময়ে এ দুর্যোগে উল্লেখিত পাহাড়ী এলাকাগুলোতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। এ দুর্যোগের তীব্রতা বৃদ্ধির পেছনে মানবসৃষ্ট কারণও দায়ি, যেমন: নির্বিচারে পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন, রাস্তাঘাট ও কৃষি জমি সৃষ্টি, গাছ কেটে উজাড় করার ফলে মাটির ক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়া ও উপরের স্তর আলগা হয়ে যাওয়া। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন হচ্ছে, যেমন-অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ বৃষ্টি, যা ভূমিধ্বসের মতো দুর্যোগ বেড়েছে বলে মনে করা হয়।

খরা: খরা হলো দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক হ্রাস। খরার ফলে পানির অভাব, ফসলের ক্ষতি এবং পানির উৎসের ক্ষতি সাধন হয়। খরা কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবিকার উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। মোটা দাগে খরাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- আবহাওয়ার শুষ্কতার ভিত্তিতে খরা এবং কৃষি কাজের জন্য মাটিতে আর্দ্রতার অভাবজনিত খরা। আমাদের দেশের উত্তরাংশ, বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল খরা প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। এ অঞ্চলের রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, বগুড়া জেলা সমূহকে খরা প্রবণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বৃষ্টিপাতে পরিবর্তন এবং উজান থেকে আসা নদী সমূহের উৎসে বাঁধ দিয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার ফলে এ অঞ্চলে খরার প্রবণতা বাড়ছে বলে মনে করা হয়।

ভূমিকম্প: পৃথিবীর ভূত্বকের থেকে হঠাৎ শক্তি নিঃসরণের ফলে ভূমি কাঁপতে থাকে, যার ফলে ভূমিকম্প হয়। এর ফলে ভবন ধস, ভূমিধস এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটে। সাগরের তলদেশে ভূমিকম্প হলে তাতে সুনামি হতে পারে। বাংলাদেশ ভূ-তাত্ত্বিকভাবে এমন এলাকায় অবস্থিত যেখানে দুটো প্লেটের সংযোগস্থল রয়েছে যার নাম ডাউকি ফল্ট। সিলেট থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে এ ফল্টের কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভূমিকম্প হলে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পেছনে কারণ হলো অপরিকল্পিতভাবে তৈরি ভবন, ভূমিকম্প প্রতিরোধী ভবন তৈরিতে উদাসীনতা, ভূমিকম্প নিয়ে সচেতনতা ও প্রস্তুতির অভাব। তাই ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় ও ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকা জরুরি।

Draft Copy

উপরে উল্লেখিত দুর্যোগের বাইরেও লবণাক্ততার বিস্তৃতি, গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী ঝড় বা টর্নেডো, নদী ও পানি দূষণ, বড় শহরগুলোতে অতিরিক্ত মাত্রায় বায়ু দূষণ, মাটি দূষণ, বড় বড় নগরগুলোতে তাপীয়-দ্বীপের সৃষ্টি ও দাবদাহ, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণের মতো সমস্যাগুলো দিনে দিনে মানুষের কাছে ভয়াবহ বার্তা নিয়ে আসছে।

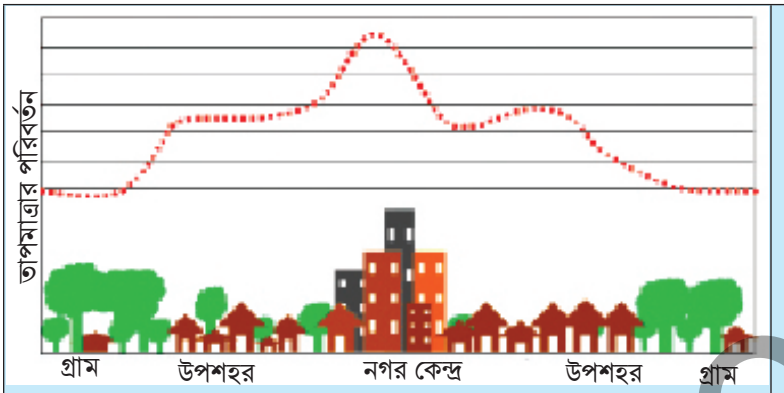

চিত্রে-ডটেড লাইনের মাধ্যমে গ্রাম, উপশহর বা নগর কেন্দ্রের তাপীয় অবস্থার একটি তুলনামূলক ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নগর কেন্দ্রের দিকে লাইনটি উঁচু হয়ে দ্বীপের আকৃতি লাভ করেছে যাকে বলা হচ্ছে নগর-তাপীয়-দ্বীপ।

উন্নত দেশসমূহের বড় শহরগুলো বা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ঘনবসতিপূর্ণ অপরিকল্পিত শহরগুলোর মানুষ তাদের আশেপাশের গ্রামাঞ্চলগুলো থেকে বেশি গরম অনুভব করে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলো এরকম অধিক উত্তপ্ত থাকাকে নগর-তাপীয়-দ্বীপ (Urban Heat Island) বলা হয়। শহরের পাকা দালান ও রাস্তাঘাট, শিল্পকারখানা, যানবাহন, অপরিকল্পিত উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ নগর-তাপীয়-দ্বীপ সৃষ্টির জন্য দায়ি বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন প্রস্তুতি এবং তা ঘটলে দুর্গতদের প্রয়োজনে দ্রুত সাড়া দান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের এবং কমিনিউনিটি পর্যায়ে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়:

১. আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা: সরকার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য দুর্যোগ আঘাত হানার বিষয়ে সময়মত তথ্য প্রদানের জন্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ এবং আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে। এই ব্যবস্থাগুলো বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে সরিয়ে নিতে এবং প্রাণহানি কমাতে সাহায্য করে।

২. দুর্যোগকালীন সাড়া দান এবং ত্রাণ: সরকার, বিভিন্ন সংস্থা এবং জনসাধারণের একযোগে সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু আছে। তারা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান, জরুরি চিকিৎসা সেবা, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। দুর্যোগের সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেন যথাযথ ও সমন্বিত ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য সরকার দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) প্রণয়ণ করেছে।

Draft Copy

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতি: সরকারের জাতীয় নীতি ও কৌশলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রস্তুতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সক্ষমতা তৈরি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা যাতে জনগণ এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানো যায়।

৪. জনসচেতনতা এবং শিক্ষা: সম্ভাব্য ঝুঁকি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা গেলে দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব, এসব কাজের মধ্যে রয়েছে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা, স্কুল প্রোগ্রাম এবং কমিউনিটি ড্রিল ইত্যাদি।

৫. টেকসই অবকাঠামো: প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করতে পারে এমন টেকসই অবকাঠামো তৈরি করা অপরিহার্য। এর মধ্যে রয়েছে বিল্ডিং কোড এবং নির্ধারিত মান অন্তর্ভুক্ত করা, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং ভূমি-ব্যবহারের সঠিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

৬. পরিবেশ সংরক্ষণ: ম্যানগ্রোভ, জলাভূমি এবং বনের মতো প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও সংরক্ষণ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব প্রশমিত করতে সাহায্য করতে পারে। এই বাস্তুতন্ত্রগুলো প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার কাজ, ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস, ক্ষয় রোধ এবং অন্যান্য বাস্তুতান্ত্রিক সেবা প্রদান করে। সিডর এবং আইলার মতো ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে সুন্দরবন যেভাবে আমাদের ক্ষতিকে কমিয়ে দিয়েছে তা পরিবেশ এবং বনভূমির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে তুলে ধরে।

৭. **কমিউনিটি-ভিত্তিক পদ্ধতি:** কমিউনিটি-ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উদ্যোগের মধ্যে প্রাথমিক সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, দূর্গত মানুষকে উদ্ধার পরিকল্পনা এবং স্থানীয় পর্যায়ের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই উদ্যোগগুলো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার মানুষকে প্রস্তুতি, সাড়াদান এবং পুনরুদ্ধারে সক্রিয় ভূমিকা নিতে সক্ষম করে তোলে।

টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি হলো এমন একটি সাংগঠনিক উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের চাহিদা পূরণের সক্ষমতা অর্জনের সাথে বর্তমানের চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ সুরক্ষা টেকসই উন্নয়েনর মূল তিনটি অনুষঙ্গ। টেকসই উন্নয়নকে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের শহর রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের নিশ্চিত করতে পারলেই মানুষের দুর্যোগ মোকাবেলার এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পুনর্বাসনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা, জরুরি প্রয়োজন ও সেবার সুরক্ষা, আন্ত:যোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং আর্থিক সক্ষমতা নিশ্চিত করা হয়। এ বিষয়গুলোর যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্যোগের জন্য আগামবার্তা, প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন সাড়া দেওয়া এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

Draft Copy

সম্পদের উৎপাদন ও সমতার নীতি

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা

আমরা আমাদের জীবনে অনেক বস্তু বা দ্রব্য পেতে চাই। ইচ্ছা থাকলেও আমরা অনেক সময় সেই বস্তু বা দ্রব্য পাই না বা ক্রয় করি না। চলো আমরা খুঁজে বের করি আমাদের জীবনে এমন কি কি আকাঙ্খা রয়েছে। আমাদের কোন কোন দ্রব্যের অভাব রয়েছে। সবগুলো দ্রব্য কি আমরা একসাথে পেতে পারি? কোন দ্রব্য পাওয়ার জন্য আমাদের আকাঙ্খা সবচেয়ে বেশি? কোন দ্রব্যগুলো দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ সহজে পাওয়া যায় না।

ক্রম	আকাঙ্খা বা অভাববোধ রয়েছে- দ্রব্যের নাম	এটি কি খুব প্রয়োজনীয়? (হ্যাঁ/না)	এটি কি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য? (হ্যাঁ/না)
১.			
২.			
৩.			
৪.			

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবো আমাদের দ্রব্য বা পণ্য প্রাপ্তির আকাঙ্খার শেষ নেই। প্রতিনিয়ত আমাদের জীবনে দ্রব্য, পণ্য বা সেবা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই আমাদের অভাব অসীম। কিন্তু আমাদের সম্পদ সীমিত বা সসীম। তাই আকাঙ্খা বা অভাবের চেয়ে সম্পদের স্বল্পতা (যা পরিমাণে কম) বা সম্পদের অপর্যাপ্ততাকেই দুষ্প্রাপ্যতা হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই অসীম অভাব এবং সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার বা ব্যবস্থাপনা করাই অর্থনীতি শাস্ত্রের কাজ।

নিচের দ্রব্যগুলোর ছবি দেখে আমরা নিজেরাই নির্বাচন করি কোনগুলো আমাদের জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, কোনগুলো প্রয়োজনীয় এবং কোনগুলো কম প্রয়োজনীয় বা না হলেও চলবে। আমরা এই দ্রব্যগুলো নির্বাচনের সময় চিন্তা করবো কেনো এই দ্রব্যগুলোকে আমরা অতি প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয় এবং কম প্রয়োজনীয় হিসেবে নির্ণয় করছি।

Draft Copy

Draft Copy

দ্রব্য বা পণ্য নির্বাচন ছক

অতিব প্রয়োজনীয় দ্রব্য	প্রয়োজনীয় দ্রব্য	অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় যা পরে পূরণ করলেও চলবে

আমরা লক্ষ্য করলে দেখবো মানুষ বা ভোক্তা সব অভাব বা আকাঙ্খা একত্রে পূরণ করতে পারে না বা অসমর্থ হয় তাই তাঁর অসীম অভাবের মধ্যে থেকে বাছাই করতে হয় কোন অভাবটি আগে পূরণ করবে। এই বাছাই প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে নির্বাচন (Choice) হিসেবে গণ্য করা হয়। ভোক্তা তাঁর অভাবগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করে থাকে কোন অভাবগুলো আগে পূরণ করবে। যে অভাবটি অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভোক্তা তা আগেই পূরণ করার চেষ্টা করে।

ভোক্তা যেমন তার সব অভাব একসাথে পূরণ করতে পারে না ঠিক তেমনি উদ্যোক্তাও সব পণ্য বা সেবা একসাথে উৎপাদন করতে পারে না। কারণ সম্পদ সীমিত ও ভোক্তার অসীম চাহিদা। সম্পদ হচ্ছে যে সব দ্রব্য বা পণ্য মানুষের অভাব পূরণ করে এবং এর যোগান অপ্রতুল। চলো দেখি সীমিত সম্পদ ও ভোক্তার অসীম চাহিদার সমস্যাটি আমরা দলগতভাবে সমাধান করতে পারে কীনা। আমরা দলে আলোচনা করে বের করি যেহেতু উদ্যোক্তার সম্পদ সীমিত এবং ভোক্তার আকাঙ্খা অসীম তাই উদ্যোক্তার কি কি করলে সীমিত সম্পদে অধিক পরিমাণে ভোক্তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। আমরা দলের আলোচনার সিদ্ধান্তগুলো নোট আকারে লিখে রাখবো।

ক্রম	কেন্দ্রীয় সমস্যা সমাধানে উদ্যোক্তার করণীয়

Draft Copy

আমরা সবাই মিলে বেশ কিছু বিষয় লিখেছি। এই বিষয়গুলোর সাথে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলোর হয়তো মিল খুঁজে পেতে পারি । অর্থনীতির এই কেন্দ্রীয় সমস্যায় উদ্যোক্তাকে তিনটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয়। সেগুলো হলোঃ

- কি দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? (What to produce & how much?)
- কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
- কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে ? (For whom to produce?)

চলো এখন আমরা অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া একজন উদ্যোক্তা রূপকের কার্ড উৎপাদনের গল্পটি পড়ি।

রূপক খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। তার আঁকা ছবি বন্ধু ও এলাকার মানুষের কাছে খুব জনপ্রিয়। তাই সামনের পহেলা বৈশাখে সে তার আঁকা ছবি দিয়ে কার্ড বানিয়ে বিক্রি করার পরিকল্পনা করলো। সে কার্ড তৈরি করার আগে কারা কারা কার্ড কিনতে পারে এমন একটি তালিকা করলো। তার এই পরিকল্পনার কথা শুনে বন্ধু, পরিচিত ও এলাকাবাসী মিলিয়ে প্রায় ১০০ জন তার কাছ থেকে কার্ড কেনার আগ্রহ দেখালো।

রূপকের কাছে ১০০০ টাকা আছে। সে এই টাকা নিয়ে বাজারে গেলো কার্ড তৈরির প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। বাজারে গিয়ে দেখলো কার্ড বানানোর জন্য ২ ধরনের কাগজ আছে। এক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১০ টাকা । আরেক ধরনের প্রতিটি কাগজের মূল্য ১২ টাকা। অন্যদিকে একটা বক্সে ১০টি রঙ পেন্সিল আছে তার দাম ১৫০ টাকা এবং আরেকটাতে ১৫টি রঙ পেন্সিল আছে যার দাম ২০০ টাকা।

এবার আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে নির্ধারণ করি রূপক তার জমানো টাকা দিয়ে কতটুকু কি পরিমাণে, কি প্রক্রিয়ায় ও কাদের জন্য পণ্য উৎপাদন করবে।

রূপক কি কার্ড ও কত পরিমানে তৈরি করতে পারবে? (What to produce & how much?)	
রূপক কিভাবে বা কোন প্রক্রিয়ায় কার্ডগুলো তৈরি করবে? (How to produce?)	
রূপক তার পণ্য (কার্ড) কাদের জন্য তৈরি করবে? (For whom to produce?)	

এখন, আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য চার ধরনের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন জনগোষ্ঠীর জন্য কোন পণ্য/সেবাগুলো প্রয়োজন তা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে নির্ধারণ করবো এবং কার জন্য উৎপাদন কলামে লিখবো। উল্লেখ্য আমরা প্রয়োজনে একাধিক জনগোষ্ঠীর নাম লিখতে পারি। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমরা অনুসন্ধানী পাঠের কেন্দ্রীয় সমস্যা অংশটুকু পড়বো এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেবো।

Draft Copy

অতি দরিদ্র	দরিদ্র	সচ্ছল	বিত্তশালী/ধনী

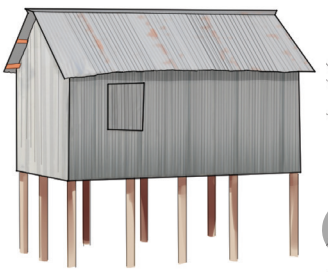

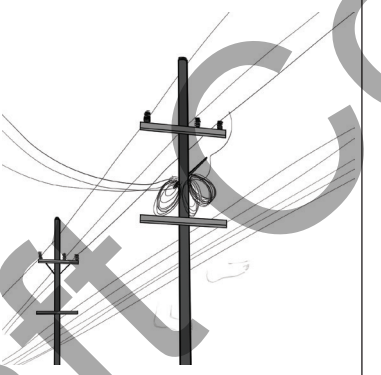

পণ্য/সেবা	কার জন্য উৎপাদন	কিভাবে উৎপাদন	কি পরিমাণে উৎপাদন
চিকিৎসা			
ব্যক্তিগত গাড়ি			

Draft Copy

শিক্ষা			
টিন শেড বাড়ি			
বিদ্যুৎ			
ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস(ফ্রিজ)			

এখন পণ্য বা সেবাগুলোর উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে পর্যালোচনা করবো। এ পর্যায়ে আমাদের অনেকের এখন মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার সংরক্ষণ কিভাবে হবে। আমরা যদি একটু চিন্তা করি যেকোনো দ্রব্য বা পণ্য সংরক্ষণ যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি এই পণ্য উৎপাদনের জন্য বা সেবা প্রদানের জন্য যে ভূমি, ভবন, পণ্য ব্যবহৃত হয় তাও সংরক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। যেমন, শিক্ষা সেবার জন্য প্রয়োজনীয় স্কুল ঘর, বই-খাতা, কলম ইত্যাদি এবং চিকিৎসা সেবার জন্য হাসপাতাল, ঔষুধ, টীকা, ছোটবড় নানা যন্তপাতি ও সরমঞ্জাম, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়।

এই কাজটি করার সময় কি কি পণ্য উৎপাদন প্রয়োজন, কি পরিমাণে উৎপাদন প্রয়োজন, এর ভোক্তা কারা এবং পণ্যগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে তা নির্ধারণ করবো।

পণ্য/সেবা	পণ্য উৎপাদন/সেবা প্রদান	বণ্টন	ভোগ (ভোক্তা)	সংরক্ষণ
চিকিৎসা				
ব্যক্তিগত গাড়ি				
শিক্ষা				
টিন শেড বাড়ি				
বিদ্যুৎ				
ইলেক্ট্রনিক্স জিনিস (ফ্রিজ)				

Draft Copy

এবার আমরা পত্রিকা/ইন্টারনেট/লাইব্রেরির বই/বিদেশে অবস্থান করেছেন এমন কারোর সাক্ষাৎকার নিয়ে বিশ্বের যেকোনো একটি দেশের কয়েকটি পণ্য বা সেবার উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জানবো এবং আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যার আলোকে উপরের ছকটি ব্যবহার করে পর্যালোচনা করব। এটি বাড়ির কাজ হিসেবে জমা দেবো।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাধান করার চেষ্টা করা হয়। কী উৎপাদন করা হবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করা হবে? কীভাবে উৎপাদন করা হবে? কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? এই সমস্যাগুলো বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমাধান করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার আগে চলো আমরা ৩টি দলে ভাগ হয়ে যাই। প্রথম দলটি সরকার বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্বে থাকবে, দ্বিতীয় দলটি ব্যবসায়ী (১ম পর্বে) বা পণ্য উৎপাদনকারী (২য় পর্বে) এবং তৃতীয় দলটি হচ্ছে ভোক্তা। আমরা ক্লাসরুমের ফাঁকা জায়গায় বা খেলার মাঠেও এই কাজটি করতে পারি। এই কাজটি আমরা ২টি পর্বে সম্পন্ন করবো।

প্রথম পর্বের জন্য আমরা ৩টি দলের কাজ বুঝে নিই।

সরকার	ব্যবসায়ী	ভোক্তা
এ দলটি বাজার সংশ্লিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।	১. ব্যবসায়ী দল ভোক্তার যে যে দ্রব্যের চাহিদা রয়েছে সে সমস্ত দ্রব্যের তালিকা করবে এবং উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেবে। ২. দ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে প্রতিটি পণ্যের জন্য দাম নির্ধারণ করবে।	১. ভোক্তাদলের কি কি পণ্য প্রয়োজন তার একটি তালিকা করবে। ২. ভোক্তাদল বাজারে গিয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে ব্যবসায়ী দলের কাছ থেকে পণ্য কিনবে।

তালিকা করা হয়ে গেলে আমরা ক্লাসে বা খেলার মাঠে একটি মডেল বাজার তৈরি করবো। যেখানে পণ্যগুলোর নাম থাকবে। ভোক্তাদল বাজারে ব্যবসায়ী দলের কাছে দরকষাকষি করে একটা দাম নির্ধারণ করে কিনে নেবে। এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের তৈরি কাগজের টাকা ব্যবহার করবো।

Draft Copy

দ্বিতীয় পর্বের জন্য ৩টি দলের কাজ

সরকার	পণ্য উৎপাদনকারী	ভোক্তা
১. এই দলটি সিদ্ধান্ত নেবে কি কি পণ্য উৎপাদন করবে। ২. পণ্য উৎপাদনে কত টাকা বিনিয়োগ এবং কিভাবে উৎপাদন করবে সেই সিদ্ধান্ত নেবে। ৩. উৎপাদিত পণ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন বুথ বা জায়গা নির্ধারণ করবে যেখান থেকে ভোক্তা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রতহ করবে।	পণ্য উৎপাদনকারী দল সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপাদন করবে।	১. সরকার দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উৎপাদিত পণ্য ভোক্তা সংগ্রহ করবে।

সরকার দলের নির্ধারিত বুথ বা জায়গা থেকে ভোক্তাদল তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করবে।

আমরা খেয়াল করলে দেখব প্রথম পর্বে দ্রব্য বা পণ্য কেনা বেচায় রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা ছিল না। উৎপাদনের উপাদান ও মালিকানা ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত ছিল। এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে বাজার অর্থব্যবস্থা বলে। এই অর্থব্যবস্থায় দাম নির্ধারিত হয় ভোক্তার চাহিদা ও সম্পদের যোগানের উপর। পণ্য বিক্রি করে মুনাফা অর্জনই এখানে প্রধান বিষয়। তাই যে ব্যবসায়ী কম দামে ভালো পণ্য বিক্রি করতে পারে সেই বেশি লাভবান হন। এখানে তাই পণ্য বাজারে প্রতিযোগিতা থাকে।

দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখতে পাই, এখানে সরকারের বা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের প্রাধান্য রয়েছে। অর্থাৎ সব ধরনের সিদ্ধান্তই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে নেওয়া হয়। এখানে উৎপাদনকারী বা ভোক্তার কোনো ধরনের মতামত বা পছন্দ থাকে না। উৎপাদনের উপাদান ও মালিকানা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ উৎপাদন থেকে বিতরণ সবই সরকারের নিয়ন্ত্রনে থাকে এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে।

সেইসাথে, মিশ্র অর্থনীতি হচ্ছে বাজার এবং সরকারি নিয়ন্ত্রনের সহাবস্থান। এই অর্থব্যবস্থায় উপকরণের মালিকানা যেমন ব্যক্তির হাতে রয়েছে তেমনি আবার সামাজিক নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রণোদনার ব্যবস্থা রয়েছে। সেবা বা বাজারে পন্যের দাম যেমন চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তেমনি আবার দাম অতিরিক্ত হলে জনসাধারণের/ক্রেতাদের সুবিধার্থে সরকার অতিরিক্ত দাম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল বা নীতি অবলম্বন করে।

Draft Copy

আমরা হয়তো আরেক ধরনের অর্থব্যবস্থার কথা শুনে থাকবো, সেটি হচ্ছে কল্যাণমূলক অর্থনীতি। যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবকল্যাণ এবং উন্নতমানের মৌলিক চাহিদা সরবরাহ করা যাতে নাগরিকরা প্রকৃত আয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে। রাষ্ট্র এতে নাগরিকের কর্মসংস্থানের অবারিত সুযোগ করে দেয়। এই অর্থব্যবস্থার মূল আকর্ষণ হচ্ছে সম্পদ ও আয়ের বণ্টন অত্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক,সম্পদের বণ্টন এমনভাবে করা হয় যাতে কেউ তার মানবিক জীবনযাপনের চাহিদা পূরনে অপারগ না হয়।

আমরা অনুসন্ধানী পাঠের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাঠ করে এই চার ধরনের অর্থনীতি সম্পর্কে জন্য জানতে পারবো।

ইতোমধ্যে কয়েকটি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা জানলাম। এখন কি বলতে পারি- আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা কোন ধরনের? চলো একটু খুঁজে বের করি। আমরা এই কাজটি করবো দলগতভাবে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে। এ জন্য আমরা আমাদের পরিচিত পরিমন্ডলে বা কোনো ভোক্তার কাছেও জিজ্ঞেস করে তথ্য নিতে পারব।

১. সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা কার জন্য?

২. কে এই সেবা প্রদান নিয়ন্ত্রণ করেন?

৩. এই সেবা প্রদানের লক্ষ্য কি?

৪. প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা কার জন্য?

৫. কে এই সেবা প্রদান নিয়ন্ত্রণ করেন?

৬. এই সেবা প্রদানের লক্ষ্য কি?

লক্ষ্য করলে দেখবো, আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা একসাথে কাজ করছে। অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতি বিরাজমান। আমাদের দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে আরো কিছু তথ্য জানার জন্য আমরা অনুসন্ধানী পাঠের বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা পাঠ করবো।

এখন চারধরনের অর্থব্যবস্থার আলোকে চলো আমরা বাংলাদেশ বাদে অন্য যেকোনো একটি দেশের কয়েকটি পণ্য বা সেবার উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া আলোচনা করি। এ জন্য আমরা অনুসন্ধানী পাঠ থেকে তথ্য নিতে পারি বা ইন্টারনেট বা পত্রিকা বা বইয়ের সহযোগিতাও নিতে পারি। এখানে দেশ হিসেবে ভিয়েতনামের পোশাক শিল্পের একটি নমুনা উত্তর দেওয়া হলো। আমরা আমাদের পছন্দ মতো যেকোনো দেশ বাছাই করতে পারি।

Draft Copy

ক্রম	পণ্য বা সেবা	অর্থ ব্যবস্থা	উৎপাদন	বণ্টন	ভোগ	সংরক্ষণ
১.	পোশাক	বাজার অর্থব্যবস্থা	উৎপাদনের উপাদান নিয়ন্ত্রণ থাকে কারখানার মালিকের উপর	যেই মালিকের উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি। (আয় বণ্টন নীতি)	যে ভোক্তার ক্রয় ক্ষমতা বেশি সে বেশি কেনে।	সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব উৎপাদনের মালিকের উপর নির্ভর করে।
২.						
৩.						
৪.						

Draft Copy

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সমতার নীতি

এখন তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে উৎপাদনের উপাদান ও আয়-বৈষম্য সম্পর্কে যা জেনেছ তা একটু মনে করার চেষ্টা কর। প্রয়োজনে আমরা সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের এই অংশটি আবার পড়ে নিতে পারি। আমরা নিচের চিত্র থেকে খুঁজে বের করি কোন ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদান বেশি এবং আয় বেশি।

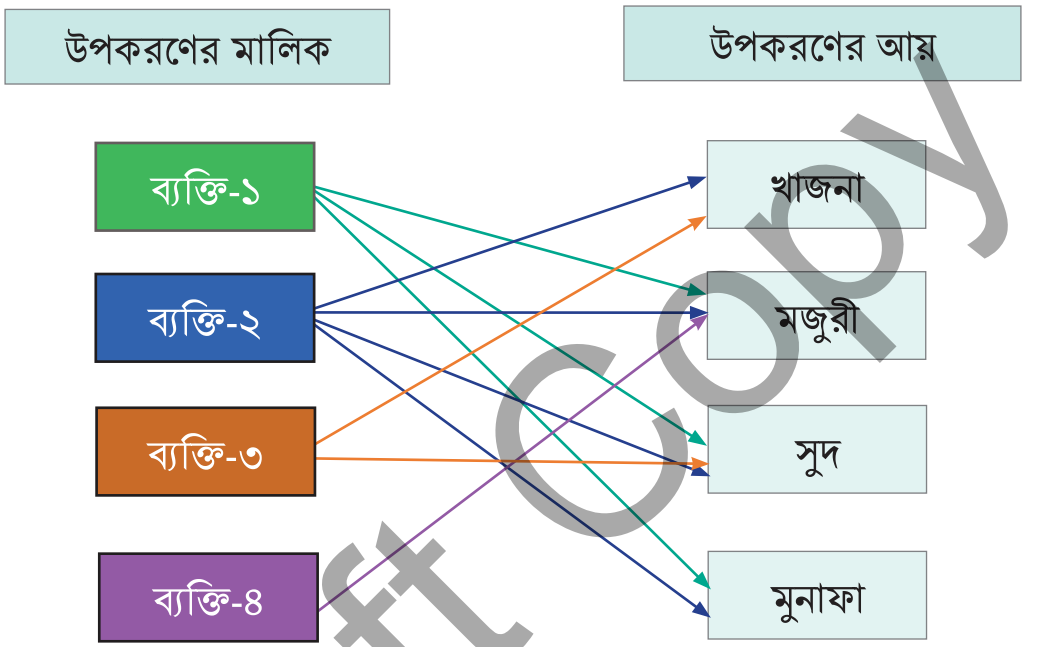

আমরা নিশ্চই বুঝতে পারছি যে ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ বেশি তার আয় বেশি। অর্থাৎ যার উপকরণের মালিকানা যত বেশি থাকবে তার আয়ের পরিমাণ তত বাড়বে।

আবার যার উৎপাদনের উপকরণের যোগান সীমিত পরিমাণে রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির হাতে উপকরণের মালিকানা কম পরিমাণে রয়েছে তার আয়ের পরিমাণও কম। বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ফার্ম তার আয়ের ভিত্তিতে ভোগ পরিচালিত করবে। অর্থাৎ ভোগ বা ব্যয় নির্ভর করবে তার আয়ের উপর। বাজার অর্থনীতিতে যার আয় যত বেশি তিনি তত বেশি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং বাজার থেকে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

আর যার উপকরণের মালিকানা কম অর্থাৎ কম পরিমাণে বা খুব সামান্য উপকরণের মালিকানা থাকে তাদের আয়ের পরিমাণ স্বল্প বা অনেকাংশে থাকে না। কারণ মজুরি কম থাকায় তার আয়ের পরিমাণ কম। কোনো ব্যক্তির আয়ের স্বল্পতার কারণে সে অন্যান্য সম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্বল্প আয়ের ফলে তার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। সে তখন প্রয়োজনীয়/মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হিমসিম খায়। আবার যার আয় বেশি তিনি ভূমি বা ফ্রিজ, গাড়ীর মত অন্যান্য সম্পদ ক্রয়/অর্জন করতে পারেন বেশি।

Draft Copy

চলো এখন আমরা আমাদের চারপাশের বিভিন্ন পেশার মানুষের আয়ের পরিমাণ এবং তার বিভিন্ন পণ্য বা সেবা পাওয়ার সুযোগগুলো নির্ণয় করি। এজন্য আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যেতে পারি। আমরা একেক দল একেক পেশার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবো। তাই আমরা ৭-৮টি দলে ভাগ হয়ে কোন কোন পেশার মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবো তা ঠিক করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

দল-১	দল-২	দল-৩	দল-৪	দল-৫	দল-৬	দল-৭

এই সাক্ষাৎকারের জন্য আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করতে পারি। মনে রাখবো সাক্ষাৎকার নেওয়ার পূর্বে আমরা তথ্য প্রদানকারীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেবো। আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো লিখে রাখবো। যদি তথ্য প্রদানকারী অনুমতি দেন তবে আমরা সাক্ষাৎকারটি রেকর্ড করে রাখতে পারি।

১. আপনার পেশা থেকে মাসিক আয় কত?
২. আপনি আপনার আয় থেকে আপনার পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবাগুলো কি যথাযথভাবে নিতে পারেন?

২ নং এর উত্তর হ্যাঁ হলে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবো:

৩. আপনার প্রতিবেলার খাবারের তালিকাটি কেমন হয়?
৪. কেনো আপনি এই খাবার নির্বাচন করেন?
৫. পোশাক বা বস্ত্রের ক্ষেত্রে কি ধরনের পোশাক ক্রয় করেন?
৬. প্রতিবছর আনুমানিক কয়টি পোশাক ক্রয় করেন?
৭. আপনার বাসস্থানটি কেমন? (কয়টি কক্ষ আছে? টিনশেড নাকি বিল্ডিং?)
৮. এটি কি ভাড়া বাসা নাকি নিজের বাসা?
৯. আপনার পরিবারের সদস্যরা কি ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করেন?
১০. আপনি তাদের পড়াশুনার জন্য কি কি সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন?
১১. পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য আপনি কোন ধরনের ডাক্তার বা হাসপাতালের কাছে যান? (প্রাইভেট বা সরকারি)
১২. কেনো আপনি এই ধরনের সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন?

২ নং এর উত্তর না হলে আমরা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করবো:

১৩. পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রতিদিন কত বেলা খাবারের ব্যবস্থা আপনি করতে পারেন?
১৪. পোশাক কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেন?
১৫. যদি কিনে থাকেন, কেনার ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে টাকার ব্যবস্থা করেন?
১৬. আপনার বাসস্থানটি কেমন?
১৭. পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা সেবা কেন নিশ্চিত করতে পারছেন না?
১৮. আপনি বা আপনার পরিবারের সদস্যরা অসুস্থ হলে আপনি কি করেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করবো।

Draft Copy

প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত তথ্য থেকে নিচের ছকটি পূরণ করবে। একটি নমুনা উত্তর দেওয়া হলো।

দল	পেশা	মাসিক আয়	খাদ্য	বস্ত্র	বাসস্থান	শিক্ষা	চিকিৎসা
দল ১	ডাক্তার	৮০,০০০ টাকা	পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য	রুচিশীল পছন্দনীয় পোশাক। বছরে আনুমানিক ১০-১৫টি পোশাক ক্রয় করেন।	চার কক্ষ বিশিষ্ট ২ তলা বিল্ডিং।	দুই সন্তানকে শহরের মানসম্মত স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। বাসায় মাসিক বেতন দিয়ে টিউটর রেখেছেন।	সরকারি হাসপাতাল।
দল ২							
দল ৩							
দল ৪							
দল ৫							
দল ৬							
দল ৭							

Draft Copy

আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে পেশার মানুষের মাসিক আয় বেশি তার পণ্য বা সেবা পাওয়ার সুযোগ বেশি। এই আয় বৈষম্যের কারণে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখতে পাই। চলো আমরা এই বৈষম্যগুলো দেখে নিই।

চিত্রঃ বৈষম্যের বিভিন্ন ধরণ

বৈষম্য দূর করার জন্য প্রত্যেক মানুষকে পণ্য বা সেবা গ্রহণের সমান সুযোগ প্রদান করতে হবে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, লিঙ্গ, পেশা বা অঞ্চলভেদে সবার জন্য গুণগত ও মানসম্মত সেবা গ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে। এমন রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে সকল মানুষের সমান সুযোগ থাকবে। এটাকে আমরা সামাজিক সমতার নীতি বলতে পারি। চলো এখন আমরা অনুসন্ধানী পাঠের আয় বৈষম্য ও দারিদ্র্য/অসমতা অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে এবং দলগতভাবে আলোচনা করে আমাদের দেশের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য কি কি করা প্রয়োজন তা সমতার নীতির আলোকে নির্ধারণ করি এবং তালিকা করি।

এবার আমরা বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের যেকোনো একটি দেশের কোনো একটি সেবা যেমন, শিক্ষা বা চিকিৎসা সেবা কেমন সম্পর্কে ইন্টারনেট/বই/কোনো ব্যক্তির সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবো। সেই দেশের সেবাটি সামাজিক সমতার নীতির আলোকে কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে তা পর্যালোচনা করে বাড়ির কাজ হিসেবে প্রতিবেদন লিখে জমা দেব।

Draft Copy

অনুসন্ধানী পাঠ

অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা (Central Problem of an Economy)

একজন উৎপাদক (বা ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তা বা দেশ বা অর্থনীতি) সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা একসাথে উৎপাদন করতে পারে না। একজন ভোক্তা যেমন তার সকল অভাব একত্রে পূরণ করতে পারে না তেমনি একজন উদ্যোক্তাও সকল পণ্য ও সেবা একসাথে উৎপাদন করতে পারে না । এটি যেমন একজন উৎপাদকের বেলায় প্রযোজ্য তেমনি একটি অর্থনীতির জন্যও সত্য। যেহেতু একটি দেশের বা অর্থনীতির সম্পদ সীমিত বা অপ্রর্যাপ্ত তাই ইচ্ছে করলেই আমরা সব জিনিস/ দ্রব্য-সেবা সামগ্রী উৎপাদন করতে পারি না। তখন আমাদের চিন্তা করতে হয়:

- ✓ কোন দ্রব্য উৎপাদন করা হবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে? (What to produce & how much?)
- ✓ কীভাবে উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)
- ✓ কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

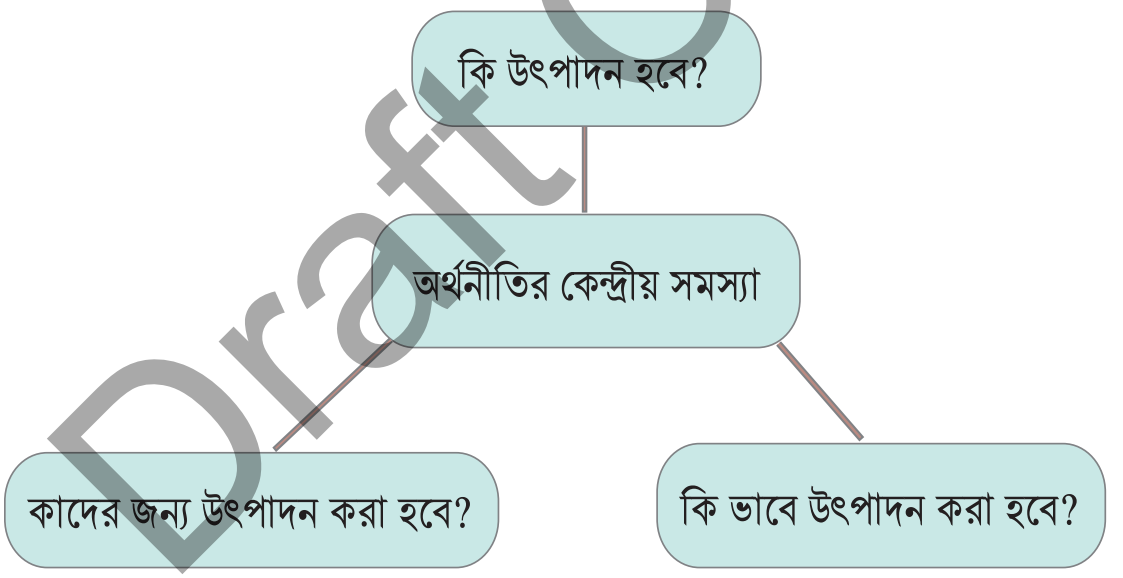

চিত্রঃ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা

সম্পদের স্বল্পতা বা অপর্যাপ্ততাই হল কেন্দ্রীয় সমস্যার মূল কারণ। আমরা কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো।

Draft Copy

১। কোন দ্রব্য উৎপাদন করা হবে? (What to produce?)

প্রত্যেকটি অর্থনীতি বা সমাজকে অনেকগুলো সম্ভাব্য বিকল্প দ্রব্য ও সেবা থেকে কোন কোন দ্রব্য ও সেবা কতটুকু উৎপাদন করবে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। একটা দেশের অর্থনীতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় কোন কোন দ্রব্যগুলো আগে উৎপাদন করবে এবং কি পরিমাণে উৎপাদন করবে।

ধরো আমাদের মৌলিক চাহিদা অন্ন/খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষা-চিকিৎসার অভাব আগে পূরণ করবো না বিলাস দ্রব্য/ যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করবো । আমাদের সম্পদ যেহেতু সীমিত, তাই সব মৌলিক চাহিদাও একত্রে পূরণ করতে পারবো না । তখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ উৎপাদন করবো। যেমনঃ আমাদের সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন কোন খাতে বাজেটের/সম্পদের বেশি ব্যবহার করতে হবে। সরকারের যেহেতু সীমিত বাজেট বা সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে তাই ইচ্ছে করলেও সরকার সব খাতে একত্রে বেশি বরাদ্ধ বা ব্যয় করতে পারে না । তাই বিভিন্ন ধরনের বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

২। কীভাবে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করা হবে? (How to produce?)

একজন উৎপাদককে বা সংগঠককে বা রাষ্ট্রকে বা অর্থনীতিকে কী উৎপাদন করা হবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আবার ভাবতে হয় এই দ্রব্যগুলো কীভাবে বা কী প্রক্রিয়ায় বা কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হবে? এক্ষেত্রে উৎপাদককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে কি বেশি পরিমাণ শ্রম এবং কম পরিমাণ মূলধন বা কম পরিমাণ শ্রম লাগিয়ে বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে উৎপাদন করবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যখন একটি কৃষি খামার পরিদর্শন করেছ তখন দেখেছো যে, আমাদের দেশে যন্ত্রপাতির অর্থাৎ মূলধনের তুলনায় শ্রমিকের ব্যবহার বেশি হচ্ছে ।

আবার তোমরা যখন তৈরি পোশাক শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেছ তখন দেখেছ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে কীভাবে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে শ্রমের পরিবর্তে মূলধনের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। এক্ষেত্রে একজন মালিককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তিনি কোন ধরনের উপকরণ বেশি বা কম বা সমান সমান ব্যবহার বা নিয়োগ করবেন।

তবে সাধারণত যে দেশে প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক পাওয়া যায় অর্থাৎ শ্রমঘন অর্থনীতির দেশ সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে যে সব দেশে মূলধনের প্রাচুর্য রয়েছে তারা উৎপাদনে কম পরিমাণ শ্রম এবং বেশি পরিমাণ মূলধন বা মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে।

৩। কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? (For whom to produce?)

কাদের জন্য উৎপাদন করা হবে? এটিকে আমরা সহজে বলতে পারি যে, উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কারা ভোগ করবে বা কারা হবেন ভোক্তা অথবা কাদের মাঝে বণ্টিত হবে? উৎপাদনের উপকরণের মালিকরা কে কি পরিমাণ ভোগ করবে? কে বেশি পাবে অথবা কে কম পাবে? অর্থনীতিতে সবার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উচিত নাকি উচিৎ নয়?

এভাবে প্রতিটি অর্থনীতি উৎপাদিত পণ্যের বণ্টন কীভাবে হবে এবং কাদের মাঝে কতটুকু বণ্টন হবে, এই সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে-কোনো দেশের/অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হল, অপর্যাপ্ত সম্পদের বণ্টন এবং চূড়ান্ত দ্রবও সেবার সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থাপনা। এ পর্যায়ে অনিম স্যার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা সকলেই অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা সম্পর্কে অবহিত বা সম্যক জ্ঞান লাভ করেছ। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেমন সব অভাব/আকাঙক্ষা একসাথে পূরণ করতে পারি না তেমনি একটি দেশের অর্থনীতি ও সম্পদের স্বল্পতা থাকার কারণে সব দ্রব্য ও সেবা একত্রে উৎপাদন করতে পারে না। যার ফলে সমস্যা সৃষ্টি হয় যাকে আমরা অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

Draft Copy

বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

১.পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা, ভোগ, বণ্টন ইত্যাদি ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার ইচ্ছে অনুযায়ী হয়। এখানে সরকার কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করে না। কী উৎপাদন করবে এবং কী পরিমাণ উৎপাদন করবে তা নির্ভর করে বাজারে কোন দ্রব্যের/পণ্যের চাহিদা রয়েছে তার ওপর। বাজারে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট পণ্যের চাহিদা বিপুল পরিমাণে থাকে এবং তার বিনিময়ে বিক্রেতা ভাল দামও পাচ্ছেন তাহলে বাজার অর্থব্যবস্থায় ঐ পণ্যের উৎপাদন বেশি হয়। এ কারণে এ ব্যবস্থাকে অনেকসময় বাজার অর্থনীতিও বলা হয়।

কীভাবে দ্রব্যটি উৎপাদিত হবে? এর সমাধান বাজার অর্থব্যবস্থায় হয় নিম্নরূপে:

বিনিয়োগকারীরা/উদ্যোক্তরা হিসেব করে দেখে কোন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন করলে তার উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন হয়। সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে তারা উৎপাদন করে থাকে। যেমন, যে দেশে জনসংখ্যা বেশি পাওয়া যায় সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সস্তা শ্রম বেশি পাওয়া যায় এবং সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কম পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। কারণ যেখানে শ্রমিককে অল্প পরিমাণে মজুরি দিয়ে অধিক উৎপাদন করিয়ে নেওয়া যায়।

আবার যেখানে/যে দেশে শ্রমের মূল্য অধিক বা শ্রমিককে বেশি মজুরি দিতে হয় সে দেশে/সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বেশি পরিমাণে মূলধন বা আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি হয় এবং কম পরিমাণ শ্রমিক ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদক কী উৎপাদন করবেন এবং কীভাবে উৎপাদন করবেন এ দুই ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ভোগ করেন ।

বর্তমানে খাঁটি/বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বলতে তেমন কোনো দেশ নেই। কারণ ভোক্তার সুবিধার্থে প্রত্যেক দেশকেই বাজারের ওপর কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করতে হয় বা সরকারের হাতে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রাখতে হয় জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে। তাই বাস্তবে বিশুদ্ধ বাজার অর্থব্যবস্থা পাওয়া সত্যিই কঠিন ।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, জাপান প্রভৃতি দেশে বাজার অর্থব্যবস্থা বা ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ চালু রয়েছে।

বাজার অর্থব্যবস্থায় একজন উৎপাদকের মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে নূন্যতম খরচে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এইজন্য উৎপাদন খরচ যতই কম পরিমাণে হবে ততই তার মুনাফা বাড়বে। উৎপাদন খরচ কমাতে হলে, উৎপাদক/উপকরণের মালিককে যথাসম্ভব কম মূল্য পরিশোধ করতে দেখা যায়। যেমন- একজন শ্রমিক দিনে উৎপাদনে যে পরিমাণে অবদান রাখেন বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে মূল্য সৃষ্টি করেন তাকে কিন্তু মজুরি হিসেবে খুবই কম পরিমাণ পরিশোধ করা হয়।

যদি একজন শ্রমিককে তার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান মজুরি দেয়া হতো তাহলে সমাজে কোনো ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হতো না। তাই বাজার অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক এবং উপকরণের অন্যান্য মালিকরা প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হারে উপকরণের দাম/মূল্য পায় না বিধায় বৈষম্য দেখা যায়। যার যার প্রেক্ষিতে শ্রমিকশ্রেণি এবং অন্যান্য কাঁচামালের বা উপকরণের মালিকরা যথার্থ মূল্য না পাওয়ায় বাজার থেকে ইচ্ছেমত বা চাহিদা মতো দ্রব্য বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। এটা বাজার অর্থ ব্যবস্থার দুর্বলতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

Draft Copy

তবে বাজার অর্থব্যবস্থায় ভোক্তা বিভিন্ন ধরনের পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ভোগ করেন। অর্থাৎ একজন ভোক্তা তার পছন্দ অনুযায়ী বাজার থেকে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে পারেন। বাজার অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনে দক্ষতা অর্জিত হয়। এবং অনেক ধরনের উদ্যোক্তা থাকার কারণে বাজারে এক ধরনের প্রতিযোগিতাও কাজ করে। এর ফলে উৎপাদকদের মাঝে মানসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। ফলে বাজার অর্থব্যবস্থায় কিছু সুফলও পাওয়া যায় । যার ফলে ভোক্তারা অনেক সময় উপকৃত।

২. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা

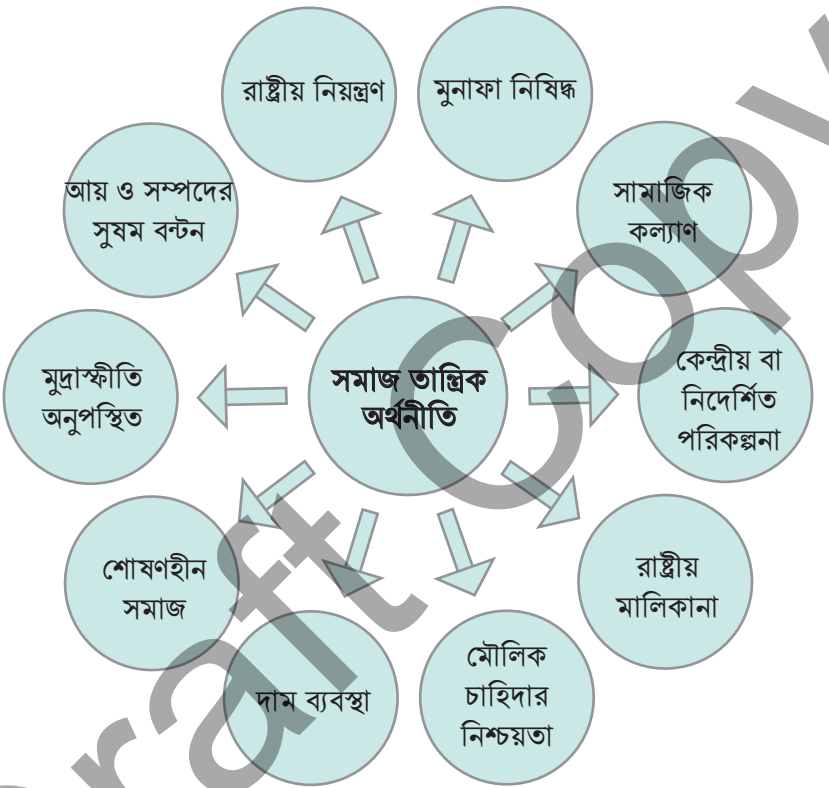

চিত্র: সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

কোন পদ্ধতিতে উৎপাদন করবে এবং কাদের মাঝে উৎপাদিত দ্রব্য বণ্টিত হবে সবকিছুই কেন্দ্রের/রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

সমাজে যাতে বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ না করে এইজন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ভূমি, শ্রম, মূলধন, কলকারখানা, গণপরিবহণ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুরই মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে। রাষ্ট্র পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদনের পরিমাণ এবং সমাজের জন্য কী দ্রব্য প্রয়োজন সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা উদ্যোক্তার বা ভোক্তার কোনো ধরনের মতামত বা স্বাধীনতা থাকে না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই যৌক্তিক আচরণ করে। চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই অর্থব্যবস্থায় সমাজের কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে

Draft Copy

শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা প্রায় শূন্য বা অনুপস্থিত। মূল্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনো ভোক্তা বা ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তার দাম নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ নেই।

ধনতান্ত্রিক বা বাজার অর্থনীতিতে যেমন ব্যক্তিগত আয়ের মাধ্যমে কোনো ভোক্তা কী পরিমাণ ভোগ করবে তা নির্ভর করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যেহেতু উপকরণের বা সম্পদের মালিকানা থেকে কোনো ব্যক্তিগত আয় সৃষ্টি হয় না তাই ব্যক্তির ভোগের পরিমাণ এবং কোন দ্রব্য ও সেবা ভোগ করবে তা নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর।

নির্দেশনামূলক অর্থনীতিতে সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় সম্পন্ন হয়। এখানে উৎপাদন, বিনিময়,বণ্টন, ভোগ এবং দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ সব কিছুই কেন্দ্রীয়ভাবে হয়ে থাকে। দেশের কল্যাণ বা উন্নয়ন তথা জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন/অগ্রগতি নির্ভর করে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বা পরিকল্পনার উপর। বর্তমানে ইউরোপের পোল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রচলন রয়েছে। এছাড়া চীন ও কিউবায় আংশিক সমাজতন্ত্র চালু আছে।

তাত্ত্বিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বণ্টননীতি হলো "প্রত্যেকে অবদান রাখবে তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী এবং পাবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী"। তবে বাস্তবে দেখা যায় পরিকল্পিত বা নির্দেশনামূলক অর্থনীতিতে প্রত্যেকে পায় তার উৎপাদন কাজে তার অবদান অনুযায়ী। এ অর্থনীতিতে সমাজের কেউই যাতে সম্পদের বণ্টন থেকে বিচ্যুত না হয় তার জন্য রেশন কার্ডের মাধ্যমে আয় ও সম্পদ বণ্টন করা হয়।

অর্থাৎ সমাজের এক একজন ব্যক্তি তার নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং সে কাজের ধরণ অনুযায়ী বা অবদান অনুযায়ী প্রকৃত পারিশ্রমিক পাবে। আয়ের এ ধরনের বণ্টন অনুসরণ করলে সমাজে তুলনামূলক ভাবে সমতা বিরাজ করে বলে বিভিন্ন পন্ডিতজন মনে করেন।

৩. মিশ্র অর্থব্যবস্থা

এখন আমরা দেখবো মিশ্র অর্থনীতির মাধ্যমে কীভাবে কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করা হয়। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি, খাঁটি বা বিশুদ্ধ ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদতন্ত্র/বাজার অর্থনীতি এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত অর্থনীতি দুনিয়াতে নেই বললেই চলে। বিশ্বে বর্তমানে উপরোক্ত দু'টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মিশ্রণ দেখা যায়। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতি যেমন প্রচলিত রয়েছে সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও সরকারের নজরদারিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় মালিকানাই বিদ্যমান/স্বীকৃত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে/কার্যকলাপে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাজার প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিকল্পনার মাধ্যমে/নির্দেশে পরিচালিত হয় তাকে মিশ্র অর্থনীতি বলে।

Draft Copy

চিত্রঃ মিশ্র অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

Draft Copy

৪. কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থা

বাজার অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং মিশ্র অর্থনীতি ছাড়াও কল্যাণমূলক অর্থনীতির মাধ্যমেও কিছু কিছু দেশ অর্থনীতির কেন্দ্রীয় সমস্যাগুলো সমাধান করে থাকে। কল্যাণমূলক অর্থনীতির মূল/প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানবকল্যাণ এবং উন্নতমানের মৌলিক চাহিদা সরবরাহ করা যাতে নাগরিকরা প্রকৃত আয়ের মাধ্যমে বাজার থেকে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে পারে। রাষ্ট্র ব্যবস্থা নাগরিকের কর্মসংস্থানের অবারিত সুযোগ করে দেয়। এই অর্থব্যবস্থার মূল আকর্ষণ হচ্ছে সম্পদ ও আয়ের বণ্টন অত্যন্ত ন্যায়ভিত্তিক,সম্পদের বণ্টন এমন ভাবে করা হয় যাতে কেউ তার মানবিক জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সবার উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং গৃহ নিশ্চিত করা হয়। এখানে আয়ের বৈষম্য তেমনভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ধনীদের প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা আরোপ করে তা রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে বণ্টন করে থাকে।

চিত্রঃ কল্যাণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

কল্যাণমূলক অর্থব্যবস্থায় পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন উৎপাদন ব্যবস্থা তারা সাধারণত পরিহার করে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান (সুইডেন,নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ইত্যাদি) দেশগুলো তাদের পরিবেশের জন্য উপযোগী জ্বালানী ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। পরিবেশ দূষণ হয় এমন কোনো জ্বালানী ব্যবস্থা তারা ব্যবহার/অনুমোদন করে না। মানুষের/নাগরিকের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে। এ অর্থব্যবস্থায় মানুষের আইনের শাসনের প্রতি আস্থা থাকে। কারণ এখানে নাগরিকের বাক স্বাধীনতা থাকে এবং সবাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

Draft Copy

বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থা

চিত্রঃ বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

আমাদের দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মিশ্র অর্থব্যবস্থা। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বাজার অর্থনীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমন্বয় রয়েছে। এখানে সম্পদের মালিকানা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র যৌথভাবে উপভোগ করে। এখন বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি-র প্রায় ৩৫%। আমাদের অর্থনীতির বিশাল অংশ বেসরকারি খাতের ওপর নির্ভরশীল। সরকারি বিনিয়োগ সাধারণত বিদ্যুৎ খাতে, অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। এক কথায় ব্যক্তি উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় বাংলাদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।

আমরা জানি, ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সম্মুখ যুদ্ধ এবং ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরাস্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি লাভ করে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলার অর্থনীতিকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে গঠন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমি বাংলাদেশকে এশিয়ার সুইজারল্যান্ড বানাতে চাই"।

Draft Copy

আমরা জানি, সুইজারল্যান্ড কল্যাণমূলক অর্থনীতির একটি দেশ। যেখানে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করে। রাষ্ট্র নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। ধনী গরীব মানুষের বৈষম্য নেই বললেই চলে। বঙ্গবন্ধু এমন একটি দেশের মতো বাংলাদেশকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন তিনি। যেখানে মানুষে মানুষে বৈষম্য কমে আসবে।

১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন তাতে তিনি বাঙালির মুক্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন। আমরা জানি, মুক্তি শব্দটির বহুমাত্রিক অর্থ রয়েছে। রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ছিল তাঁর বক্তব্যে।

তাঁর রাষ্ট্র গঠনের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল গণমানুষের জীবনমানের উন্নতি। জনমানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। তিনি বৈষম্যহীন একটা সমাজব্যবস্থা গড়ার কথা বলেছিলেন যা বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত হয়েছিল। তিনি অঙ্গীকার করেছিলেন শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সোনার বাংলা গড়ার।

আমরা জানি বঙ্গবন্ধু শূন্য কোষাগার দিয়ে দেশের অর্থনীতি শুরু করেছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের রাস্তা, কালভার্ট, রেলপথ, বিমান বন্দর এবং সমুদ্র বন্দর ধ্বংস প্রায়। এক কোটি শরণার্থীকে দেশে ফেরত এনে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর স্বাধীন সরকারের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই সাড়ে তিন বছরেই বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ১৯৭২ সালের ৯৩ ডলার থেকে ১৯৭৫ সালে ২৭৩ ডলারে উন্নীত হয়। যা তখনকার সময়ে পাকিস্তান এবং ভারতের মাথাপিছু আয় থেকে বেশি ছিল। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির-৭.৫৩% এবং বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির- ২৪.৫২% অর্থাৎ মোট বিনিয়োগ জিডিপির- ৩২.০৫%। বর্তমান বাংলাদেশে মাথাপিছু জিডিপি ২৬৮৭ ডলার (২০২১-২২ অর্থ বছরে)।

এখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে কীভাবে দেশের অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত গড়ে তোলা যায় তার সেই প্রচেষ্টা র প্রমান রয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষাপট পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে দাম ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়ী শ্রেণি অনেক সময় অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে থাকে বা দাম নিয়ন্ত্রণ করে। ক্রয় ক্ষমতা যখন ক্রেতা সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায় তখন সরকার বাজারের ওপর প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করে। অনেক সময় সরকার বিভিন্ন দ্রব্যের দাম ঠিক করে দেয়। কখনো সরকারি সংস্থার মাধ্যমে পণ্য আমদানি ও বিপননের মাধ্যমে মূল্য নিয়ন্ত্রণর চেষ্টা দেখা যায় অর্থাৎ বাজার ব্যবস্থার পাশাপাশি এখানে সরকারি নিয়ন্ত্রণও দেখা যায় সাধারণত ক্রেতাদের উপকারের/ কল্যাণের কথা মাথায় রেখে।

বাংলাদেশে গত কয়েক দশক ধরে, বিশেষ করে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার পরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথা পিছু আয় ও অন্যান্য সূচক বেশ বেড়েছে। কিন্তু এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সকল মানুষের জীবনমান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে পারেনি। বর্তমান সরকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের জীবনমান ও আয়ের সংস্থানের জন্য অনেক দরিদ্রবান্ধব কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেমনঃ বয়স্ক ভাতা,অসহায় ও দুস্থ ভাতা, বিধবা ভাতা ইত্যাদি গুচ্ছগ্রাম, গৃহায়ণ প্রকল্প, মুক্তিযোদ্ধা ভাতার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে জনকল্যাণমূলক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি গড়ে তুলেছে।

Draft Copy

আমরা দেখেছি বাজার অর্থনীতিতে যদি একজন ব্যক্তির উৎপাদনের উপাদান বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে তার বিনিময়ে সে ব্যক্তি বেশি পরিমাণ আয় করেন। অর্থাৎ যার উপকরণের মালিকানা যত বেশি থাকবে তার আয়ের পরিমাণও তত বাড়বে।

আবার যার উৎপাদনের উপকরণের যোগান সীমিত পরিমাণে রয়েছে অর্থাৎ যে ব্যক্তির হাতে উপকরণের মালিকানা কম পরিমাণে রয়েছে তার আয়ের পরিমাণও কম। বাজার অর্থনীতিতে ব্যক্তি বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান/ফার্ম তার আয়ের ভিত্তিতে ভোগ পরিচালিত করবে। অর্থাৎ ভোগ ব্যয় নির্ভর করবে তার আয়ের উপর। বাজার অর্থনীতিতে যার আয় যত বেশি তিনি তত বেশি দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করেন এবং বাজার থেকে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করতে পারবেন।

আর যার উপকরণের মালিকানা কম অর্থাৎ কম পরিমাণে বা খুব সামান্য উপকরণের মালিকানা থাকে তাদের আয়ের পরিমাণ স্বল্প বা অনেকাংশে থাকে না। কারণ মুজুরি কম থাকায় তার আয়ের পরিমাণ কম। কোনো ব্যক্তির আয়ের স্বল্পতার কারণে সে অন্যান্য সম্পদ অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

আমরা যদি অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্রের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি স্বল্প মজুরি বা আয়ের ফলে বাজার থেকে মানুষের অন্যান্য সম্পদ/ভূমি ক্রয় করার সুযোগ কমে যায়। সে তার সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারেনা। ফলে সন্তানদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ানোর সুযোগ পায় না। তাছাড়া মিশ্র অর্থনীতিতে বাজারের ভূমিকা ক্রমশই বাড়ছে এক ধরনের প্রতিযোগিতার ফলে মানসম্পন্ন শিক্ষার ব্যয় বাড়ছে এভাবে কর্মক্ষেত্রের যোগ্যতা অর্জনে ধনী-দরিদ্রের সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। তবে বর্তমান সরকার বৈষম্য দূর করার জন্যে স্কুল পর্যায়ে বিনামূল্যে সব শিক্ষার্থীকে বই সরবরাহসহ নানা উদ্ধেগ গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এ সব প্রচেষ্টার ফল শিঘ্রই পাওয়া যাবে। আমরা জানি গুণগত শিক্ষা মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে। একইভাবে যারা মানসম্মত শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে তাদের মুজুরি বা আয় কম হয়।

সবার জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারলে এবং সাধারণ মানুষ/নাগরিক যদি উন্নত সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পায় তাহলে সামাজিক নায্যতা নিশ্চিত করা যায়। আর যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য বিভিন্ন মানের বা ধরনের সেবা অধিক অর্থের বিনিময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে নিম্ন আয়ের মানুষকে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করার জন্য আরো বেশি আর্থিক সমস্যায় নিমজ্জিত হতে হবে। তাই স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও সামাজিক সমতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রত্যাশা হল সবাই সমভাবে স্বাস্থ্যসেবা ভোগ করবে। সবার জন্য গুণগত বা একই মানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে। রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে সবার অংশগ্রহণ থাকবে। একটি দেশের সকল জায়গায়/অঞ্চলে সমানভাবে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যাবে। ধনী-দরিদ্র্যের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ থাকবে না।

আমরা এমন একটি সমাজের কথা বিবেচনা করবো যেখানে সমাজের সকল মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার থাকবে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কীভাবে এই মর্যাদাপূর্ণ অধিকার অর্জন করা যাবে? আমরা এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবো যেখানে সকলের জন্য সমান গুণগত মানের শিক্ষা অর্জনের সুযোগ থাকবে। কেউ প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও বা কেউ পাহাড়ে থেকেও সমমানের শিক্ষা অর্জন করবে। সবার জন্য যদি একই গুণগত ও দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যায় তাহলে কেউই পিছিয়ে পড়বে না।

Draft Copy

আমাদের হয়তো মনে প্রশ্ন জাগছে শিক্ষার ওপর কেন বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে? কারণ সকল বৈষম্যের সূত্রপাত শিক্ষাকে কেন্দ্র করে। একটি জাতি সত্যিকার অর্থে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও আধুনিকতায় স্বনির্ভর হওয়ার মৌলিক শর্ত হলো উন্নত মানসমৃদ্ধ শিক্ষা।

এখন আমরা দেখবো অর্থনৈতিক বৈষম্যের ফলে কীভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা সৃষ্টি হয়?

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য দরকার একটি বৈষম্যহীন ক্ষুধামুক্ত অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো প্রতিষ্ঠা। যে সমাজব্যবস্থায় কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। আর দারিদ্র্য না থাকলে ক্ষুধামুক্ত সমাজ গঠন সহজে করা যায়। যেখানে ভালো স্বাস্থ্যসেবার কথা বলা হয়েছে। আমাদের সমাজে গুণগত শিক্ষা এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু মানুষ এখনো সর্বত্র আমাদের সমাজে নানাভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। যেমন- একই শিক্ষা ও কাজের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সহজে নারী কর্মীদের নিয়োগ দিতে চায় না, বা নিয়োগ দিলেও বেতন তার পুরুষ সহকর্মীর তুলনায় অনেক সময় কম হয়ে থাকে। এখন বিশ্বব্যাপি টেকসই উন্নয়নে যে কার্যক্রম চলছে তাতে বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে।

নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে তোমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবে।

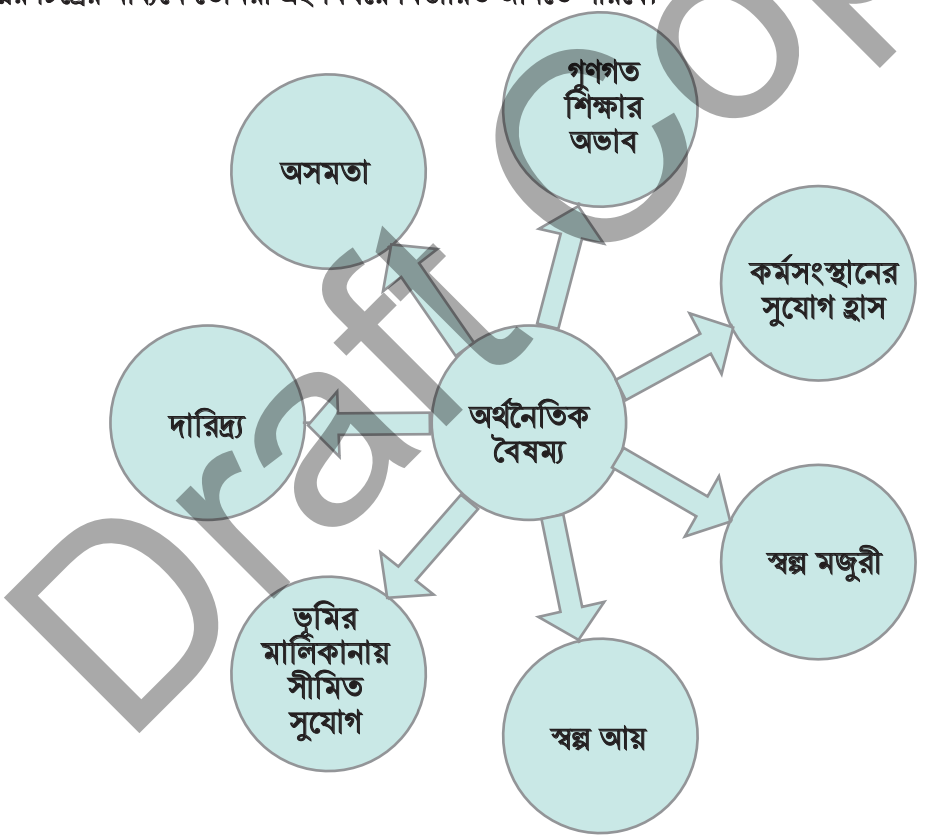

চিত্রেঃ অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রভাবের চিত্র

বড় ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিছু কিছু উন্নয়ন হলেও টেকসই

Draft Copy

উন্নয়ন হবে না।

উপরের চিত্রের মাধ্যমে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি। মান সম্পন্ন বা গুণগত শিক্ষার সুযোগের অভাবে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়। এর ফলে তারা দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না ভালো কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে ছিটকে পড়ে। অথবা তারা যে সমস্ত কাজের সুযোগ পায় তার মুজুরি কম হয়। এর ফলে আয়ও কম হয়। যার ফলে নিম্ন আয়ের মানুষ সম্পত্তিতে বা ভূমির মালিকানায় সীমিত সুযোগ পায় বা অনেকাংশে কোনো সুযোগই পায় না। অনেকে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষ যারা স্বল্প মুজুরির আয়ে জীবন নির্বাহ করে তারা এক সময় ভূমিহীনে পরিণত হয়। উচ্চ আয়ের মানুষজনই পরবর্তীতে ভূমির মালিকানায় বা নতুন নতুন ভূমি ক্রয়ের সুযোগ পায়। এরফলে গ্রামে যারা কৃষি কাজের সাথে জড়িত তাদের হাত থেকে ভূমি ক্রমান্বয়ে উচ্চ আয়ের মানুষের হাতে হস্তান্তরিত হয়।

Draft Copy